জিপসী লোককথা

নিখিল সেন

সাহিত্যলোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
৩২/৭, বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
মার্চ ১৯৬২

প্রচ্ছদ ঃ অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রক ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭/এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

স্বর্গত বাবা ও মা-কে

সূচীপত্র

এই লেখকের

প্রবন্ধ :

এশিয়ার সাহিত্য

পুরনো বই

জীবনী :

ইন্দিরা দূরদর্শিনী

আমাদের নেহরু

গল্প সংগ্রহ :

বুর্জোয়া

সম্পাদনা :

রমেশচন্দ্র দত্তের প্রবন্ধ সংকলন

এশিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প

অনুবাদ :

অচ্ছুৎ (মুলকরাজ আনন্দ)

মিশা (ম্যাক্সিম গোর্কি)

নিগ্রো ছেলে (রিচার্ড রাইট)



স্পেনের জিপসী 'সারা-লা কালী' বা 'কৃষ্ণা কালী'। প্রতিবছর মে মাসে ক্যাথলিক জিপসীরা 'সারা'র ভোজ উৎসবে যোগ দেন দলে দলে।

কথামুখ

একটি জিপসী কিংবদন্তী :

'আমরা তখন গঙ্গাতীরে বাস করতাম। আমাদের দলপতি ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত। তিনি যখন কথা বলতেন গ্রামের অপর প্রান্তে তা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত। তাঁর বিচারও ছিল চূড়ান্ত। সর্দারের ছিল একমাত্র পুত্র। নাম চেন। হিন্দুস্থানে তখন এক শক্তিমান রাজা রাজত্ব করতেন। রাজার প্রিয়তমা পত্নী একটি কন্যা প্রসব করেন। কন্যাটির নাম জ্ঞান। সর্দারের মৃত্যুর পর পুত্র চেন জ্ঞানকে বিয়ে করতে চাইল। জ্ঞান কিন্তু চেনের ভগ্নীরূপেই এতদিন প্রতিপালিত হচ্ছিল। দেশের লোকজন এই বিয়ের ব্যাপার নিয়ে দুই দলে ভাগ হয়ে পড়ল।'

এক ভবিষ্যদ্বক্তা এ সময় ভবিষ্যদ্বাণী করল যে, তাদের দেশ শীঘ্রই আক্রান্ত হবে। দেশের দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। সত্যি সত্যি দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের এক সেনাপতি ঝড়ের মত একদিন এসে অতর্কিত আক্রমণ করল তাদের। হিন্দুস্থানের রাজা যুদ্ধে নিহত হল। লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চলল অবলীলাক্রমে। জ্যোতিষীর কথা ফলল।

তখন ওদেরই একজন বিজয়ী সেনাপতির নিকট গিয়ে বিচার চাইল এ অজাচারের—ভাইয়ের বোনকে বিয়ে করার। তার কথা শুনে বিদেশী সেনাপতি তখন রেগে গিয়ে আঘাত করে বসল ওর মাথায়। আর সেই মুহূর্তে বিদেশী সেনাপতি আর তার ঘোড়া ভেঙে খান খান হয়ে গেল পাথরের বুকে ছুঁড়ে মারা পোড়ামাটির এক পাত্রের মত। আর দমকা একটা হাওয়া ওর দেহখণ্ডগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল দূর মরু প্রান্তরে।

অধিবাসীরা আগেই দু'দলে ভাগ হয়ে পড়েছিল। যারা চেনের বিরোধী ছিল তারা ওকে দেশ থেকে দিল তাড়িয়ে। জ্যোতিষী চেনকে অভিশাপ দিল :

'পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে তুই চিরকাল ঘুরে ঘুরে বেড়াবি। এক জায়গায় কখনও মাথা রেখে ঘুমোতে পারবি না। এক কুয়োতে কখনও দু'বার জল তুলে পান করা তোর সাধ্যে কুলোবে না।'

ফিরদৌসীর অমর কীর্তি 'শাহনামা'তেও এমনতর আরেকটি কাহিনী আছে।

ইরানের শাহ বহরাম গুড় উত্তর ভারতের জনৈক নৃপতি সংখলকে অনুরোধ করেন তিনি যেন ইরানের জাতীয় উৎসবে যোগ দেবার জন্য বিশ হাজার নর্তক-নর্তকী ও গায়ক দল

পাঠান। ভারতীয় শিল্পীদের নৃত্যকলা ও সংগীতে মুগ্ধ হয়ে শাহ তাঁর রাজ্যে তাদের বাস করতে অনুরোধ করেন। তাদের বিস্তর নিষ্কর জমি, গবাদি পশু ও বীজধান দান করেন। কিন্তু এই শিল্পীরা গান-বাজনা ছাড়া আর কিছুই জানতো না ; চাষবাস তো দূরের কথা। ফলে চাষবাস না করে বীজ-ধান, হালের বলদ সবকিছুই ওরা খেয়ে ফেলল। তাই দেখে শাহের রাগ হল। এই অকর্মা কুড়ের দলকে তিনি রাজ্য থেকে দিলেন তাড়িয়ে। কালক্রমে এই শিল্পীরাই ইরান বা মিশরের পথ ধরে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে জিপসীদের ভাষা 'রোমানি'র সংগে 'প্রাকৃত' বা আধুনিক ভারতীয় ভাষার বহু মিল রয়েছে। যেমন 'রোমানি'র 'রোম' শব্দটি এসেছে 'ডোম' থেকে। আর এই 'ডোম' উপজাতির একদা বসবাস ছিল গংগার তীরদেশে (গংগা অববাহিকায়)। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে যখন বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য সুদূরে কাবুল, কান্দাহার, বেলুচিস্তান, হিরাট প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তখন এরা গংগা অববাহিকা ছেড়ে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন।

ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ সুকুমার সেন বলেন : 'ইউরোপ এশিয়ার সব যাযাবরই নিজেদের পরিচয় দেয় 'রোম' (পুরুষ) ও 'রোমনি' (নারী) বলে। এই শব্দ দুটির মূল হল 'ডোম' ও 'ডোমনী'। ডোম-জাতির পুরাতন ঐতিহ্য বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে রক্ষিত আছে এবং সে ঐতিহ্যের সমর্থন যাযাবরী ভাষাতেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। 'এইসব বিবেচনা করিয়া মনে হয় যে যাযাবরীদের পূর্বপুরুষ পূর্ব ভারতের অধিবাসী ছিল। তাহারা বাহিরে যাইবার পূর্বে বেশ কিছুকাল উত্তর-

পশ্চিম অঞ্চলে ও পূর্ব-দক্ষিণ ইরাণে রহিয়া গিয়াছিল।'
['ভারতকোষ' ৩য় খণ্ড ; পৃ. ৫২১]

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পর থেকেই সম্ভবতঃ তাদের এই ভ্রাম্যমাণ পরবাসের সূচনা। অবশ্য এই বিষয়েও মতান্তর রয়েছে। গ্রীয়ারসন ও অন্যান্য ব্রিটিশ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন গজনীর সুলতান মহম্মদ ঘোরী তাঁর সতেরো বার ভারত আক্রমণ কালে পাঞ্জাব, গুজরাট ও সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চল থেকে হাজার হাজার বিজিত সৈন্য ও সাধারণ মানুষকে ক্রীতদাস হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যান। এই বিপুল ক্রীতদাস বাহিনী এক সময়ে তাঁর সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এর সমাধান তিনি করেন কৃষ্ণকায় ভারতীয় ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে। কেননা সুন্দরতর ইরাণী ক্রীতদাস-দাসীরাই তখন তাঁর নেকনজরে পড়েছে। মুক্ত ক্রীতদাসেরা তখন হয় গ্রীস ও মিশরে অথবা উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মধ্য দিয়ে ইউরোপের উত্তর-দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়ে।

ভবিষ্যদ্বক্তার গণনা সফল করে ইউরোপ ও আমেরিকায় ওরা যে কবে ছড়িয়ে পড়েছিল তা সঠিক জানা যায়নি।

মার্টিন ব্লক তাঁর 'জিপসীস—দেয়ার লাইফ এ্যাণ্ড কাস্টমস্' বইয়ে ওদের ইউরোপে যাওয়ার সময় নির্ধারণ করেছেন খ্রীস্টজন্মের প্রথম চতুর্দশ শতকে। জিপসীদের ক্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে উপস্থিতির কথাও তাঁর বই থেকে জানা যায়। সার্বিয়ার এক রাজকুমার কার্পেথিয়ান পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত তিরানা মঠে এক জিপসী ক্রীতদাস পরিবারকে পাঠিয়েছিলেন বলে কথিত আছে। পঞ্চদশ শতকের মলদাভিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে ওদের উপস্থিতির কথাও এই বইয়ে লিপিবদ্ধ আছে। প্যারিসের রাজপথে ওরা লোকের হাত দেখে সৌভাগ্য

গণনা করত বলে মার্টিন ব্লক উল্লেখ করেছেন। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে ওরা ইউরোপের অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাও জানা যায়। পিরানিজ পর্বতমালার উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করে ওরা যে স্পেনে প্রবেশ করেছিল এবং উত্তর আফ্রিকার পথ ধরে নিজেদের 'পূর্বপুরুষদের' (মিশরীয়?) সঙ্গে মিলিত হয়েছিল সে কথাও লেখা আছে এ বইয়ে।

চার্লস লেল্যান্ডও জিপসীতত্ত্বের এক মস্ত বড় পণ্ডিত। তাঁর মতে, উত্তর ভারতের জাঠেরাই মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের সময় হাজারে হাজারে ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছেছিল। তাঁর মতে হিন্দীই এইসব দেশহারা ভবঘুরেদের আদি ভাষা।

চার্লস লেল্যান্ড লিখেছেন: 'রোমানির উৎপত্তি প্রসঙ্গে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ই. এইচ. পামার প্রায় চার হাজার ইংরেজী-জিপসী শব্দ পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ঐ শব্দগুলির বেশির ভাগই হিন্দী বা পারসিক মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত; গ্রীক বা ইউরোপীয় কোন ভাষা থেকে নয়।'

তিনি আরও লিখেছেন: 'রোমানি ও ভারতবর্ষের উপর লিখিত বহু গ্রন্থ অনুশীলন করে আমি এ সিদ্ধান্তে এসেছি যে, জিপসীদের আদি পুরুষ হিন্দুরাই। ঐ দেশ থেকে ওরা হয় বিতাড়িত হয়েছে, কিংবা প্রবাসী হয়েছে।...ভাষা, প্রথা, রীতি-নীতি, দেশাচারের প্রমাণ বাদ দিলেও, পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা জিপসীদের সঙ্গে ভারতীয়দের দেহাবয়বের সাদৃশ্য কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। এমনকি মিশরের বাসিন্দা জিপসীরাও আকৃতিতে মিশরীয় নয়—হিন্দুই।'

তাই বুঝি যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া প্রভৃতি

পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত জিপসীরা আজও ভারতীয়দের দেখলে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলে ওঠেন : 'তু ম্যই এক রক্ত !'

তোমার আর আমার মধ্যে এক রক্তধারা প্রবাহিত—আমরা সব ভাই-ভাই !

দারিদ্র্য ও কুসংস্কার জিপসীদের মধ্যে এমনই বদ্ধমূল যে প্রাপ্তবয়স্ক জিপসীদের এক-তৃতীয়াংশ এখনও শিক্ষার আলো পায়নি। বাদবাকি যারা তাদের হাতেখড়িও হয়নি। লিখতে পড়তে পারে না বেশির ভাগই। তা সত্ত্বেও জিপসীদের মধ্যে গায়ক, কবি, লেখক, সাংবাদিক, ডাক্তার আর আইনজীবীর সংখ্যা নেহাত নগণ্য নয়। তাদের অনেকেই ইউরোপের বিভিন্ন শহরে বসবাস করেন আধুনিক ফ্ল্যাটে। রেডিও, পিয়ানো, গাড়িও আছে অনেকের।

রুশ গবেষক এম. জে. কৌনভিন লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে রুশদেশে যেসব জিপসীর বাস তাঁদের অনেকেই ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও পৃথিবী বা বসুমতী প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করে আসছেন। শেষোক্ত দেবী 'পৃথিবীকে' ওঁরা মাতা বা মা বলে অভিহিত করে থাকেন।

কৌনভিন পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম। তিনি দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে নিষ্ঠার সংগে জিপসীদের আদি উৎস সম্পর্কে গবেষণা করে গিয়েছেন। ভারতেও তিনি দু-একবার এসেছিলেন। তিনি ১২০টি জিপসী কাহিনী, ৮০টি পৌরাণিক কিংবদন্তী ও ৬২টি লোকগীতি সংগ্রহ করেন। পাঁচ বছর ধরে তিনি জিপসী ভাষাও শিক্ষা করেন। ইউরোপ ও এশিয়ার নানান জায়গায় জিপসীদের সংগে বসবাস করে

জিপসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন তিনি।

তিনি লক্ষ্য করেছেন যে হিন্দু পৌরাণিক দেব-দেবীর সংগে জিপসী পুরাকাহিনীর ঠাকুর-দেবতার হুবহু মিল রয়েছে। যথা: বরামী (ব্রহ্মা), জ্ঞান্দ্র (ইন্দ্র), লাকি (লক্ষ্মী), মাতা (পৃথিবী মাতা বসুমতী) ইত্যাদি।

কাজকর্মেও ওরা সমান পটু। কুকুর, ঘোড়ার লেন-দেন ব্যবসাও ওদের প্রধান উপজীবিকা। চির স্বাধীনচেতা এই যাযাবরের দল দাসত্বকে কখনো মাথা পেতে নেয়নি। ফলে অভাব অনটন, দারিদ্র্য, রোগ-শোক প্রায় হামেশা লেগে থাকে জিপসীদের মধ্যে। কর্ম-বিমুখতা ও রাজশক্তির প্রতি নিস্পৃহ উপেক্ষা তাদের এই দুর্দশাকে চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

তার উপরে রয়েছে রাষ্ট্রীয় নির্যাতন। এই রক্ষণশীল সংখ্যা-লঘু অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রশাসনের বিষদৃষ্টি ছিল সব সময়ই। ছিল নির্বাসনের ঢালাও নির্দেশ, পুলিশী নিপীড়ন আর লঘুপাপে গুরুদণ্ড—মৃত্যু। পঞ্চদশ শতক থেকে জার্মানী ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের রাজারা ব্যাপকভাবে জিপসীদের উপর চালিয়েছেন অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন আর নিপীড়ন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট ওদের নির্মূল করার জন্য আইন তৈরি করেছে। ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়ে ওদের নৃশংসভাবে হত্যা করার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আর গত বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারই কেবল নাৎসী জার্মানী থেকে ২৮ হাজার জিপসী নরনারী ও শিশুকে গ্যাস চেম্বারে পুরে নিশ্চিহ্ন করেছে। নুরেমবার্গ বিচারে তার নজির রয়েছে।

মুসলিম দেশে ওরা হয়েছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত। গ্রীস দেশে হয়েছে খ্রীষ্ট ধর্মের অনুরাগী আর ক্যাথলিক দেশে

ক্যাথলিক মতবাদে বিশ্বাসী। ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি নিষ্ঠা নেই বটে, কিন্তু গোষ্ঠীগত অনুশাসন আর সংস্কারের প্রতি আনুগত্য ওদের সুগভীর। এক কথায়, অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারের মূর্ত প্রতীক বলা যায় জিপসীদের। চরম অদৃষ্টবাদী, নিয়তির ক্রীড়নক। জীবনকে ওরা গ্রহণ করেছে সহজিয়া আনন্দে, নীতিশাস্ত্রের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নয়। বিয়ের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী না হলেও ওরা কিন্তু স্বাধীন, উদ্দাম, বেপরোয়া। ভয়ানক ব্যক্তিকেন্দ্রিক। বন্ধনহীন, অপরাজিত প্রাণশক্তির প্রতীক এই জিপসীরা।

জিপসীদের লোককথার, বিশেষ করে রুমানিয়ার জিপসীদের লোককথার বিষয়বস্তু অনেকটা একই ধরণের। কোনরকম তারতম্য চোখে পড়ে না। পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। তবে বলার ভঙ্গি কিন্তু এক নয়। যা কিছু পার্থক্য তা শুধু এখানেই। এসব লোককথায় ভূত-প্রেত, ডাইনী, ভূত-ছাড়ান ওঝাদের তুক-তাক মন্ত্র-তন্ত্র কিংবা ড্রাগন ও পক্ষীরাজ ঘোড়ার আনাগোনা চোখে পড়ে। তাতার রুশ সৈন্য সামন্তদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের কথাও প্রাধান্য পেয়েছে দেখা যায়।

জিপসী লোককথায় আছে কোন জিপসী ডাইনী যদি কাউকে ভর করে থাকে, তখন তাকে তাড়াবার জন্য বিড়বিড় করে আউড়তে হয়ঃ

যা সা ত্ত চোভিয়ানি।
পালা ডাইনী, পালা ॥

বাঙালীর রূপকথার 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমী'-ই জিপসী লোককথায় তিন পাখিতে রূপান্তরিত হয়েছে দেখা যায় (কথা নং ১৬)। রাজকুমার ও তার প্রিয়া দরবেশ-কন্যাকে নিয়ে টেকোরাম দেশে

ফিরছিল জাহাজে করে। সে জাহাজটি যখন এক গঞ্জে গিয়ে ভিড়ল, তখন শেষ রাত্রে কোত্থেকে তিনটি পাখি উড়ে এসে বসল জাহাজের মাস্তুলের উপর। পাখি তিনটি নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। এক পাখি আর এক পাখিকে ডেকে বলল :

'ও পাখি, ও পাখি, শুনছ পাখি? দরবেশ কন্যা আর রাজপুত্র এখন তো দিব্যি খানাপিনা করছে। তাদের বরাতে কি আছে জান কি?'

'কি আছে গো, কি আছে?' আর এক পাখি শুধাল।

'কাল সকালে রাজপুত্রের জাহাজ যেই কূলে ভিড়বে তখন ছোট্ট একখানা ডিঙি ওদের বরণ করে নিতে আসবে। রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যা যেই ডিঙিতে পা দেবে, ডিঙিখানা অমনি জলে ডুবে যাবে। যদি কেউ আমাদের এ কথা শোনে আর কাউকে বলতে যায়, হাঁটু পর্যন্ত তার পাষাণ হয়ে যাবে।'

টেকোরাম সব শুনল। পরের দিনও শেষ রাত্রে পাখি তিনটি আবার উড়ে এসে বসল জাহাজের মাস্তুলের উপর। আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল আপন মনে :

'ও পাখি, ও পাখি, শুনছ পাখি, রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যার খানাপিনার তো আর অন্ত নেই। কিন্তু বরাতে তাদের কি লেখা আছে জান কি?'

'কি আছে গো, কি আছে?' আর এক পাখি শুধোল।

'কাল সকালে জাহাজ থেকে নেমে যেই ওরা যাবে তোরণের নিচে দিয়ে, তোরণটি অমনি ভেঙে পড়বে।' পাখিটি জবাব দিল। বলল :

'যদি কেউ আমাদের কথা শুনতে পায় আর তা কাউকে বলতে যায় অমনি তার কোমর পর্যন্ত পাষাণ হয়ে যাবে।'

পরের দিনও রাত্রি শেষে পাখি তিনটি আবার উড়ে এসে বসল জাহাজের মাস্তুলের উপর, আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল :

'ও পাখি, শুনছ পাখি, রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যা খুব ত এখন খানা-পিনা গান-বাজনা করছে, বরাতে তাদের কি লেখা আছে জান কি ?

'কি লেখা আছে গো ?' অপর পাখি শুধাল।

পাখিটি তখন বলল 'দরবেশ-কন্যাকে বিয়ে করে রাজপুত্র যখন বাসর ঘরে সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়বে, রাত দুপুরে তখন সাত মাথাওয়ালা এক ড্রাগন খেতে আসবে দু' জনকে। যদি কেউ আড়ি পেতে আমাদের কথা শোনে আর বলতে যায় কাউকে মাথা পর্যন্ত তার পাষাণ হয়ে যাবে।'

হয় হোক, সর্বাঙ্গ তার পাষাণ হয়ে যাক। তবু সে তার প্রিয় বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করবে রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যাকে কিছুতেই ডিঙি নৌকায় চাপতে দেবে না ; তোরণের নিচ দিয়ে যেতেও না। বাসর জেগে সে তার বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীকে রক্ষা করবে। সংকল্প করলে টেকোবাম।

রক্ষা সে করল। কিন্তু নিজে হয়ে গেল পাষাণ প্রতিমা। রাজপুত্রই আবার প্রিয় বন্ধুর পাষাণ দেহে ভিনদেশি ঝরণার জল এনে প্রাণসঞ্চার করল।

যে কাহিনী একদিন বাঙলার ঘরে ঘরে শোনা যেত তার অনুরণন আজ দেশবিদেশে ছড়িয়ে থাকা জিপসী ক্যারাভানে, জিপসী তাঁবুতে আগুনের চুল্লির কাছে বসা 'রাণীমার' মুখে মুখে।

এখানেই জিপসী লোককথার বৈশিষ্ট্য।

স্যামুয়েল রবার্টসের মতে জিপসীরা হল অনেকটা ঈশ্বরের ঘর ছাড়া পাখির দল। ঈশ্বরই তাদের খাওয়ান, ঈশ্বরই তাদের যত্ন নেন। খাওয়া পরার জন্য জিপসীদের মত আর কোন সৃষ্ট জীবই এমনভাবে ভগবানের মুখ চেয়ে থাকে না। ঈশ্বর সম্পর্কে ওরা অবশ্য ততখানি তত্ত্বজ্ঞানী নয় আমাদের মত। তবে ওরা ঈশ্বরকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পেতে ভালবাসে। ঘটা করে ওরা যদি ঈশ্বরকে ভালবাসা না জানায়, তবে ওরা ঠিক পাপে জড়িয়ে পড়বে—এ ওদের ধারণা।

নিজেদের অনুশাসন, বিশ্বাস আর সংস্কারের প্রতি টান ওদের মজ্জাগত। আমাদের আশেপাশেই ওরা ঘোরা ফেরা করে; কিন্তু সঙ্গে মেশে না। ওরা আমাদের গোপন কথার হদিস রাখে; হাত দেখে ভাগ্যরেখা বিচার করে। আমরা নিজেদের সম্পর্কে যতটুকু জানি তার চেয়ে অনেক বেশি খোঁজ খবর রাখে ওরা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ওরা হল সংযোগ। স্পেনবাসীদের চেয়েও ওরা নাচে-গানে বেশি দক্ষ। গান বাজনায় ওরা হাঙ্গেরীয়দের চেয়েও পটু ওরা আত্মবিশ্বাসী। খুব কম কাজই ওরা করে। কিন্তু যা করে তা অনেকের চেয়েই নিপুণভাবে করে। সৃষ্টির চাইতে সংরক্ষণের প্রবণতা ওদের বেশি। যা কিছু ওদের প্রয়োজনের জিনিস—তার সবটাই ওরা গ্রহণ করে; বাদ দেয় যা ধাতে সয় না সেটুকুই। সর্বত্রই ওরা হয়েছে নিপীড়িত, নির্যাতিত। তবু আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়া হাওয়ার মত ওরা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

ক্যারাভ্যানের চলমান জীবন প্রবাহই ওদের যাযাবর জীবনের সঠিক পরিচয়। এক জায়গায় তাই বেশি দিন ওদের থাকা হয় না। কৃষিকার্যের আদিম পেশা ওদের নয়। পেশা ওদের লোক-

রঞ্জনের পরগাছা বৃত্তি— নাচ, গান, বাজনা, হাতদেখা, ভাগ্যগণনা। অবশ্য সোনা-রুপোর সূক্ষ্ম কারুকাজ, হাতির দাঁতের কারিগরিতেও সমান পটু জিপসীরা।

আমাদের প্রেরণার উৎস হল জিপসীরা, তবে আমরা তা জানি না—এই বলে আক্ষেপ করেছেন স্যামুয়েল রবার্টস। স্বাধীনতার উদগ্র বাসনা, বন্ধনহীন প্রকৃতির সংগে বন্ধুত্ব, উন্মুক্ত আকাশের তলে দেশ-দেশান্তরে অবাধ বিচরণ—এই হল ওদের বৈশিষ্ট্য। আমরা যা স্বপ্ন দেখি জিপসীরা তাকে বাস্তবে রূপ দেয়। পৃথিবীর অবশিষ্ট রোমান্সের প্রকাশ বুঝি বা ওদেরই মধ্যে। নির্ভীক স্বাধীন সত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল ওরা। আইন শৃঙ্খলার অত্যাচার আর সভ্যতার অগ্রগতির ফলে সেই স্বাধীনতা হয়েছে পংগু। এই হল সভ্যতার অভিশাপ। তাই নির্যাতন আর নিপীড়নের যাঁতাকলে জিপসীরা পিষ্ট হয়েছে চিরকাল। সমগ্র জিপসী সাহিত্যে তারই প্রতিচ্ছবি। (লেখকের 'এশিয়ার সাহিত্য' জিপসী সাহিত্য প্রসংগ দ্রষ্টব্য।)

লেখালেখি শুরুর অনেক আগে থেকেই এই সব গল্প লোকমুখে এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাড়ি জমিয়েছে। যাযাবর জিপসীরাই একদেশ থেকে অন্য দেশে যাবার সময় নিয়ে গেছে তাদের জীবনযাত্রার লৌকিক ঢঙ, শব্দ সম্ভার এবং বহু উপকথা। তাতে মিশে গেছে ফেলে আসা ভূখণ্ডের জন্য তাদের পিছুটান। মুখে মুখে বদলে যাওয়া এইসব উপকথার বহিরংগের রূপ বদলালেও মূল উৎসটিকে কিন্তু চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এই উৎস ভারতবর্ষ, জিপসীদের আদি বাসস্থান।

এহেন জিপসী উপকথার সংগে ভারতীয় উপকথার সাদৃশ্য যে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। জিপসীদের ভাষা রোমানির সংগে

মূল সাতটি ভারতীয় ভাষারও যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। জিপসী সাহিত্য-বিশারদ ফ্রানসিস্ হিণ্ডেস্ গ্রোম বলেন ঃ

'ভারতবর্ষ ছাড়ার পর পারস্য ও আর্মেনিয়া পার হয়ে তারা গ্রীকভাষী বলকান অঞ্চলে এসে বসবাস করেছিল কয়েক শতাব্দী। সেখানে ভারতীয় উপকথা ছড়িয়ে দিয়ে তারা শিখেছিল গ্রীক উপকথা। ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ তারা সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে সাইবেরিয়া, নরওয়ে, স্পেন ও ব্রেজিলে। প্রত্যেক জায়গাতেই তারা নিজেদের সংগৃহীত উপকথাগুলি প্রচার করে ও স্থানীয় উপকথা সংগ্রহ করে সমৃদ্ধতর করে তোলে নিজেদের ভাঁড়ার।'

তাই পৃথিবীর সব দেশের উপকথার মধ্যেই জিপসী উপকথার প্রভাব রয়েছে। ভারতীয় উপকথাও এর ব্যতিক্রম নয়। তুর্কী, স্পেন প্রভৃতি নানা দেশের জিপসী উপকথাগুলির সঙ্গে এজন্যই ভারতীয় উপকথার মিল দেখা যায়।

রাশিয়ায় যেসব জিপসীদের বাস তাদের অনেকেই বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবীর উপাখ্যান রক্ষা করে আসছে। দেবী ধরিত্রীকে ওরা মাতা বা মা বলে থাকে। হিন্দু পুরাকাহিনীর দেবদেবীর সঙ্গে জিপসী পুরাকাহিনীর ঠাকুর দেবতার বহু মিল দেখা যায়। জিপসী পুরাকাহিনীতে সীতার পাতাল প্রবেশ ও জননী বসুন্ধরার তাঁকে বুকে টেনে নেবার মত কাহিনীও রয়েছে।

পোলিশ জিপসী গল্প 'টেল অফ এ ফুলিশ ব্রাদার' এবং 'ওয়াণ্ডারফুল বুশ', ওয়েলস জিপসী গল্প 'দি ড্রাগন'-এর সঙ্গে ভারতীয় উপকথা 'বানরপুত্র'র ('দি মানকি প্রিন্স'—ম্যাইভ স্টোক) 'টেকোরাম' (কথা নং ১৬)-এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। আবার তুর্কী জিপসী গল্পের সঙ্গে গ্রীম ভাইদের 'ফেইথফুল

জন' এবং অন্যান্য ইউরোপীয় উপকথার যেমন সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি মিল আছে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সংকলিত 'ফকিরচাঁদ' গল্পটির সঙ্গেও (ফকিরচাঁদ, 'ফোক টেলস অফ বেঙ্গল')।

জিপসী এবং ভারতীয় উপকথাগুলির মধ্যে ঘটনাগত সাদৃশ্যও প্রচুর। হাঙ্গেরীয় জিপসী উপকথা 'দি ভ্যামপায়ার'-এ এক রাজা গাড়োয়ানকে রাজকন্যার কবর থেকে ফুল তুলে আনতে পাঠালে সে ব্যর্থ হয়, কিন্তু রাজা নিজে গিয়ে ফুল তুলে নিয়ে এলেন। প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটে ভারতীয় উপকথা 'বেল প্রিন্স'-এ। সুন্দরী রাজকন্যার যে প্রিয় ফুলটিকে গ্রামবাসীরা কেউ তুলতে পারলেন না রাজপুত্র অনায়াসেই তা তুলে আনেন। দুই উপকথাতেই রমণীরা সন্তান লাভ করেছেন ফল খেয়ে। ভক্তের দুর্দশা দূর করতে মহাদেব যেমন বুড়ো ফকির বা নন্দী ভৃঙ্গীকে পাঠান গল্পের শেষে, তেমনি প্রভু পাঠিয়েছেন সেন্ট পিটারকে। 'পাখাওয়ালা রাজপুত্র' (কথা নং ২০) গল্পের ঘুমন্ত রাজকন্যার শিয়রের পাশ থেকে মোমবাতি সরিয়ে নিলে জেগে ওঠে। একই ঘটনা ঘটে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সঙ্কলিত 'দি বয় উইথ দি মুন অন হিজ ফোরহেড' গল্পটিতেও। অভিশাপে পশু হয়ে যাওয়া রাজকুমারী সোনার কাঠি রুপোর কাঠি ছোঁয়ালে জেগে ওঠে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সঙ্কলিত 'ঠাকুরদার ঝুলি', 'ঠাকুরমার ঝুলি'র রূপকথাগুলিতেও একই ঘটনা দেখা যায়।

প্রায় একই রকম পোশাক-পরিচ্ছদ পরে দুই উপকথার নায়ক-নায়িকারা। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল, কি ভারতীয়, কি ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা জিপসী উপকথা সবগুলিতেই একই-ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে পাখির ডানা, জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি

উপাদান। একই ঢঙে আদেশ দেওয়া হয়েছে কাউকে। কিংবা একই শাপে ভস্ম হয়ে গেছে কেউ। কে কাকে প্রভাবিত করেছে এই কূট তর্কে না গিয়ে বরং বলা ভালো দু'জনেই দু'জনের কাছ থেকে নিয়েছে—দিয়েছে।

যদিও আজকের ভারতবর্ষে প্রচলিত উপকথাগুলি নিজ উৎস থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে, বহিরঙ্গে অনেক বদল ঘটেছে তাদের, তবুও মিল খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। ভ্রাম্যমাণ জিপসীরা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্প উপকথাও ছড়িয়ে দিয়েছে বহু জায়গায়। এবং এক মহাদেশের সঙ্গে আর এক মহাদেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তুলেছে।

ইউরোপ আমেরিকার বহু লেখকই জিপসীদের নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখেছেন। জিপসীরা তাঁদের প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের লক্ষ্য ছিল অবশ্য রোমাঞ্চধর্মী কিছু একটা সৃষ্টি করা। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তা হয়ে উঠেছে অপূর্ব সাহিত্যকীর্তি। এইসব অমর স্রষ্টাদের মধ্যে আছেন ভিক্টর হিউগো, লিও তলস্তয়, ম্যাক্সিম গোর্কি, সারভেনটিস, ম্যাথু আরনল্ড, জর্জ ইলিয়ট, জন গলসওয়ার্দি, ডি. এইচ. লরেন্স, আরস্কিন কড্ওয়েল, মোরাভিয়া প্রমুখ অনেকেই।

একদা 'ও নোভা ডোম' ('নবজীবন') নামে সোভিয়েত দেশে একটি জিপসী সংবাদপত্রও প্রকাশিত হত। মস্কোতে জিপসীদের থিয়েটারও ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯৩০ সালে সোভিয়েত দেশ ভ্রমণে যান তখন তিনি জিপসীদের নাচ-গান অভিনয় দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

পৃথিবীর এক কোটি কুড়ি লক্ষ জিপসীদের দাবী রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্প্রতি মেনে নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক জনজীবনে মর্যাদার

স্বীকৃতি পেয়েছে আজ জিপসীরা।

এই বইয়ের জিপসী লোককথাগুলি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে ফ্রানসিস হিণ্ডেস গ্রোম-এর 'জিপসী ফোক-টেলস্' (হারবার্ট জেন্‌কিনস্ : লণ্ডন) থেকে সংকলিত হয়েছে। ইউরোপ আমেরিকায় প্রচলিত এই জিপসী লোককথা 'রোমানি' ভাষায় লেখা হলেও এগুলির সঙ্গে ভারতীয় লোককথার মিল কতখানি তা সহজেই পাঠকের নজরে ধরা পড়বে।

'জিপসী লোককথা'র প্রথম কাহিনীটি ঐতিহাসিক লিটন স্ট্রেচির আত্মচারিতমূলক রচনা 'আন্‌পাবলিশড লাইফ অ্যাণ্ড লিটারারি রেমিনিসেন্স' থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এই কাহিনীটি অবশ্য জিপসী লোককথার পর্যায়ভুক্ত নয়। কিন্তু জিপসী জীবনধারার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে ফুটে উঠেছে তাই এটি জিপসী লোককথায় গৃহীত হল।

আর এই দুরূহ কাজ সম্ভব হত না প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও গ্রন্থাগারিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় ডঃ অতুলকৃষ্ণ সুর মহাশয়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সহায়তা লাভ না করতাম; বিশেষ করে পরম স্নেহভাজন শ্রীমান সুনীল দাস ও শ্রীমান রঞ্জন সেনের। তরুণ প্রকাশক বন্ধুবর শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষকেও এ প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই।

নিখিল সেন



জিপসীদের রাণীমা



রুমানিয়ার জিপসী মা ও ছেলে —'তু ম্যাই এক রক্ত'।



ইউরোপের-নানান দেশের জিপসী বাসিন্দা



গয়না-গাটি-পরা জিপসী মেয়ে

জিপসী লোককথা

১

'বলো, ঠিক করে বলো, লক্ষীটি!'

মিনতির সুরে আমি বলে উঠলাম। ওর ছোট হাতখানির মধ্যে রূপোর একটা চকচকে চাকতি গুঁজে দিলাম। বললাম:

'তোমার মত সুন্দরী না হলেও চলবে। তোমার অর্ধেক রূপ থাকলেও হবে। আমায় একটা প্রেমিকার সন্ধান দিতে পারো?'

অনেক বুঝি শুনেছে অমন কথা মেয়েটি। এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত সে। তবু গাল দুটি তার আরও লাল হয়ে উঠল। চোখদুটি তুলে সে তাকালো আমার মুখের দিকে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি হেনে খুঁজলো কি যেন। তারপর নিজের কালো চোখদুটি নামিয়ে তাকালো আমার হাতের তালুর দিকে। জিভটা তালুতে ঠেকিয়ে হঠাৎ সে চুক-চুক শব্দ করলো। আপশোষ করে বলে উঠলো:

'তুমি তো দেখছি জীবনে অনেক ঘা খেয়েছো। খুব ছোটবেলা হারিয়েছো বাবাকে। তোমার ভাই আছে কিন্তু কোনো বোন নেই। আহ! তুমি যখন সবে বালক তখন এক মেয়ের প্রেমে পড়েছিলে। তুমি কিন্তু মেয়েটাকে জীবনে আর পাবে না। না, পাবে না কোনও দিন। রেখাটা কেটে গেছে। তোমার বুকটাও ভেঙে দিয়ে গেছে। তুমি খুব মন-মরা হয়ে পড়েছিলে।' সমানে সে বলে চললো: 'সে যাই হোক, ফাঁড়াটা এখন কেটে গেছে। তুমি সামলে নিয়েছো অনেকটা। তবে আর কখনও আগেকার মতো মনের ফূর্তি ফিরে পাবে না।'

আমি তাজ্জব বনে গেলাম। হাতখানা তাই ছিনিয়ে নিলাম এক ঝটকায়। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠলাম:

'ডাইনী কোথাকার!'

'আমি কি তোমার মনে আঘাত দিয়েছি?' মেয়েটি মুখ তুলে প্রশ্ন করলো। বললো:

'বেশ, তা হলে যা ঘটে গেছে সেসব কিছু আর বলবো না। ভবিষ্যতের কথাই শুধু বলবো।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলো। ভবিষ্যতের ভালো ভালো কথা যদি থাকে বলো।'

আমি খুব কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। খুঁতখুঁতে। মেয়েটা উপরের তালুতে জিভ ঠেকিয়ে আবার চুকচুক শব্দ করলো। বললো :

'নতুন একটা গ্রহ খুব ভোগাচ্ছে তোমাকে।'

'কোন্ গ্রহ?'

'কী নাম আসে জানি না। তবে এ গ্রহের প্রভাবে জাতক আগ্রহী হয়ে ওঠে যত সব অদ্ভুত বিষয়ে। আর জাতককে ঠেলে দেয় নানান দুঃখ-দুর্দশার দিকে। তবে তোমার বরাত ভালো। জীবনে তুমি কখনও অভাবগ্রস্ত হবে না। নাম-যশ তোমার খুব হবে। তুমি মাথা তুলে দাঁড়াবে। তবে আশঙ্কার কথা, তোমার প্রাপ্য সম্মানের পুরোপুরি মর্যাদা তুমি হয়তো পাবে না।'

মেয়েটা আবার মুখে চুকচুক করে শব্দ করলো। বললো :

'আহুহুঃ। তোমার কিছুটা দুর্নামও রটবে। নিন্দা করবে লোকে। তুমি দায়ী না হলেও লোকে তোমার নামে কুৎসা রটাবে। তাতে তোমার মন-মেজাজ খিঁচিয়ে থাকবে সব সময়। তবে তোমার মাথা হেঁট হবে না কারো কাছে। উঁচু থাকবে। তোমার পরম বন্ধু আর চরম শত্রু দুই হবে মেয়ে। তুমি হবে প্রেমের কাঙাল। প্রেম-ভালোবাসা জীবনে তুমি অনেক পাবে ঠিক। কিন্তু তাতে তোমার তৃপ্তি হবে না। খালি দুঃখ বেড়ে যাবে।'

মেয়েটা আবার চুকচুক শব্দ করলো মুখে। বললো : 'অনেক ক্ষেত্রে তুমি নিজের শত্রুতা নিজে করবে। তা হোক, মন খারাপ করো না। তুমি খুব ভাগ্যবান। সর্বক্ষেত্রে তুমি কৃতকার্য হবে।'

মেয়েটি একটু থামলো। দম নিয়ে বললো : 'তবে আমার মতন না। এই দেখ না আমার হাত। দেখ ভাগ্য-রেখাটা কেমন কাটা।'

'কাটা হলে কি হয়?'

'দুঃখ। আর শীগগীরই তা ঘটবে।'

'আচ্ছা, তুমি অপরকে যা বলে বেড়াও নিজের বেলায় তা খাটাও না কেন?' আমি বলে উঠলাম :

'সৌভাগ্য কারো হাতে কিন্তু লেখা থাকে না।'

'আলবৎ থাকে। যারা পড়তে পারে তারা জানে।'

জবাব দিলো জিপসী মেয়েটা—'তবে খুব কম লোক জানে এ বিদ্যে। কেউ কেউ মুখ দেখেও বলে দিতে পারে।'

আমি অবশ্য জিপসী মেয়েটা যা যা বলে গেলো হুবহু তা লিখে রাখতে পারলাম না। কেননা, সে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছিল। আর এমন সব কথা যার অর্ধেক মানে আমি জানি না। যেটুকু বুঝতে পেরেছি তাই শুধু লিপিবদ্ধ করলাম এখানে।

কথা বলতে বলতে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। চলতে চলতে আমি তাদের ভাষা, ধর্ম, মেয়েদের চাল-চলন ইত্যাদি বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম। সব কিছুরই জবাব দিয়ে চললো সে। তার কথা আমার অনেকটা হেঁয়ালীর মতো শোনাল।

আমার মনে আছে সে বুঝি বলেছিল, ইংল্যান্ড-এ জিপসীরা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী 'ফাহে' আর অপর শ্রেণী 'স্মিথ' নামে পরিচিত। ওদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তারাই শুধু ঐ নাম গ্রহণ করে।

জিপসী মেয়েটি আরও বলছিলো, তাদের আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম-বিশ্বাস আজ নাকি লোপ পেতে বসেছে ক্রমে ক্রমে। অনেকে আবার খ্রীস্টানও হয়ে গেছে। এরা হোল অস্পৃশ্য খ্রীস্টান—যাকে বলা হয়ে থাকে 'হীদেন'।

ভাগ্যরেখা বিচার করতে গিয়ে তারা যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় নেয় না এমন নয়। আমি পরে জানতে পারি জিপসীদের ভাগ্যগণনার সংগে আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেক তফাৎ।

ওসব হস্তরেখাবিচার-ভাগ্যগণনার বিষয় ছেড়ে আমরা এবার অন্য প্রসংগে এলাম। বুঝলাম জিপসী মেয়েটা আমায় অপছন্দ করে না। তবে সে ছিল খুব নম্র ; বড় লাজুক।

'দেখ, দিনকয়েক আমি তোমাদের সংগে থাকতে চাই।' আমি এক-সময় বলে উঠলাম।—'তুমি কি বলো ?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। ইচ্ছে করলে তুমি থাকতে পারো। সে তো খুব ভালো কথা।'

ওর চোখ দুটি নেচে উঠলো আনন্দে। বললো :

'তবে সত্যিকারের ভদ্রলোকের মত তোমাকে কিন্তু থাকতে হবে। ঠাকুমাকে আমি বলবো। হ্যাঁ গো, থাকো না তুমি যদ্দিন খুশি।' বলে উঠল মেয়েটা :

'দাঁড়াও আমার হাতের রেখাটায় কিন্তু সৌভাগ্যের কোনো চিহ্ন দেখছি না। চিহ্ন রয়েছে খালি।'

আমি ওর ছোট হাতটা মুখে নিয়ে চুমু খাবার লোভ সামলাতে পারলুম না। ও কিন্তু কোন বাধা দিলো না। তবে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুমু খেতে দিলো না কিছুতেই।

বনের ধারে একফালি বেওয়ারিশ জমির ওপর জিপসীদের তাঁবুটি এবার আমার চোখে পড়লো। সূর্য তখন পাটে বসেছে। পশ্চিম দিগন্ত সবে লালে লাল হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার নীল নির্মেঘ আকাশে তখন দেখা দিয়েছে শুকতারাটি। রতিদেবী 'ভেনাস'।

ছেঁড়া নোংরা জামা-কাপড় পরা এক দঙ্গল ছেলেমেয়েকে দেখতে পেলাম। ওরা তখন ঘাসের ওপর গড়াগড়ি লুটোপুটি খাচ্ছিল। আমাদের দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালো। পিছু নিলো আমাদের। তিনটি যুবক বৃদ্ধ এক জিপসীকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। বৃদ্ধটি তখন কি একটা মেরামত করছিল। যুবকরা কটমট করে তাকালো আমাদের দিকে। জিপসী মেয়েটা তখন আমার একখানি হাত ধরে আমায় নিয়ে গেলো তাঁবুর মধ্যে।

এক বৃদ্ধা জ্বলন্ত উনুনে কি যেন একটা সিদ্ধ করছিল প্রকাণ্ড একটা পাত্রে। আমার ছোট সঙ্গিটি তার কাছে ছুটে গিয়ে কি যেন একটা বললো আবদারের সুরে। ওর কথা এক বর্ণও আমি বুঝতে পারলাম না। তবে দেখলাম বৃদ্ধাটি ওর কথা শুনতে শুনতে কয়েকবার আমার দিকে তাকালো। যাচাই করে নিলো বুঝি আমায়। প্রথম প্রথম বুঝি মাথা নাড়লো অনিচ্ছার সঙ্গে। পরে কিছুটা বুঝি মন গললো। কথাবার্তা বলতে লাগলো সহজ সুরে।

জিপসী মেয়েটাকে আমার ভয়ানক ভালো লেগে গেল। তার আকর্ষণ কিছুতেই আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম রীতিমত। একসময় সে আমার মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালো। বললো :

'তোমার যতদিন খুশি তুমি ততদিন থাকতে পার এখানে। কিন্তু দাঁড়াও, তোমার কাছে টাকা-কড়ি কি আছে?'

টাকার কথা শুনে মনটা আমার বিষিয়ে উঠলো। স্বপ্নসৌধ পড়লো বুঝি লুটিয়ে। জিপসী মেয়েটা কি আমার কাছে কত টাকা আছে জেনে নিতে চাইছে? টাকার বিনিময়ে জিপসীদের আতিথেয়তা? তাদের প্রীতি-ভালবাসা কি এতই ঠুনকো? কেনা-কাটা যায় টাকা দিয়ে? এদের দয়া-দাক্ষিণ্য কিনতে হয়?

আমি তাই জানিয়ে দিলাম, 'যদি এখানে কিছুদিন আমি থাকি তার বিনিময়ে যে টাকা দিতে হবে তা আছে আমার কাছে।'

আমার জবাব শুনে মেয়েটার মুখখানা কিন্তু শুকিয়ে গেল। তীব্র দৃষ্টি হেনে তাকালো সে আমার দিকে। বললো:

'তুমি আমাকে ভুল বুঝেছো। আমাকে তুমি অমন ভাববে কখনো আশা করি নি। আমি শুধু তোমার নিরাপত্তার জন্যই বলছিলাম। কেননা এখানে টাকাকড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা করা খুবই বিপজ্জনক।'

মেয়েটি একটু থামলো। বললো: 'তোমার কাছে যা আছে সব ঠাকুমার হাতে দিয়ে দাও। যখন যাবে তখন তিনি তোমার টাকা তোমাকে দিয়ে দেবেন। পাই-পয়সাটাও খোয়া যাবে না।'

আমার বুক থেকে একটা গুরু-ভার বুঝি নেমে গেল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বৃদ্ধার হাতে সব টাকাটা তুলে দিলাম। আর বৃদ্ধা তা নিয়ে (একুনে চোদ্দ পাউন্ডের মতো) অবলীলাক্রমে নিজের পকেটের মধ্যে চালান করে দিলো।

'তোমার টাকা ঠিকই থাকবে।' মেয়েটা বললো মাথা তুলে। তারপর হেসে বললো: 'তা মাত্র চোদ্দ পাউন্ড। আমি তো ভাবলাম, হাজার পাউন্ড হবে বুঝি।'

বেশ তো মেয়েটি। ওর কথা শুনে আমার রাগ-অভিমান সব উবে গেলো। চঞ্চল চোখদুটিও ওর ছলছল করে উঠলো।

বৃদ্ধা এবার উঠে গিয়ে উনুন থেকে এক হাতা গনগনে আগুন তুলে এনে সামনে মাটির ওপর দিলো ছড়িয়ে। তারপর আমায় বললো:

'এবার আগুনটার ওপর গিয়ে দাঁড়াও।'

জিপসী মেয়েটাকেও বুঝি কি যেন বললো ওদের ভাষায়।

সে অমনি বাইরে ছুটে গিয়ে ডেকে আনলো অন্যান্য জিপসীদের। ওদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে-মেয়েও রয়েছে। সংখ্যায় জন বারো হবে। ওরা সবাই এসে জড়ো হলে বৃদ্ধা তখন আমার ডানহাতখানা নিজের মুঠোয় তুলে নিলো। আমার পায়ের কাছে আগুন দেখিয়ে কি যেন বললো ওদের ভাষায়। শ্রদ্ধার সংগে তাই শুনলো সবাই।

বৃদ্ধার কথা শেষ হলে ওরা কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর জনে জনে এগিয়ে এসে স্বাগত জানালো আমাকে। মুখের ভাষা ও আকার-ইংগিতে আমায় জানিয়ে দিলো ওদের তাঁবুতে আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবো এখন থেকে।

আমিও নিজেকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করতে লাগলাম। যাকে পেতাম তার সংগেই আলাপ জমাতাম হাসি খুশি হয়ে। ওরা অবশ্য গায়ে পড়ে কিছু একটা বলতো না। আমি যা বক বক করে বলে যেতাম তাই শুনতো। মজাও বুঝি পেত। আগুনের বড়ো চুল্লিটাকে আমরা সবাই ঘিরে বসতাম প্রাচীন প্রাচ্যরীতিতে। উনুন থেকে তখন প্রকাণ্ড সে হাড়িটা নামানো হোত। আর গরম গরম খাবার তা থেকে পরিবেশন করা হোত আমাদের। তার মধ্যে আলু, রুটি, নানান তরি-তরকারীর সংগে মাংসের টুকরোও থাকতো। আমি অভ্যস্ত না হলেও জিপসীদের ঐ 'পোরিজ' আর 'স্টু' খেতে নেহাৎ মন্দ লাগতো না।

থুড়থুড়ে বৃদ্ধাটি বুঝি জিপসীদের রানীমা। তাঁবুর সর্বেসর্বা। রানীমা কিন্তু এসব খাবার গ্রহণ করতো না। তার জন্য আলাদা করে ছোট হাঁড়িতে রান্না চাপানো হোত সেকেলে প্রথায়। পরে আমি জেনে-ছিলাম, রানীমা নাকি এখনো সেকেলে। প্রাচীন জিপসীদের চাল-চলনে, খানাপিনায় বিশ্বাসী। যে জন্তুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি এমন কোন প্রাণীর মাংস বুড়ি রান্না করতো না। তাই ওর রাতের খাবার বেশির ভাগ সময় ফাঁদে-ধরা-পড়া কোনো সজারুর সেদ্ধ মাংসই হোত।

পাঁচ-ছদিন আমি বেশ কাটালাম এসব ভবঘুরে অপরিচ্ছন্ন যাযাবরদের সংগে। আমার কিন্তু মাঝে মাঝে ভয় হোত, ওদের এ সহৃদয় আতিথেয়তার মূল্য শোধ করতে হবে আমায় হয়তো গুড়ায়-গণ্ডায়। অপরের হাঁস-মুরগী আত্মসাৎ করা বা চুরি করা বা অমন ধারা চুরি-

চামারির ব্যাপারেও আমায় হয়তো জড়িয়ে পড়তে হবে একদিন। কি করেই বা এড়াব? তবে সৌভাগ্যের কথা, আমাকে কখনও ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।

তাছাড়া কোনো জিপসীকে অপরের হাঁস-মুরগী চুরি করতে আমি দেখিনি স্বচক্ষে। জ্বলন্ত উনানের পাশে খাবারের পাত্র সামনে রেখে খেতে বসে ঝলসানো ঐ হাঁসটি কার—আমার না তোমার: তোমার না আমার—এ নীতিবোধ আমার মনে তখন জাগত না। জিপসী পুরুষদের দেখতাম ভোরবেলা তাঁবু থেকে বেরিয়ে যেতো খচ্চর নিয়ে। আর সংগে থাকতো মেরামতী করার টুকি-টাকি সাজ-সরঞ্জাম। কোনো কোনো দিন দুপুরবেলা ফিরতো ওরা তাঁবুতে। কোনো কোনো দিন বা রাত হয়ে যেত।

মেযেরা সব বেরোত ভাগ্য গুণতে। ছেলে-পিলেরা খুঁজতো কোন আগন্তুক এলো কিনা। যদি কারোর সন্ধান পেতো, তাঁবুতে তাকে আনবার জন্য পীড়াপীড়ি করতো। বৃদ্ধা রানীমা সারা দিন উনান আগলে বসে থাকতো চুল্লির পাশে। আমাদের জিপসী মেয়েটিও ভাগ্য গণনা করতে বেরোতো ওদের সংগে। কিন্তু পথের ধারে একটা জায়গায় সে অপেক্ষা করত আমার জন্য। আমিও যথা সময়ে মিলিত হতাম তাব সংগে। সবুজ মাঠের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতাম অনেক দূর। কোনো কোনো দিন নদীর ধারে গিয়ে আমবা বসতাম ঘাসের ওপর। গল্প-গুজব করতাম অনেকক্ষণ ধরে।

আমার মনে হোল আমায় বুঝি পছন্দ করে মেয়েটা। তবে এ থাকে বনে, ঠিক প্রেম-ভালোবাসা নয়। তার আগ্রহের মূলে রয়েছে ইউরোপীয় এক যুবকের প্রতি ভারতীয় এক যাযাবরী কুমারী কন্যার বন্য, নিষ্পাপ অনুরাগ। কেননা ঘোড়-সওয়ার কোনো যুবককে পথে দেখলেই অমনি তার মধ্যে জন্মগত প্রবৃত্তিটি জেগে উঠত। একবার তো এক ঘোড়-সওয়ারকে দেখে সে অমনি তড়াক করে আমার পাশ থেকে উঠে পড়লো। আর পিছু পিছু ধাওয়া করলো সেই ঘোড়-সওয়ারের। চীৎকার করে তাকে থামালো। তারপর তার হাতের তেলো ধরে ভাগ্যগণনা করতে বসে গেলো।

এক সময় সে আবার ফিরে এলো আমার কাছে। হাতের মুঠোয়

তার চকচকে একটা আধ-মোহর। আহ্লাদে সে তখন আটখানা।

মুখ ফিরিয়ে আমি উঠে পড়লাম। একা একা চলতে শুরু করলাম। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো এক মুহূর্ত। তারপর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো আমার গলা।

'তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছো?'

'রাগ! না-না-না!' আমি জবাব দিলাম।—'কিন্তু কোনো ছেলে-ছোকরার পিছু অমন ধারা ছোটা কী—'

'ওহ, হিংসে হচ্ছে বুঝি? তা আমি খুশি হয়েছি!'

সে হেসে উঠলো।—'তা হলে তুমিও আমার কথা ভাবো একটু-আধটু!'

ঝোঁকের মাথায় সে তখন পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমায় চুমু খেলো। আমিও তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম। সে কিন্তু সহজে ধরা দিলো না। নিজেকে মুক্ত করে নিলো সাপের মত পিছলে গিয়ে। তারপর ছুটতে শুরু করলো তাঁবুর দিকে। নিজের ওপর তার যেন কোনো আস্থা নেই। ভয় বুঝি আমাকে।

একদিন সকালবেলা দেখলাম সে চুপচাপ বসে আছে। ভয়ানক গম্ভীর দেখাল তাকে। বিরক্ত হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম:

'অমন চুপচাপ বসে আছো কেন?'

সে কিন্তু এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। আমায় সহসা প্রশ্ন করে বললো:

'আচ্ছা, বলো তো, সত্যি করে বলো তো, তুমি কি আমায় সত্যি সত্যি ভালোবাসো?'

'বাসি না? সত্যি ভালোবাসি।' আমি জবাব দিলাম।

'তুমি আমায় সাদি করবে?'

'সাদি? তোমায়?'

আমি বিস্ময়ে ফেটে পড়লাম।—'শেষ-মেষ কিনা সাদি। না-না আমি তোমার সংগে প্রতারণা করতে পারবো না। সে অসম্ভব।'

'আমি অবশ্য তা বলছি না,' কণ্ঠস্বর তার শোনাল অনেকটা আর্তনাদের মতো। তবে আমার এ প্রত্যাখ্যানে সে খুব একটা ভেঙে

পড়েছে বলে মনে হোল না। বললো :

'সাদি বলতে তুমি যা মনে করছো আমি তা বলছি না। আমি তা কল্পনাও করি নি। আমরা যেমন সাদি করি তেমন সাদি তুমিও কর না কেন?'

'সে সাদি কেমন তরো?'

'তোমাকে একতাল পোড়ামাটি—ধরো একখানা টালি সমান দু'ভাগে ভাঙতে হবে আমার সঙ্গে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, ঠাকুরমার সামনে। ভাঙলেই সাদি হয়ে গেল। মেয়াদ তার মাত্র পাঁচ বছর। বেশি না।'

গলাটা এবার সে খাদে নামালো। বললো :

'তুমি যদি চাও তার আগেই আমায় ত্যাগ করতে পারো। তুমি চাইলে আমি আটকাবো কি করে?'

আহা। নেহাৎ ছেলেমানুষ! হ্যাঁ, ছেলেমানুষ তো বটেই! বয়সেও, এমন কি মনের দিক থেকেও।। হায়, অমন মেয়ে পায়ে ঠেলে আমি কিনা বউ খুঁজে মরছি।

এ ঘটনার দিন দুই পর আমি আর ওকে দেখতে পেলাম না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা এবং তার পরদিনও আমি প্রথম লক্ষ্য করলাম, সেই তিন জিপসী যুবকের মধ্যে দু'জনের আমি মহা বিরাগভাজন হয়ে উঠেছি। আমি কিছু বলতে গেলে ওরা তার জবাব দেয় রূঢ় অশিষ্ট ভাষায়। এমনি করে বুঝি ওরা আমায় বুঝিয়ে দিতে চায় আমার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। অনেকদিন আমার থাকা হয়ে গেছে এবার মানে মানে সরে পড়ার পালা! আর কোনো পথ নেই!

পথের ধারে আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় যখনই আমি মিমির সঙ্গে (জিপসী মেয়েটাকে আমি মিমি নামেই ডাকতাম) দেখা করতে যেতাম, ওরা তখন আমার পিছু নিতো। আমাদের পাশ ঘেঁষে বসতো, তাকাতো কটমট করে আমাদের দিকে। মুখে কিছু কিন্তু বলতো না।

মিমি উঠে গিয়ে কি সব যেন বলতো ওদের অনেক সময়। দু'পক্ষে তখন জোর কথা কাটাকাটি হতো। চড়া গলাও শোনা যেতো। শেষ-

মেষ ওরা উঠে গিয়ে বসতো অন্যত্র একান্ত অনিচ্ছার সংগে। ওদের সংগে কি নিয়ে এতক্ষণ কথাকাটাকাটি হয়েছে মিমি তা বলতে চাইতো না। তবে সারা দিন তার মুখে কোনো হাসি থাকতো না। চিন্তিতও দেখাতো।

রাত তখন গভীর। আমি আমার আস্তানার এক কোণে গিয়ে শুয়েছিলাম। আর আগুনের চুল্লিটার দিকে তাকিয়েছিলাম ঘুমে ঢুলু-ঢুলু চোখে। জিপসীরাও সবাই যে যার জায়গায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বৃদ্ধা রানীমা কিন্তু তখনও জেগে। টুলে বসে আছে তখনও। হঠাৎ দেখলাম মিমি চুপি চুপি এসে ঠাকুরমার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ঠাকুরমার কোলের ওপর একটা হাত রেখে ফুঁপিয়ে উঠলো সে একসময়। তাকে শান্ত করার জন্য ঠাকুরমা মাথাটা টেনে নিলো ওর। চুলের কালো বেণীর ওপর মৃদু আঘাত করলো বার কয়েক। কারো মুখে কিন্তু কোনো কথা নেই। দু'জনে একসময় উঠে দাঁড়ালো। সন্তর্পণে পা ফেলে তারপর এলো তাঁবুর বাইরে।

আমার মহা কৌতূহল হোল। কিছুটা অনুকম্পাও বুঝি। আমি একবার তাকিয়ে নিলাম চারদিক। সব নিস্তব্ধ; চুপচাপ। আস্তানা ছেড়ে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। একটা চক্কর মেরে এলাম তাঁবুর চারপাশ। সবাই ঘুমে ঢুলছে। কেউ কেউ শুয়ে আছে একে অপরকে জড়িয়ে। কেউ বা গুঁড়িসুড়ি হয়ে আলাদা। খোলা আকাশের নিচে আমি এগিয়ে চললাম। দেখলাম, মিমি আর তার ঠাকুরমা বসে আছে এক ওক্ গাছের ছায়ান্ধকারে।

মিমি তখনও কাঁদছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম:

'মিমি, কাঁদছো কেন?'

বৃদ্ধা ঠাকুরমা অমনি তার তর্জনীটি ঠোঁটের ওপর রেখে নিষেধ করলো আমায় কোন কথা না বলতে। তারপর বনের ছায়াচ্ছন্ন এক নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বসলো নিজে। নির্দেশ দিলো আমাদেরও তার অনুসরণ করতে। মিমির মুখে তখনও কোনো কথা নেই। দু'হাতের মধ্যে মুখখানি তার ঢাকা। এক নির্জন স্থানে এসে বৃদ্ধা আমায় বললো:

'তুমি এবার চলে যাও এখান থেকে। তোমার কিন্তু ভয়ানক বিপদ।'

'কেন ?'

'ছেলে-ছোকরার দল তোমায় হিংসে করছে। ওরা ভয়ানক খেপে গেছে। আমি আর ওদের সামলাতে পারবো না। অন্য সব ব্যাপারে ওরা আমার কথা শুনবে। কিন্তু মন দেওয়া-নেওয়ার বেলায় ওরা আমার কোনো কথা শুনবে না। তুমি এখান থেকে এক্ষুণি চলে যাও।'

'যতসব বাজে কথা! এসব হাঘরে বাউণ্ডুলে ছেলেদের আমি তোয়াক্কা করি না। এক দঙ্গল এলেও না। ওরা আমার কি করবে? মার-ধোর করবে? আমি ওদের চোখ-রাঙানিকে ভয় করি না। মিমিকে আমি হাতছাড়া করবো না। করতে আমি পারবো না—।'

'না।'

মিমি কখন এসে আমাদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, খেয়াল করিনি। দু'হাতে সে আঁকড়ে ধরলো আমাকে। বললো : 'না' তোমাকে নিশ্চয়ই যেতে হবে এখান থেকে। তোমার হাতেও লেখা আছে বিপদের কথা।'

'আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি।'

বুড়ো ঠাকুরমাও বলে উঠলো জোরের সঙ্গে। —'তা ছাড়া, ওর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করা তোমার আর শোভা পায় না। ছেলেরা যদি এখন কিছু করে বসে, যদি চাকু চালায়, আইন-আদালত তখন কি করবে? আমি তো একবার এক জিপসীর ফাঁসি হতেও দেখেছিলাম। তাতে শুধু আমাদের দুঃখ-দুর্দশাই বাড়ে। আর কিছু না।'

বুড়ো একবার দম নিল। একটু থেমে আবার বললো :

'তুমি আর ওর মন পাবে না। শুধু শুধু আমাদের আর সর্বনাশ ডেকো এনো না। তুমি এবার যাও।'

'মিমি! মিমি! তুমি যাবে না আমার সঙ্গে?'

মিনতির সুরে আমি বলে উঠলাম।

'যেতে সে পারে না! ও হোল জাত জিপসী মেয়ে। সৎ বংশে জন্ম। ওর কথা ওকেই বলতে দাও।'

'না, না, আমি আমার জাতভাইদের ছাড়তে পারবো না।'

ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠলো মিমি। আবার বললো : 'কথা দিচ্ছি তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। তোমার ঠিকানা আমায় দিও। রাগ কোরো না। আমায় ছাড়াও তোমার দিন কাটবে। আমি কথা

দিচ্ছি, পরে একদিন আমি যাবো তোমার কাছে।'

বৃদ্ধা ঠাকুরমার কাছ থেকে সে আমায় টেনে নিয়ে গেলো দূরে। কথা বলতে বলতে চুমু খেতে লাগল আমার দু'হাতে। হাত দু'খানা আমার ভিজে উঠল ওর চোখের জলে।

অবশেষে আমি চ'লে যেতে রাজী হলাম। নাম-ঠিকানা আমার দিলাম মিমিকে। শীত পড়ার আগে সে আমায় খুঁজে বার করবে কথা দিলো।

ওরা পীড়াপীড়ি শুরু করলো, আমি যেন এখনই বেরিয়ে পড়ি। আমিও গোঁ ধরলাম। রাতের অন্ধকারে ভীরু কাপুরুষের মতো আমি পালাবো না কিছুতেই শত্রুদের ভয়ে। আমি ঠিক যাবো, তবে যাবো এখন নয়, দিনের বেলা সকলের সামনে দিয়ে মাথা তুলে। বৃদ্ধা জিপসীটি আমার প্রতিপক্ষকে আশাকরি কিছুটা শান্ত করবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে। এ প্রতিশ্রুতি আমায় দিলো সে। আমিও বললাম, ওরা যদি আমায় আরো হপ্তাহ দুই থাকতে দেয় আমি তাহলে আমার টাকা সব ওদের দিয়ে দেবো।

বৃদ্ধা মাথা নাড়লো। তারপর মিমির হাত ধরে তাঁবুর দিকে পা বাড়ালো। ক্রুদ্ধ বিমর্ষ হয়ে ঘণ্টাখানেক আমি ওখানে বসে রইলাম। তারপর একসময় উঠে ফিরে এলাম আমার আস্তানায়।

তাঁবুর আগুনটা তখন নিবু নিবু হয়ে এসেছে। অন্ধকার জমাট বেঁধেছে চারিদিক। আমার চোখ দুটি ঘুমে জড়িয়ে আসছিল, আমি ঘুমে ঢুলে পড়লাম। তারপর যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখি তাঁবুর চারিদিকে লোকজন সব জড়ো হয়েছে। প্রতিপক্ষ সেই যুবক তিনজন এবার এগিয়ে এসে আমার করমর্দন করলো হাসিখুশি হয়ে। তাই দেখে আমার মনে হোল, ওরা বুঝি টোপ গিলেছে। আমি আমার টাকা-পয়সা সব দিয়ে দেবো, ওরা হয়তো আমায় আরো কিছুদিন থাকতে দেবে এখানে।

কিন্তু তা নয়। ওদের মধ্যে যে ছিল সব চাইতে ঢ্যাঙা, সে এগিয়ে এসে বললো :

'তুমি এবার উঠে পড়ো। অনেকখানি পথ। আমরা এগিয়ে দিচ্ছি। তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

আশেপাশে আমি তাকালাম। না, কোথাও নেই। মিমিকে দেখলাম না কোথাও। বুড়ি রানীমাকে দেখলাম শুধু। সামনে বসে ঠাকুরমা আমায় খাওয়ালো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমি নিচুগলায় একসময় শুধালাম :

'যাবার সময় মিমিকে একবার দেখতে পাবো না ?'

'চুপ। কোনো কথা না।'

বুড়ি আমায় চুপ করতে বললো। খাটো গলায় বললো : 'ও যা ভালো বোঝে তাই করবে।'

আমি আমার জামা-কাপড়ের পুঁটলিটা নিঃশব্দে কুড়িয়ে নিলাম। তারপর যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি এমন সময় বুড়ি রানীমা এগিয়ে এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেলো আড়ালে। আর হাতের মধ্যে গুঁজে দিলো আমার সে টাকাটা।

'গোটা কয়েক থাক না।' আমি বলে উঠলাম।

'না। পাই-পয়সাও না। মিমি তাহলে আমায় কখনও ক্ষমা করবে না। এসো আর দেরি কোরো না। অনেকখানি পথ যেতে হবে। দুপুরে আবার ঝড় উঠবে। মন খারাপ কোরো না। বরাত তোমার ভালো। ভাগ্য সুপ্রসন্ন।' অমন ভবিষ্যৎবাণী শুনেও আমার কিন্তু একটুও আনন্দ হোল না; কিংবা জিপসীরা সবাই আমার পিছু পিছু অনেক খানি হেঁটে এসে আমায় সম্বর্ধনা জানালো দেখেও। আপন মনে আমি পথ ধরে চলতে লাগলাম। প্রায় মাইল তিনেক পথ যখন হেঁটে এসেছি তখন দেখলাম পথের ধারে ঝাঁকড়া মাথাওয়ালা গাছের ডাল-পালা গুলো একটু দুলে উঠলো। আর একটু পরেই মিমির কালো মাথাটা চাড়া দিয়ে উঠলো ডালপালা ছাড়িয়ে। গাছ থেকে সে নেমে এলো সংগে সংগে। আর এসে দাঁড়ালো আমার পাশে। আমায় সে জড়িয়ে ধরলো দু'হাতে। আমার চোখে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত সে তাকিয়ে রইলো নিথর, নিস্পন্দ, নির্বাক্। তারপর দু'হাতে আমার মুখখানা একটু নিচু করে চুমু খেলো সাদরে। দুখানি হাতেও আমার চুমু খেলো সে অজস্র। চুমু খেলো পোশাকেও। তারপর হঠাৎ ছিটকে গিয়ে ডানহাতের তর্জনী দিয়ে নিজের হাতের তেলোটা দেখিয়ে বললো :

'আমার দুঃখদশা শুরু হয়েছে এরই মধ্যে। সারা জীবন আমায়

তা ভোগ করতে হবে।'

'না, না, মিমি। তুমি তো কথা দিয়েছ, আমাদের আবার দেখা হবে।'

'হাঃ! হাঃ! জিপসীর কথা দেওয়া।' করুণ ভাবে বললো মিমি।

সে তারপর ছুটে গেল বনের দিকে। আর হারিয়ে গেল গাছ-পালার আড়ালে। পিছু পিছু তার আমিও ছুটলাম। কিন্তু ছোটা হোল সার। তাকে আমি খুঁজে পেলাম না। আর কখনও দেখিনি তাকে।

বহু জিপসীকে আমি তার কথা জিজ্ঞেস করেছি। খোঁজ নিয়েছি এরই পরে। কিন্তু কেউ সন্ধান দেয়নি। একেক জন এক এক রকম বলেছে। হয়তো দু'দিনেই সে ভুলে গেছে আমায়। আর হয়তো তাদের জাতের কোনা যুবককে বিয়ে করে বসেছে নিজেদের রীতিতে। তাছাড়া আমাদের আর দেখা হোলেই বা কি হোত? সে কি আমায় আবার চিনতে পারতো?

জিপসী-সৌন্দর্য হারিয়ে যায়, তাড়াতাড়ি উবে যায় মায়া-মরীচিকার মতো—সব রকমের রোমাঞ্চের মতো।

২

বহু বছর, অনেক বছর হোল —

বহু বছর আগের ছোট্ট একটি জিপসী মেয়ের কথা। বয়েসী এক ওক গাছের ছায়ায় বসে সে আপন মনে খেলাধূলো করতো।

একদিন হয়েছে কি, ওই ওক গাছের নিচে দিয়ে যাচ্ছিল এক জমিদারের ছেলে ঘোড়ায় চড়ে। দেখা হয়ে গেল তার জিপসী কন্যার সঙ্গে। ওর রূপে মুগ্ধ হয়ে সে ঘোড়া থামালো। বললো :

'যাবে তুমি আমাদের বাড়ি? আমি তোমায় বউ করবো।'

জিপসী কন্যা উত্তরে বললো : 'না গো বাবু, তা হয় না। আপনি হলেন কত বড়লোকের ছেলে। আর আমি, আমি এক গরীব জিপসী মেয়ে। আমার মত মেয়েকে কি আর আপনারা বউ করতে পারেন?'

কিন্তু ছেলেটি নাছোড়। জিপসী মেয়েটিকে জোর করেই ঘোড়ার পিঠে তুলে নিলো আর সোজা এসে পৌঁছুল নিজের বাড়িতে। আর এমনি নিয়ে আসাই শুধু নয়, জোর করে তাকে বিয়েও করে ফেললো।

এদিকে জিপসী মেয়েটিকে দেখেই গিন্নীমা তো রেগে আগুন। ছোট জাতের এক জিপসী মেয়েকে ছেলের বউ করতে তিনি কিছুতেই রাজী ছিলেন না। ছেলেকে ডেকে তাই চুপি চুপি বললেন :

'তুই এক কাজ কর্, ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে নিয়ে যা 'শতেক মাইল'-এর বনে। সেখানে নিয়ে গিয়ে ওকে বধ করে আয়। আর মেরে ফেলবার আগে কাপড়-চোপড় সব ওর খুলে নিস্। আর সেসব কাপড়-চোপড় আর হৃৎপিণ্ডটি তার নিয়ে আসিস্ সঙ্গে করে।'

মা'র কথামত ছেলেটিও তাই করেছিল। জিপসী কন্যাকে গিয়ে বললো : 'চলো একবার আমরা দু'জনে বেড়িয়ে আসি ঘোড়ায় চড়ে।'

সরলভাবে জিপসী কন্যাও বিশ্বাস করেছিল। ঘোড়া নিয়ে এলে জমিদার পুত্র ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো আর তার পিছনে বসলো মেয়েটি। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা দু'জন তখন চললো 'শতেক মাইল' বনের দিকে।

এ বন সাজানো-গুছানো মন-ভুলানো উদ্যান নয় কিন্তু এ হোল সত্যি-কারের বনভূমি। গভীর এই বনে আছে বাঘ, ভালুক, সাপ, নেকড়ের দল আর ঈগল পাখির ঝাঁক। সে বনে জিপসী কন্যাকে নিয়ে এসে জমিদারের ছেলে বললো : 'দ্যাখ, মা আমাকে বলে দিয়েছেন, এখানেই তোমাকে মেরে ফেলতে। তুমি তোমার কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেল। তোমার হৃৎপিণ্ড আর কাপড়-চোপড় নিয়ে গিয়ে মাকে আমার তা দেখাতে হবে।'

তাই শুনে জিপসী কন্যা ওর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লো। বললো :

'আমায় মেরে ফেলবেন না বাবু। এই বনেই আছে এক বুড়ো ঈগল। আমার বদলে ওটাকে বধ করে ওর হৃৎপিণ্ড কেটে নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। আর মাকে নিয়ে তাই দেখান। ঈগল পাখির হৃৎপিণ্ডটি ঠিক আমার মতোই। আর তাই নিয়ে সৎ খ্রীস্টানটির মতো আমায় আপনি রেহাই দিন।'

জিপসী মেয়ে তার কাপড়-চোপড় সব খুলে ওর হাতে তুলে দিলো। আর জমিদারের ছেলে সেই বুড়ো ঈগল পাখিটাকেই বধ করে হৃৎপিণ্ডটা কেটে মাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল আর বলেছিল :

'এই দেখ মা, জিপসী মেয়েটাকে বধ করে এলাম।'

ঘোড়ার খুরের ধুলো উড়িয়ে জমিদারের ছেলে ফিরে চলেছে। জিপসী কন্যা সেদিকে কান পেতে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর ঘোড়ার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই সে উঠে বসলো। তারপর দু'চোখ যেদিকে যায় সেদিকে চলতে লাগলো হামাগুড়ি দিয়ে।

হামাগুড়ি দিয়ে সে চলছে তো চলছেই। চলার আর বিরাম নেই। হাত আর হাঁটুদুটো তার ক্লান্তিতে অবশ হয়ে এলো। তবু সে চলতে লাগলো। শেষে একসময় সন্ধান পেল সে এক মানুষ-চলার পথের। পথের ওপর কারো পায়ের শব্দ শুনলেই সে পথের ধারে কোনো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়তো।

একদিন হয়েছে কি, সেদিন সকালবেলা এক ভদ্দর লোকের ছেলে ঘোড়ায় চড়ে আসছিল সেই পথ ধরে। ওকে আসতে দেখে জিপসী কন্যা তখনি লুকোল গিয়ে এক ঝোপের আড়ালে। কেননা, তার তখন ভয় হয়েছিল ; জমিদারের ছেলেটিই বুঝি আবার তাকে ধরবার জন্য ফিরে

এসেছে। এবার নির্ঘাৎ নিয়ে গিয়ে তাকে সে বধ করবে, শুধু তাই নয়, লুকিয়ে পড়েছিল সে কেন না, তার তখন খুব লজ্জাও করছিল। পরনের কাপড় চোপড় সব সে তো নিজেই খুলে দিয়েছে। ঝোপের আড়ালে ওকে কিন্তু দেখতে পেয়েছিল ভদ্দর লোকের ছেলেটি। ঘোড়া থামিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো :

'কে তুই ওখানে ? ভুত-পেত্নী যদি হোস এক্ষুণি তবে সরে পড়। আর যদি কোনো জ্যান্ত খ্রীস্টান মানুষ হোস তবে কথা বলু আমার সঙ্গে।'

তাই শুনে জিপসী কন্যা সরাসরি জবাব দিলো :

'আমি গো তোমার মতই খ্রীস্টান মানুষ। তবে কি জান, আমার যে জামা-কাপড় কিছু নেই পরনে।'

তাই শুনে ছেলেটা তার গায়ের চাদরখানা ছুঁড়ে দিলো ওর দিকে। জিপসী মেয়েটা অমনি চাদরখানা লুফে নিলো হাত বাড়িয়ে আর জড়িয়ে নিলো নিজের গায়ে। ছেলেটা তখন বললো :

'আমার পেছনে এবার বসে পড় ঘোড়ার পিঠে।'

জিপসী মেয়েটা তাই করলো। এক লাফে সে চড়ে বসলো ঘোড়ার ওপর। আর ছেলেটা টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো তাদের বাড়ির দিকে। সে বুঝতে পারলো জিপসী মেয়েটাকে মেরে ফেলার জন্য বনে নিয়ে এসেছিল কেউ-না-কেউ। তাই সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো জোর কদমে।

ওরা যখন বাড়ি এসে পৌঁছল তখন তো সবাই অবাক্। ছেলে আবার নিয়ে এলো হা-ঘরে কোন দেশী মেয়ে! গায়ে ওর জামা-কাপড় কিছু নেই। কালো কুচকুচে একরাশ চুল লুটিয়ে পড়েছে পিঠে। সবাই তাই ওকে ঘিরে ধরলো। জিজ্ঞেস করলো বনে একা একা সে কি করছিল ?

মেয়েটা তখন সব কথা খুলে বললো। তাই শুনে বাড়ির লোকজন জামা-কাপড় নিয়ে এসে ওকে পরতে দিলো। ঝকঝকে সুন্দর সে জামা-কাপড় পরলো মেয়েটি আর তখন কি সুন্দরই না দেখাচিছল তাকে। ওকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই, বলাবলি করতে লাগলো : 'এমন সুন্দর মেয়ে পৃথিবীতে আর দু'টি নেই।'

ওকে পেয়ে ছেলেটিরও খুশি আর ধরে না। কর্তা-গিন্নী ছেলের সঙ্গে জিপসী মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন। বললেন : 'অমন মেয়ে ঘরে এলো, সবাই মিলে এবার একটু খানাপিনা করা যাক। গাঁয়ের পাঁচ

জনকে নেমন্তন্ন করা যাক।'

বাপ-মা তাই খানা-পিনার আয়োজন করলেন একদিন।

মান্য-গণ্য অনেকেই এসে উপস্থিত হলো ওদের বাড়িতে। আর সে ভোজসভায় জিপসী মেয়েটার সঙ্গে বাড়ির কর্তা-গিন্নী পরিচয় করিয়ে দিলেন নিমন্ত্রিত সবার সঙ্গে। এবার হয়েছে কি, সেই নেমন্তন্নে উপস্থিত হলেন গাঁয়ের সেই জমিদারবাবুর ছেলে আর তার মা। জিপসী মেয়েটাকে দেখেই ওঁরা চিনে ফেললেন। মেয়েটা তাহলে মরেনি। জমিদারের সেই ছেলেটা তাই এগিয়ে এসে বললো:

'সবাই নাচগান করছে। তুমিও একটা গান করো।'

'আমি গান করবো না।' জিপসী মেয়ে জবাব দিলো। বললো:- 'আমি শুধু একটা গল্প বলবো। সবাই শুনুন।'

'বয়েসী ওকের ছায়ায় আমার ছিল বাস,
নিজের মনে খেলা করেই কাটতো অবকাশ।
জিপসী থেকে হঠাৎ কিনা ভদ্দর ঘরের মেয়ে—'

'ধ্যুৎ ছাই, এ আবার গল্প নাকি?' ওর আগেকার স্বামী, জমিদারের সেই ছেলেটা হঠাৎ বলে উঠলো। জিপসী মেয়ে এরপর কি বলবে তা আর তার বুঝতে বাকী রইলো না।

'না, না। তুমি বলে যাও গল্পটা বেশ লাগছে কিন্তু।' বলে উঠলো তার নতুন স্বামী।

জিপসী মেয়ে তাই শুরু করলো:

'বয়েসী ওকের ছায়ায় আমার ছিল বাস,
নিজের মনে খেলা করেই কাটতো অবকাশ,
জিপসী থেকে হঠাৎ কিনা ভদ্দর ঘরের মেয়ে,
ভেবেছিলুম ভাগ্যবতী আর কে আমার চেয়ে,
তারপরেতেই বনের ভেতর মেরে ফেলার চাল,
মা-ছেলে ঐ বসে আছেন ফুলিয়ে তাদের গাল।'

—এই বলে সে নিমন্ত্রিত লোকজন সবাইকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো বড়লোকের সেই ছেলেটিকে আর তার বুড়ী মাকে। বললো: 'ওরাই, ওরাই একদিন আমাকে ভুলিয়ে বনে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিল। চেয়েছিল আমার হৃৎপিণ্ডটা।'

এ কথা শুনে নিমন্ত্রিত লোকজন সবাই ক্ষেপে উঠলো। আর এমনি রেগে গেলো যে, মা ও ছেলেকে জ্যান্তই পুঁতে ফেললো ঘটনাস্থলে।

এরপর জিপসী কন্যা নতুন ঘরসংসার পেতে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলো।

বোধ হয় কুচকুচে কালো কেশবতী এই জিপসী মেয়েটির নাম জানতে চাইছেন আপনারা? কোথায় তার দেশ কোথায় তার বাস জিজ্ঞাসা করছেন? অমন মেয়ের নামধাম কার না জানতে ইচ্ছা করে, বলুন? এই খবরটুকু কিন্তু আমার জানা হয়ে ওঠেনি।

আপনারাই বরং খোঁজ-খবর করে নিন।

৩

এক যে ছিল গরীব ছেলে। একদিন পথ ধরে সে চলেছে তো চলেছে। হাঁটছে আর হাঁটছে—এই আশায়, যদি কেউ তাকে কাজে ডেকে নেয়। তাহলে সে বুঝি খেয়ে-পরে বাঁচতে পারবে।

এমনি চলতে চলতে পথে দেখা হলো এক পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে। পুরুত ঠাকুর তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

'কোথায় চলেছো বাবা?'

'যাচ্ছি, কোনো কাজ-টাজ কিছু পাই কি না খুঁজতে।'

'তা বেশ, আমার সঙ্গে এসো। আমি একজন লোক খুঁজছিলাম। আমার দু'টি গরু আছে। চরাতে পারবে? ক্ষেত-খামারের কাজেও কিছু-কিছু সাহায্য করতে পারো। কেমন, পারবে তো? তোমার মতো আমার আর একজন ছোকরা কাজের লোকও আছে।'

ছেলেটা মাথা নেড়ে সায় দিলো। আর পুরুত ঠাকুরের কাজে লেগে গেল সে। পরদিন সকালবেলা সে লাঙল-গরু নিয়ে মাঠে গেল। আর সারাদিন মন দিয়ে মাঠের কাজ করলো। পরদিনও তাই করলো। তৃতীয় দিনের দিন সে যখন মাঠে কাজ করছিল এমন সময় এক দৈত্য এসে সেখানে হাজির হ'লো। দৈত্যকে দেখেই ছেলেটা পায়ের জুতো ফেলে চোঁ-চোঁ করে দিল দৌড়।

দৌড়—দৌড়—আর দৌড়।

অপর ছোকরাটা তখন চিৎকার করে উঠলো:

'আরে, যাসনে ভাই, যাসনে।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে?

ছুট—ছুট—ছুট। বেচারা ছুটতে লাগলো সমানে। আর ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছল মস্ত বড়ো এক শহরে। শহরে সে এক ঘড়িওয়ালার দোকানের সামনে এসে থামলো। ঘড়ির দোকানে তখন একটি ছেলে এক মনে ঘড়ির কাজ করছিল। গরীবের ছেলেটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে ওর কাজ দেখতে লাগলো। একসময় মুখ তুলে তাকালো ঘড়ির দোকানের

ছেলেটি। ওকে দেখে বললো :

'অমন হাঁপাচ্ছ কেন? কি দেখছো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?'

'আমি তোমার কাজ দেখছি ভাই।'

এমনি সময় ঘড়িওয়ালা এসে সেখানে হাজির হোল। ঘড়িওয়ালা ছেলেটিকে বললো :

'বাছা, কাজ করবে? আমি তাহলে তোমার তিন-বছরের জন্য কাজে নিয়ে নেব।' আমি যা জানি সব তোমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব তাহলে।'

ছেলেটি তো কাজই খুঁজছিল। সে তাই রাজী হয়ে গেল। ঘড়িওয়ালা তখন বললো :

'প্রথম বছর তোমাকে কিছু করতে হবে না। খালি কাঠ কাটবে আর কাঠ কেটে উনানের মধ্যে দেবে। আর টেবিলের ওপর দুই কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে বসে আমাদের কাজ-কমমো সব দেখবে— এই হোল কাজ।'

এদিকে এক ব্যাপার, রাজার ছিলো একটা ঘড়ি। ঘড়িটা মস্ত বড়ো। রাজার খুব সখের। কিন্তু গেল পনেরো বছর থেকে ঘড়িটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে। দেশ-বিদেশের কতো ঘড়িওয়ালাকে রাজা ডেকে আনলেন। ফরাসী দেশ থেকে, ভিয়েনা থেকে, বড়ো কতো কারিগর এল গেল। কেউ কিন্তু ঘড়িটাকে সারাতে পারলো না। ঘড়িটা ছিল রাজার খুব প্রিয়। তিনি তাই ঘোষণা করেছিলেন, যে এই ঘড়িটা সারাতে পারবে তাকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব দান করবেন। কিন্তু কেউ ওটা সারাতে পারলো না। সখের ঘড়িটা যখন বাজতো তখন বৃদ্ধ রাজা হয়ে যেতেন একটি যুবক।

ইস্টার উৎসব এসে পড়েছে। ঘড়িওয়ালা সেদিন কাজ শিখিয়ে ছেলেদের নিয়ে গির্জায় গেল। বাড়িতে রইল কেবল বুড়ো গিন্নী আর ছোকরাটা। ছোকরাটা তখন উনানের জন্য জ্বালানি কাঠ কেটে নিলো তাড়াতাড়ি। আর সারাদিনের মতো টেবিলে গিয়ে বসলো। সেদিন কাজের লোকেরা কেউ ছিল না ঘরে। সবাই গির্জায় গেছে। ছেলেটা তখন কি আর করে! রাজার সেই বড়ো ঘড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। টেবিলের ওপর ঘড়িটাকে তুলে নিলো। ঘড়িটার পুরনো মরচে ধরা

দু'টি পাইপ নিয়ে সে দুটোকে মেজে ঘষে ঠিক করে যথাস্থানে আবার রেখে দিলো।

যেই না রাখা অমনি রাজার সখের ঘড়িটা টিক্‌টিক্‌ করে চলতে শুরু করলো, আর চব্বিশটা সুরও অমনি তার বেজে উঠল টুং টাং, টুং টাং আওয়াজ তুলে। ছেলেটা সেই শব্দ শুনে বেজায় ভয় পেয়ে গেল। আর ভয়ে লুকিয়ে রইলো ঘরের এক কোণে।

এদিকে ঘড়ির টুং টাং আওয়াজ শুনে গির্জা থেকে সব লোকজন ছুটে এলো। ঘড়িওয়ালাও হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরলো। গিন্নীকে জিজ্ঞেস করলো :

'ঘড়িটা সারালো কে বলো তো ' অমন দয়া কে করলে ?'

'তাতো আমি জানি না। ছোকরাটাই তো কি সব খুটখাট করছিল ওঘরে। তাকে দেখেছিলাম টেবিলে বসে ঘড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে।' গিন্নী জবাব দিলো।

সবাই তখন ছেলেটাকে খুঁজতে লাগলো। তাই তো, গেল কোথায় সে। ভয়ে ছেলেটা তখন টেবিলের নিচে লুকিয়েছে। ঘড়িওয়ালা তখন তাকে টেবিলের নিচ থেকে খুঁজে বার করলো আর দু'হাতে কোলে তুলে নিয়ে বললো :

'বয়সে তুমি ছোট বটে। তবে কাজকর্মে তুমি হলে আমার গুরু। কেননা, আমি যা পারিনি তুমি তা করেছো। ঘড়িটাকে তুমি সারিয়ে তুলেছো। আর তোমাকে কিনা আমি কাঠ কাটার কাজে লাগিয়েছিলাম। ইস্টারের পরের দিনও তোমায় ছুটি দিইনি। রেহাই দিইনি কাজ থেকে।'

ঘড়িওয়ালা তখন তিন তিনজন দর্জিকে ডেকে আনলো। আর তাদের দিয়ে তিন তিনটি সুন্দর জামা বানিয়ে দিলো তাকে। পরের দিন সকাল বেলা চার ঘোড়ার এক গাড়ি করে রাজার সখের ঘড়িটা নিয়ে ঘড়িওয়ালা রাজবাড়ির দিকে রওনা হলো।

রাজা ঘড়িটা দেখে রাজ-সিংহাসন থেকে ছুটে এলেন। আর ঘড়িটাকে দু'হাতে তুলে ধরলেন। যেই না তুলে ধরা আর অমনি বুড়ো রাজা হয়ে গেলেন যুবক। রাজা তখন ঘড়িওয়ালাকে ডেকে বললেন :

'ঘড়িটা যে সারিয়েছে তাকে নিয়ে এসো৷ আমার কাছে।'

ঘড়িওয়ালা বললো :

'আমি সারিয়েছি মহারাজ।'

'তুমি সারিয়েছ ? না, না ; তুমি না। যে সত্যি সত্যি সারিয়েছে তাকে ডেকে আনো।'

ঘড়িওয়ালা তখন ছেলেটাকে নিয়ে এলো রাজার কাছে।

ওকে দেখে রাজা খুব খুশি হলেন। আর খুশি হয়ে ঘড়িওয়ালাকে দিলেন তিন তোড়া মোহর। বললেন :

'ছেলেমানুষ হলে কি হবে, তুমি কিন্তু কাজকর্মে বড়দেরও হার মানাও।'

রাজা আরও বললেন : 'তুমি রাজবাড়িতেই এবার থেকে থাকবে। থাকবে রাজার হালে। কেননা তোমাকে আমার দরকার। ঘড়িটা আবার বিগড়ে গেলে তুমি তখন তাকে সারিয়ে দেবে।'

এই বলে রাজা ছেলেটিকে অর্ধেক রাজ্য দিলেন আর রাজকন্যার সংগে দিয়ে দিলেন তার বিয়েও।

৪

এক রাজার ছিলো তিন পুত্র। তিন রাজপুত্র। ছোট রাজপুত্রকে তিনি দিলেন সহস্র মুদ্রা। বড় রাজপুত্রকেও তিনি তাই দিলেন। মেজ রাজকুমারকেও তাই।

রাজার কাছ থেকে টাকা পেয়ে এদিকে ছোট রাজপুত্র বেরিয়ে পড়লো পথে। রাস্তার ধারে গরীব দুঃখী যাকে দেখলো তাকেই দু'হাতে টাকাটা বিলিয়ে দিলো সে। এমনি করেই সব টাকাটা সে খরচ করে ফেললো।

এদিকে বড় রাজকুমার বাবার কাছ থেকে টাকা পেয়ে কিনলো এক খানা জাহাজ। ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাতে সে বিস্তর টাকা কামাই করলো। আর মেজ রাজকুমার তার টাকা দিয়ে খুলে বসলো একটা দোকান। আর কামাই করলো দেদার টাকা। তিন ভাই তখন রাজার কাছে এসে হাজির হোল।

রাজা বড় রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন: 'টাকা দিয়ে তুমি করলে কি?'

বড় রাজকুমার তখন জবাব দিলো, সে কিনেছে জাহাজ। মেজ রাজকুমারও তাই জবাব দিলো। বললো, দোকান দিয়েছে সে।

এবার পালা ছোট রাজকুমারের। সে বললো, সব টাকা সে রাস্তার গরীব দুঃখীদের দিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া গরীব মেয়েদের বিয়ে-থা'র ব্যাপারেও সে কিছু খরচাপাতি করেছে। রাজা শুনে বললেন, আমার ছোট ছেলেটি দেখছি গরীব দুঃখীদের কথা ভাবতে শিখেছে। খুশি হয়ে তিনি তাই ছোট রাজপুত্রকে আরও কয়েক সহস্র মুদ্রা দিয়ে দিলেন।

ছোট রাজকুমার সে টাকা নিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লো আর গরীব-দুঃখী যাকে সামনে পেলো তাকেই মুঠো মুঠো টাকা বিলোতে লাগলো। আর সব টাকা সে এমনি করেই বিলিয়ে দিলো। তার হাতে রইল মাত্র বারোটা টাকা।

সে টাকা নিয়ে পথে যেতে যেতে তার চোখে পড়লো জনকয়েক

ইহুদি। এক কবর খুঁড়ে তারা এক মড়া টেনে বার করলো। আর তাকে পিটোতে লাগলো সবাই মিলে। ছোট রাজকুমার তাই দেখে জিজ্ঞেস করলো :

'তোমরা মরা মানুষটাকে মারছ কেন ?'

'কি যে বলেন ! মারবো না ? ও যে আমাদের কাছে টাকা ধারে।'

'কত টাকা ?'

'বারো টাকা।'

'এই নাও বারো টাকা। আমিই দিচ্ছি, এবার তোমরা ওকে ছেড়ে দাও।' ছোট রাজপুত্র ওদের হাতে বারোটা টাকা গুণে দিলো আর ছাড়িয়ে নিলো লাশটাকে।

আবার পথ ধরে চলতে লাগলো সে। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে মরা মানুষটা আসছে তার পিছু পিছু।

রাজকুমার পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়লো। মরা মানুষ তখন তাকে জিজ্ঞেস করলো : 'কোথায় যাচ্ছ তুমি ?'

'এমনিই বেড়াতে।'

'আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। এবার থেকে আমি তোমার সাথী হলাম। তোমার অংশীদার।'

'বেশ, তাই হোক।'

'তাহলে চলো তোমায় একজায়গায় নিয়ে যাবো।' এই বলে মরা মানুষটি ওকে এক রাজ্যে নিয়ে এলো।

এখন হয়েছে কি, এই রাজ্যের রাজকন্যা প্রতিদিন সকালবেলা একজনকে বিয়ে করে আর সারাদিন তার সাথে হেসে-খেলে বেড়ায়। পরদিন সকালবেলা দেখা যায় স্বামীটি মরে পড়ে আছে বিছানায়।

মরা মানুষটি তখন রাজপুত্রকে বললো : 'আমি তোমায় লুকিয়ে রাখবো একজায়গায়। তবে ভুলো না যেন আমি তোমার সঙ্গী এবং অংশীদার।'

মরা মানুষটি রাজকন্যাকে নিয়ে ঘুমোতে গেল। আর রাজপুত্রকে রাখলো লুকিয়ে।

এদিকে হয়েছে কি, রাত যখন ঠিক দুপুর হলো, মরা মানুষটি দেখলো, রাজকন্যার মুখ থেকে প্রকাণ্ড এক ড্রাগন বেরিয়ে আসছে। মরা

মানুষটি তখন রাজপুত্রের তরবারিখানা দিয়ে ড্রাগনটার তিন তিনটে মাথা কেটে ফেললো। আর মাথা তিনটে বুকে করে ঘুমিয়ে পড়লো রাজকন্যার পাশে। পরদিন ঘুম থেকে উঠে রাজকন্যা দেখলো রাজপুত্র ঘুমিয়ে আছে তার পাশে। রাজপুরীর সবাই গিয়ে তখন রাজার কাছে বললো রাজপুত্র এখনও রাজকন্যার পাশে ঘুমোচ্ছে।

রাজা খুশি হয়ে বললেন: 'তাই না কি!' তাহলে রাজকন্যার সংগে রাজপুত্রের বিয়ে দিয়ে দাও ঘটা করে। আর দিয়ে দাও অর্ধেক রাজত্ব।'

রাজপুত্র তখন রাজকন্যাকে নিয়ে নিজের রাজ্যের দিকে রওনা হোল। মরা মানুষটি তখন বলে উঠলো, 'দাঁড়া ভাই! এই বেলা আমাদের ভাগা-ভাগিটা সেরে ফেলা যাক।'

রাজপুত্র তখন বললো, 'সে কি, রাজকন্যাকে তুমি ভাগ করবে কি করে?'

মরা মানুষটা বললো: 'দেখ না কি করি।' এই বলে সে রাজকন্যার একখানি পা ধরলো আর রাজপুত্রকে বললো আরেকটা পা ধরতে। তারপর তরবারি দিয়ে কেটে দু'খানি করতে গেল রাজকন্যাকে। রাজকন্যা ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠলো। আর যেই না মুখ খোলা অমনি বেরিয়ে এলো আর একটি ড্রাগন। সংগে সংগে সে ড্রাগনের মাথাটাকে কেটে ফেললো। তারপর রাজপুত্রের দিকে ফিরে বললো:

'এই নাও ভাই তোমার রাজকন্যা। আমি রাজকন্যা চাই না। অর্ধেক রাজত্বের ভাগও না। এই ড্রাগন রাজ্যের এতগুলো ছেলের মাথা খেয়েছে। আর ভয় নেই, এবার তুমি নিশ্চিন্ত হলে। এই রইলো তোমার রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব।'

তারপর একটু থেমে আবার বললো: 'ইহুদিগুলোর হাত থেকে আমায় তুমি রক্ষা করে যে দয়া দেখিয়েছ তাতেই আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো।'

এই বলে মরা মানুষটি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল হন হন করে।

আর রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে ফিরে এলো নিজের রাজ্যে।

৮

এক ছিল বুড়ো আর বুড়ী। তারা ছিল বেজায় গরীব। ভিক্ষে করে খায়। বুড়ো সেই সকালবেলায় ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আর বাড়ি ফেরে দিনের আলো নিবে এলে। সারাদিন ভিক্ষে করে যা পায় তাও কিন্তু সব তুলে রাখে। একটি দানাও খরচ করে না তা থেকে। হাড় কিপ্‌টে দু'জনে।

একদিন হয়েছে কি, এক ভিখিরী এসে হাজির ওদের বাড়ির দরজায়। ডেকে বললো :

'দুটি ভিক্ষে দাও মা।'

'তোমার নাম কি গা?' বুড়ী বেরিয়ে এলো ঘরের দরজায়।

'আমার নাম শীত।'

'শীত?'

'হ্যাঁ, শীতকাল।'

'ওঃ, তুমিই তাহলে শীতকাল?' বুড়ী খুশি হয়ে জবাব দিলো। '—তোমার কথাই তো বুড়ো বলে থাকে হামেশা। তা একটু বসো বাবা।'

এ বলে বুড়ী শীতকালের জন্য জমানো তাদের সব কিছু সঞ্চয় ভিখিরীর হাতে তুলে দিলো। বললো :

'এই নাও বাবা, তোমার জন্যেই রেখেছিলাম। আমরা গরীব মানুষ, ভিক্ষে করে খাই। কীই বা আর তোমায় দিই বলো?'

ভিক্ষের দান সঞ্চিত টাকাকড়ি সব পেয়ে শীত চলে গেল খুশি হয়ে।

ওদিকে বেলা গড়িয়ে এলো।

আর আর দিনের মত বুড়ো ভিক্ষে সেরে বাড়ি ফিরলো।

বুড়োকে ফিরতে দেখে বুড়ী খুশিতে ফেটে পড়লো। বললো :

'আজ কে এসেছিল, জানো?'

'কে গা?' বুড়ো অবাক্। শুধালে : 'আমাদের ঘরে আবার

কে আসবে ?'

'হ্যাঁ গা হ্যাঁ। এসেছিল। আমি তাকে সব দিয়ে দিলাম।'

'সে কি গা ! কাকে সব দিযে দিলে ?'

'কেন, তুমি যার কথা বলে থাকো ? সেই শীতকালকেই।'

হায়রে কপাল ! শীতকাল কি কারো ঘরে ভিক্ষে চাইতে আসে ? বোকা বুড়ী তাদের জমানো টাকাকড়ি সব কাকে-না-কাকে অমনি দিয়ে বসলো। যতো সব আহাম্মক !

বুড়োর মনে খুব দুঃখ হোল। খাওয়া-দাওয়া না করেই মনের দুঃখে সে বেরিয়ে পড়লো ঘর ছেড়ে।

বুড়ী ব্যাপারটা এবার বুঝতে পারলো। তারও খুব দুঃখ হোল। খাওয়া-দাওয়া না করে সেও বুড়োর পিছু পিছু চললো।

কিছুদূরে যেতে না যেতেই পড়লো প্রকান্ড এক বন। রাতও হয়ে এসেছিলো। তাই বুড়ো-বুড়ী করলো কি, প্রকান্ড এক গাছতলায় এসে বসে পড়ল নিচু এক ডালে চেপে। ডালের ওপর বসেই সারা রাত কাটাবে তারা ঠিক করলো।

এদিকে হয়েছে কি, রাত যখন প্রায় শেষ হয়ে এলো, এমন সময় একদল ডাকাত হৈ-হল্লা করতে করতে গাছটার নিচে এসে হাজির। আর একটু পরেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি শুরু করে দিলো লুটের টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে। ঝগড়ার কারণ হোল একটা মোহর। বনের মধ্যে মোহরের খুচরো এখন সর্দার পায় কোথায় ? সর্দার তাই কিরে কেটে বললো :

'খুচরো থাকতে আমি যদি মিছে কথা বলে থাকি, সাক্ষাৎ মা কালী যেন আমার ঘাড়ে ভর করে।'

এদিকে হয়েছে কি, ডাকাত দল দেখে বুড়ীর তো ভয়ে দাঁত-কপাটি লেগে গেল। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ী পড়েই গেল গাছ থেকে। আর পড়বি তো পড় একেবারে সর্দারের ঘাড়ে !

ভ্যাবাচাকা খেয়ে সর্দার তো তিন হাত দূরে গিয়ে পড়লো এক লাফে।

'বাপ রে ! মা রে ! গেলুম রে ! মা কালী ঘাড়ে চাপল রে !' বলতে বলতে সে চোঁ-চাঁ দৌড় দিলো।

সর্দারের পিছু পিছু অপর ডাকাতরাও পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। সব কিছু পড়ে রইলো পেছনে। ফিরে তাকাবার আর সাহস হোল না কারও।

বুড়ীকে গাছ থেকে পড়তে দেখে বুড়োও নেমে পড়লো সংগে সংগে। তারপর সেবা-শুশ্রূষা করে ওকে সুস্থ করে তুললো। ডাকাতদের কাণ্ড-কারখানা দেখে দু'জনেই তখন হেসে ফেললো ফিক করে। আর সকাল হলে বুড়ো-বুড়ী দু'জন ডাকাতদের ফেলে যাওয়া ধনদৌলত, টাকাকড়ি সব পুঁটলি বেঁধে বাড়ি ফিরলো খুশি হয়ে।

৬

এক ছিলো জিপসী। আর ছিলো এক মেষপালক। দু'জনের ছিলো খুব ভাব। রোজ সন্ধেবেলায় দু'বন্ধুতে বসে গল্প-গুজব করতো খোশ মেজাজে।

আর আর দিনের মতো সে'দিনও সন্ধেবেলা মেষপালকের কাছে এসেছিল জিপসীবন্ধু। এসে দেখে বন্ধু তার মুখ ভার করে বসে আছে। জিপসী তখন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলো :

'মন খারাপ করে বসে আছ কেন ভাই ?'

বন্ধু তখন বললো :

'দুঃখের কথা কি আর বলবো ভাই। ক'দিন থেকে দেখছি দুটো-তিনটে করে ভেড়া খোয়া যাচ্ছে খোঁয়াড় থেকে। সারাদিন খুঁজে খুঁজেও সন্ধান পাচ্ছি না কোথাও।'

'তাই না কি ?'

'হ্যাঁ, এখন কি করি তাই বলো তো ? গরীব মানুষ, আমাদের ওপর এমনধারা অত্যাচার চালালে কি চলে ?'

সব শুনে জিপসী মাথা নেড়ে বললো :

'তুমি কিছু ভেবো না ভাই। আমি জানি এসব কার কাজ।'

'কে ? কে করছে বলো তো এমন ধারা কাণ্ড ?' মেষপালক জানতে চাইলো।

'তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।' জিপসী সায় দিলো। বললো :

'এক কাজ করো তো দেখি ?'

'কি কাজ ?'

'গিন্নীকে বলে দু'খানা বড় সাইজের পিঠে তৈরি করে রাখো। আর তেমনি বড় দু'তাল ময়দার লেচিও রেখো বানিয়ে। আমি গিয়ে তোমাদের সংগে আজ রাতে খাবো। রাতে তোমার ভেড়ার পাল পাহারা দেব।'

'বেশ তাই রাখবো।' মেষপালক জবাব দিলো।

জিপসী তখন মেষপালক ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরলো।

এদিকে রাত ঘনিয়ে এলো। জিপসী মেষপালকের বাড়ি গিয়ে হাজির হোল। তারপর দুই বন্ধুতে মিলে খাওয়া-দাওয়া নিলো সেরে। তারপর বড় বড় সেই পিঠে দুখানা আর ময়দার লেচিটা পকেটে পুরে সে গিয়ে হাজির হোল ভেড়ার খোঁয়াড়ে। সংগে নিলো বেজায় ভারী লোহার এক ডাণ্ডা। ওজন যার কমসে-কম হলেও তিনচার মন। এছাড়া হাতের কাছে রাখলো বেশ শক্ত গোছের একটা লাঠিও।

এদিকে রাত গভীর হয়ে এলো। জিপসী তখন আগুনের বড় একটা কুণ্ডলী জ্বাললো। আর একটু পরেই আগুনের কাছে এসে হাজির হোল প্রকাণ্ড এক ড্রাগন। ড্রাগন ওকে দেখে বিরাট এক হুঙ্কার ছাড়ল :

'তুই কে রে ব্যাটা? এখানেই বা কি করছিস?'

'আমার নাম জিপসী। আমি দেখতে এসেছি রোজ রাতে তিনটে করে ভেড়া খেয়ে তোর গায়ে কতটা জোর হয়েছে?'

জিপসীর কথা শুনে খানিকটা ভড়কে গেল বুঝি ড্রাগনটা। মুখে তার জবাব এলো না।

'তা দাঁড়িয়ে কেন? এখানে এসে আগুনের ধারে বোস।' জিপসী ওকে বললো।

ড্রাগন তাই করলো। আগুনের ধারে গিয়ে বসলো।

'আজ আমি পরখ করে দেখবো গায়ে তোর কতখানি জোর। এই লাঠিটা শূন্যে ছুঁড়ে দিতে পারবি? দেখিস, লাঠিটা যেন নিচে না পড়ে। শূন্যেই মিলিয়ে যায়।'

জিপসী তখন লোহার ডাণ্ডাটা ড্রাগনকে দেখিয়ে দিলো।

ড্রাগন নিরেট লোহার সেই ডাণ্ডাটা শূন্যে ছুঁড়ে মারলো। আর ডাণ্ডাটা আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ড্রাগন তখন বললো :

'দেখলি তো কেমন ছুঁড়ে মারলাম। আমার মত ছুঁড়ে মার তো দেখি তুই।'

জিপসী তখন করলো কি, কাঠের সেই লাঠিটা এমন করে ওপর দিকে ছুঁড়ে মারার ভান করলো যে ড্রাগন তার খুদে খুদে চোখ দিয়ে দেখতেই পেল না যে লাঠিখানা জিপসীর পেছনে পড়ে আছে। তার কাছে মনে হোল লাঠিখানা যেন শূন্যেই মিলিয়ে গেছে।

'বেশ ভালো, এবার পরখ করে দেখা যাক কার গায়ে কত জোর আছে, মগজে বুদ্ধি আছে কত।' জিপসী বললো।

'আচ্ছা, ঐ যে পাথরের চাঁইটা দেখতে পাচ্ছিস, ওটা চিবিয়ে খেতে পারবি? এই দেখ আমি কেমন চিবিয়ে খাচ্ছি।

এই বলে জিপসী তার পকেট থেকে পিঠে দু'খানা বার করে নিলো। আর দিব্যি তা চিবিয়ে খেতে শুরু করলো।

জিপসীর দেখাদেখি ড্রাগনও তখন পাথরের চাঁইটা কড়মড় করে খেতে শুরু করে দিলো। পাথরের চাঁই চিবোতে গিয়ে ড্রাগনের দাঁত গেল সব ভেঙে। মুখ ফেটে রক্ত ঝরতে লাগলো টসটস করে। আর ওদিকে জিপসী তখন চেটেপুটে পিঠে খেতে লাগলো মনের আনন্দে। ড্রাগনের দুর্দশা তখন দেখে কে? তাই দেখে জিপসী মুচকি হেসে বললো:

'কিরে, খাচ্ছিস না যে বড। পাথরের চাঁইটা খেতে ভারী চমৎকার লাগছে কিন্তু! এই দেখ, কেমন রসে টুবটুব করছে। আর কি মজা।'

ড্রাগন পিট-পিট করে তাই দেখল। তারপর এক সময় বললো:

'তাই তো দেখছি। তুমি তাহলে সত্যিই আমার চাইতে বেশি শক্তিশালী।'

জিপসী সায় দিলো। বললো: 'তুই ঠিক ধরেছিস। তাই বলছিলাম কি প্রাণে যদি বাঁচতে চাস আমায় এখন পিঠে করে নিয়ে যা তোর অন্ধ মায়ের কাছে।

ড্রাগন তাই করলো। জিপসীকে পিঠে চাপিয়ে চললো তার অন্ধ মায়ের কাছে।

এখন হয়েছে কি, ড্রাগনের পিঠে মানুষ চাপতে দেখে সবাই তো অবাক। এমন কাণ্ড কে কবে শুনেছে বা দেখেছে। ড্রাগনের মা তো সব শুনে একেবারে থ'। বুড়ী তো ভয়ে কাঁপতে লাগলো থর থর করে।

জিপসী তাই দেখে বললো: 'ভয় নেই। আমি তোদের কাউকে প্রাণে মারবো না। আমি যা চাই তা দে।'

'তাই দেবো। তুমি যা চাইবে বাবা, তাই দেবো। টাকাকড়ি খানাপিনা যা চাও তাই দেবো। দোহাই তোমার, আমাদের প্রাণে মেরো না।'

ড্রাগন তখন যতটা সে বইতে পারে ততটা মণি-মুক্তা, টাকাকড়ি ও নানান চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় এনে হাজির করলো জিপসীর সামনে। আর কাকুতি মিনতি করতে লাগলো :

'এই নাও সব। দোহাই তোমার, আমাকে আর আমার মাকে প্রাণে মেরো না কিন্তু। আমি জীবনে আর কখনো মেষপালকের খোঁয়াড়ের দিকে পা বাড়াবো না। তুমি দেখে নিও।'

'ঠিক বলছিস তো! আর কক্ষণো মাড়াবি না? কিন্তু তোদের তো আবার কথার ঠিক থাকে না।'

'না, আর কক্ষণো না।' ড্রাগন জবাব দিলো।—'এই নাকে খত দিলাম।'

এই বলে ড্রাগন তখন সত্যি সত্যি তিনবার নাকে খত দিল।

'আচ্ছা যা, এবারকার মত তোকে ছেড়ে দিলাম। এখন টাকা-কড়ি খানা-পিনা সব নিয়ে আমায় পিঠে করে পৌঁছে দিয়ে আয়। ফের যদি কক্ষণো এদিকে আসবি তো প্রাণে বাঁচবি না বলে রাখলাম।'

ড্রাগন তাই করলো। জিপসীকে পৌঁছে দিয়ে নিজের মায়ের কাছে ফিরে গেল।

এদিকে ভোরবেলা বিস্তর খাবারদাবার, টাকা-কড়ি মণি-মুক্তা দেখে জিপসী-গিন্নী তো অবাক্!

জিপসীকে জিজ্ঞেস করলো :

'হ্যাঁগা, এত খাবার-দাবার টাকা-কড়ি তুমি কোথায় পেলে?'

জিপসী বললো : 'সে পরে হবে। এখন যাও। ছেলেপিলেদের এ সব খেতে দাও দেখি।'

জিপসী গিন্নী তাই করলো। সকলের মুখে খুশি আর ধরে না।

৭

ঘরে চাল বাড়ন্ত।

জিপসী-গিন্নী তাই করলো কি, বাজারের থলেটা হাতে নিয়ে পা বাড়ালো শহরের দিকে। আর দোকানীদের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে দুটো আলু আর একটু ময়দা নিয়ে ফিরলো ঘরে। কিন্তু ঘরে ফিরে দেখে হাঁড়িতে এক ফোঁটাও তেল নেই। চর্বিও না। এখন উপায়?—জিপসী-গিন্নী মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলো: কি হবে? ছেলে-পিলেরা যে সব খিদের জ্বালায় কাঁদতে শুরু করেছে। আচ্ছা, গাঁয়ের পাদ্রী সাহেব না আজ একটা শুয়োর কেটেছে? তার কাছে গেলে নিশ্চয় খানিকটা চর্বি পাওয়া যাবে।

জিপসী-গিন্নী তাই পাদ্রী সাহেবের বাড়ির দিকে রওনা হোল। পাদ্রী সাহেব কিন্তু ওকে দেখে তেড়ে এলেন চাবুক নিয়ে। বললেন:

'নিজেরা একটু মাংস খাবো বলে শুয়োরটাকে জবাই করলাম, এখন কিনা একে ভাগ দিতে হবে।'

পাদ্রী সাহেব জিপসী-গিন্নীকে আচ্ছা করে চাবুক-পেটা করে তাড়িয়ে দিলেন।

কাঁদতে কাঁদতে জিপসী-গিন্নী ঘরে ফিরলো আর বললো সব জিপসীকে।

জিপসী তখন হাতুড়ি দিয়ে টুকটাক কি একটা বানাচ্ছিল। হাত থেকে তার হাতুড়ি গেল খসে। বললো:

'আচ্ছা দাঁড়াও, ওকে আমি টিট্ করছি।'

এই বলে জিপসী তখন করল কি, গির্জায় গিয়ে গির্জার তালার চাবিটা দেখে নিলো ভালো করে। তারপর বাড়ি ফিরে সেই তালাটার মতো আরেকটা চাবি বানিয়ে নিলো। আর বানানো চাবিটা দিয়ে গির্জার তালাটা খোলা যায় কিনা লুকিয়ে একবার পরখ করেও দেখলো।

জিপসী তারপর করল কি, দোকানে গিয়ে সাদা ধবধবে গোটা কয়েক কাগজ কিনলো। আর তাই নিয়ে ছুটলো এক দর্জির দোকানে।

দোকানীকে বললো :

'আমাকে তাড়াতাড়ি এমন একটা পোশাক তৈরি করে দাও যা পাদ্রীরা পরে থাকে খালি পাল-পার্বণে।'

দর্জি তাই করলো। জিপসী তখন তার ছেলেকে ডেকে বললো : 'ওই থলিটা নিয়ে আমার জন্য শ'খানেক বড়ো বড়ো কাঁকড়া ধরে নিয়ে আয়।'

ছেলে তাই করলো। বেছে বেছে শ'খানেক কাঁকড়া ধরে পুরলো থলেটার মধ্যে।

এদিকে রাত যখন নিঝুম হয়ে এলো, জিপসী তখন যাজকের সেই ঝকঝকে ঝলমলে পোশাকটা পরে কাঁকড়া ভর্তি থলে নিয়ে গির্জায় গিয়ে হাজির হোল। আর গির্জার দরজা খুলে ঢুকে পড়লো ভিতরে আর সব আলো তার দিলো জ্বালিয়ে।

গির্জাটি আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো। ফিক্ করে যেন হেসে ফেললো অন্ধকারে।

এদিকে আলোর ঝলমল দেখে পাদ্রী সাহেবের রাঁধুনী ছুটে এলো ঘর থেকে। 'একি! গির্জার আলোগুলি সব জ্বালালো কে?'

রাঁধুনী গিয়ে পাদ্রী সাহেবকে জাগিয়ে দিলো। বললো :

'পাদ্রী সাহেব, দেখে যান গির্জাবাড়ি আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। অতো আলো জ্বালালো কে?'

পাদ্রী সাহেব তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন বিছানা ছেড়ে। পাদ্রীদের পোশাকটি গায়ে চাপিয়ে ভয়ে ভয়ে ছুটলেন গির্জার দিকে।

ঝকঝকে ঝলমলে পোশাকপরা জিপসী তখন সমানে আউড়ে চলেছে বিড়বিড় করে :

'হে প্রভু, পাপী-তাপীদের উদ্ধারের জন্য তুমি আমায় পাঠালে এখানে। আমি তোমার নির্দেশ পালন করবো, প্রভু! যদি কেউ তার টাকা-কড়ি সব সঙ্গে নিয়ে নেয় আর আমি যা বলি তা করে তবে তাকে আমি স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে দেবো। তার কোনো ভয় নেই।'

পাদ্রী সাহেব সব শুনলেন কান পেতে। তারপর ছুটে গিয়ে ঘরে নিজের জমানো টাকা-কড়ি সব নিয়ে ফিরে এলো গির্জায়।

জিপসী কিন্তু তখনও সমানে বিড়বিড় করে বকে চলেছে তো চলেছে :

'পাপী-তাপীদের জন্যই আমায় তুমি এখানে পাঠালে, প্রভু! শেষ বিচারের দিন আগত ঐ। স্বর্গরাজ্যে যদি কেউ যেতে চাও, আমার ঐ থলের মধ্যে ঢুকে পড়ো ভালোয় ভালোয়।'

এই বলে জিপসী তার কাঁকড়া-ভর্তি থলিটির মুখ খুলে ধরলো। আর বুড়ো পাদ্রী সাহেব অমনি ফুড়ুৎ করে ঢুকে পড়লো থলের মধ্যে স্বর্গরাজ্যে যাবার লোভে।

জিপসী ওত পেতে ছিল, যেই না ঢোকা, অমনি সে থলের মুখটা দিল বন্ধ করে। জিপসী তখন পাদ্রী সাহেবের সব টাকাকড়ি নিয়ে পাদ্রীকে টানতে টানতে নিয়ে চললো সিঁড়ি দিয়ে।

মরার ওপর খাঁড়ার ঘা! থলের কাঁকড়াগুলোও তখন পাদ্রী সাহেবকে কামড়াচ্ছে কুটুস কাটুস। পাদ্রী সাহেব কিন্তু মুখ বুজে তা সহ্য করতে লাগলেন। কিছু বলতে গেলে যদি স্বর্গের দেবদূত রাগ করেন! বলা তো যায় না, পরমপিতা হয়তো নিজেই এসেছেন তাঁকে উদ্ধার করতে।

কিন্তু হাড়-গোড় যে সব গুঁড়িয়ে দলা পাকিয়ে গেল। পাদ্রী সাহেব এবার তাই কঁকিয়ে উঠলেন যন্ত্রণায়। জিজ্ঞেস করলেন: 'স্বর্গ আর কত দূর?'

'এই যে এসে গেছি। সিঁড়িটা শেষ হলেই হোল। তারপর স্বর্গের নন্দন-কাননে পেঁছে যাবেন।'

এই বলে সে পাদ্রী সাহেবকে ছুঁড়ে দিলো লম্বা লম্বা কাঁটাওয়ালা এক ঝোপের ওপর।

তারপর পাদ্রীর কাছ থেকে আদায় করা সব টাকা-কড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরলো সে। গরীব জিপসী, জিপসী-গিন্নী আর তাদের ছেলেপিলেদের মুখে তখন আনন্দ আর ধরে না। পেট ভরে বেশ কিছুদিন খেতে পাবে সবাই।

সবাই তাই বেজায় খুশি।

৮

রায়ান ছিলো গ্রীসদেশের রাজপুত্র। মোরগ-গিন্নীর এক মেয়ের সংগে তার ছিলো খুব ভাব। রাজপুত্র তাকে বিয়ে করতে চাইলো। আর জানিয়ে দিলো ওকে ছাড়া সে আর কাউকে বিয়ে করবে না।

কথাটা রাজার কানেও গেল। তিনি মহা ভাবনায় পড়লেন। তাই তিনি একদিন রাজপুত্রকে ডেকে বললেন :

'মোরগ-গিন্নীর কন্যাকে তুমি নাকি বিয়ে করতে চাইছো ? বেশ তাই হবে। মোরগ-গিন্নীর কন্যার সংগেই তোমার বিয়ে হবে। তবে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পাখিটিকে তোমার নিয়ে আসতে হবে আমার জন্য।'

রাজা বলে তো খালাস ! কিন্তু সে এখন সব থেকে সুন্দর পাখি পায় কোথায় ! রাজপুত্র চলতে চলতে যাকে দেখলো তাকেই জিজ্ঞেস করতে লাগল : 'সব চেয়ে সুন্দর পাখি সে পাবে কোথায় ?'

কেউ কিন্তু দিতে পারলো না কোনো খোঁজ-খবর। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। রাজপুত্র কিন্তু হাল ছাড়লো না। চলতে চলতে একদিন সে বুসাকিন-এর এক বুড়ীর বাড়ি এসে হাজির হোল। বুড়ী তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলো। আদর-যত্ন করে খেতে দিলো। সকালবেলা রাজপুত্রকে ডেকে দিয়ে বুড়ী বললো :

'অনেক বেলা হয়েছে, এবার ওঠো। অনেকখানি পথ তোমাকে যেতে হবে।'

রাজপুত্র ধড়ফড় করে উঠে বসলো। বাইরে এসে দেখলো, উঠোনের মাঝখানে কে যেন গম মাড়াই করে রেখে গেছে। রাজপুত্র এদিক-ওদিক তাকালো। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না। শুধু দেখল একটি খ্যাঁকশেয়াল তার জুতো আর মোজাটি পরে দাঁড়িয়ে আছে।

তাই দেখে রাজপুত্র বলে উঠলো : 'আরে হতচ্ছাড়া শেয়াল, তুই আমার সুন্দর জুতো আর মোজাটা পরে নষ্ট করছিস কেন ?'

'আঃ,'—শেয়াল বলে উঠলো : 'অনেকদিন জুতো-মোজার মুখ

দেখিনি কিনা, তাই এখানে আপনার জুতো-মোজা দেখতে পেয়ে ভাবলাম এগুলোকে আজ কাজে লাগানো যাক।'

'আহ্লাদখানা তোর কম নয় তো শেয়াল ব্যাটা ? তুই আমার জুতো মোজাটা পরে ঘুরে বেড়াবি আর আমি কি খালি পায়ে থাকবো ?'

'বেশ তো, আপনি আমায় তা হোলে আপনার চাকর বানিয়ে নিন। আমি আপনার জুতো মোজা ফেরত দিচ্ছি।'

'আরে বোকা শেয়াল !' রাজপুত্র জবাব দিলো : 'তুই কি আমার মত না খেয়ে মরতে চাস ?'

'দূর ছাই, তা কেন ? আপনার চাকর এমন কিছু খারাপ কাজ করেনি যে না খেয়ে তাকে মরতে হবে এবং তার মনিবকে না খেয়েই থাকতে হবে।'

'ঠিক আছে,' রাজপুত্র বললো : 'আমি অত ভাবি না। তুমি যদি যেতে চাও, বেশ, চলো আমার সংগে।'

কিছুদূর যেতে না যেতেই খ্যাঁকশেয়াল মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়লো। জিজ্ঞেস করলো : 'ঘোড়ায় চড়তে জানেন, রাজপুত্র ?'

রাজপুত্র মাথা নেড়ে সায় দিলো। তখন খ্যাঁকশেয়াল বললো : 'তবে এক কাজ করুন। আপনি ঘোড়সওয়ার হয়ে আমার পিঠে চড়ে বসুন।'

'বলিস কিরে ! তুই হলি একটা খ্যাঁকশেয়াল, আমি তোর পিঠে চড়ে বসি আর পিঠটা তোর ভাঙুক।'

'হুঁ, হুঁ ! গ্রীসদেশের রাজপুত্তুর !' খ্যাঁকশেয়াল বলে উঠল আপন মনে—'আপনাকে আমি যতটুকু জানি ততটা কিন্তু আপনি আমার বিষয়ে জানেন না। তাই অমন কথা বলছেন। আমি আপনাকে দিব্যি পিঠে করে নিয়ে যেতে পারবো। আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'বেশ, নে তো দেখি', এই বলে রাজপুত্র খ্যাঁকশেয়ালটির পিঠে চড়ে বসলো। আর সে তাকে পিঠে নিয়ে দিলো ছুট পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো।

খ্যাঁকশেয়াল রাজপুত্রকে নিয়ে ছুটছে তো ছুটছে। তার ছোটার আর যেন বিরাম নেই। অবশেষে তারা এসে থামলো বিরাট এক দৈত্যপুরীর সামনে।

'এটাই হোল আপনার সেই দৈত্যের বাড়ি যেখানে আশ্চর্য পক্ষীকে দেখতে পাবেন। তা এখন আপনি গিয়ে কি বলবেন শুনি।'

'কেন, গিয়ে বলবো, আমি এসেছি আশ্চর্য পক্ষীটাকে চুরি করতে।'

'হঁ্যা, তাহলেই হয়েছে! আপনাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না।' খঁ্যাকশেয়াল জানালো। একটু থেমে আবার বললো :

'আপনি একটা কাজ করুন। আপনি দৈত্যবাড়ি গিয়ে সহিসের কাজ নিন। এই দৈত্যপুরীতে অনেক পশু-পক্ষী রয়েছে। ও যখন আপনার কাছে আশ্চর্য পক্ষীটা নিয়ে আসবে, আপনি তখন বলবেন,

'দূর ছাই! এই নোংরা পাখিটাকে আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে যান। ছুঁড়ে ফেলে দিন। অমন পাখি আমাদের রাজ্যে পথে-ঘাটে বিস্তর দেখা যায়।'

খঁ্যাকশেয়ালের কথা মত রাজপুত্র তাই করলো। গিয়ে হাজির হোল এক দৈত্যের কাছে। কাজ নিলো সহিসের। খঁ্যাকশেয়ালের কথা মতো পাখির কথাও বললো দৈত্যকে। পাঁচ-মাথাওয়ালা দৈত্যটি তাই শুনে বললো :

'ও তাই নাকি! এমন পাখি অনেক দেখতে পাওয়া যায় নাকি! আমি তাহলে তোমাদের দেশে গিয়ে ধরে আনবো দু-একটা।'

'বেশ তো, আমি আপনাকে নিয়ে যাবো।' রাজপুত্র পাঁচমাথা-দৈত্যকে আশ্বাস দিলো। আর দৈত্যটাও তাকে খুশি হয়ে থাকতে দিলো।

এদিকে হয়েছে কি, রাজপুত্র খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে গেল। আর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়লো, তখন সে আশ্চর্য পক্ষীটাকে নিয়ে চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। তারপর দিলো ছুট। দৈত্যপুরী থেকে বেশ কিছুদূর এসে পথের ওপর সে থমকে দাঁড়ালো। ভাবলো, 'অন্ধকারে ঠিক পাখিটাকে চুরি করে আনলাম তো?'

এই ভেবে রাজপুত্র পাখির খাঁচাটা খুলতে গেল। আর খুলতে না খুলতেই পাখিটা তার হাতে ঠোকর মেরে চিৎকার করে উঠলো। এদিকে পাখির ডাক শুনে পাঁচমাথা-দৈত্যের ঘুম ভেঙে গেল। পাখিটাকে দেখতে না পেয়ে সে তার আশ্চর্য জুতো জোড়াটি পায়ে পরে নিলো। এই জুতো জোড়াটা পরলে কিন্তু এক ধাপে নয় মাইল পথ যাওয়া যায়। দৈত্যটা সেই জুতো পরে রাজপুত্রের পিছু নিলো। আর কিছুক্ষণের

মধ্যে ধরে ফেললো তাকে। 'বললো,' ছিঃ ছিঃ গ্রীস দেশের রাজপুত্র, রাজার ছেলে হয়ে তুই কিনা আমার পাখি চুরি করতে এসেছিস? তোকে তোর কর্মফল ভোগ করতে হবে।'

এই বলে রাজপুত্রকে ধরে বন্দী করে রাখলো সকাল না হওয়া পর্যন্ত।

পরদিন সকাল না হতেই সে আবার ছুটে এলো রাজপুত্রের কাছে। বললো: 'কি গো রাজকুমার, আজব পাখি চুরি করতে এসে শেষকালে নিজেই ধরা পড়লে! তা তোমার সামনে এখন দুটি পথ খোলা আছে। এক হোল, এর শাস্তি স্বরূপ হয় তুমি তোমার গর্দান দেবে, কিম্বা চাঁদের দেশে গিয়ে তার অন্দর মহল থেকে আলোর সাদা তরবারিখানা চুরি করে এনে আমায় দেবে।'

রাজপুত্র মনে মনে ভাবলো, কথায় বলে।যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ, দৈত্যের হাতে বেঘোরে মরার চাইতে আলোর সাদা তরবারিখানা চুরি করাই ভালো। এই ভেবে রাজপুত্র দৈত্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আলোর তরবারি চুরি করতে ছুটলো চাঁদের দেশের চরকা বুড়ীর রাজ্যে।

কিছুদূর যেতে না যেতে রাজপুত্রের সঙ্গে আবার খ্যাঁকশেয়ালটির দেখা। সে তখন তাকে তার দুঃখের কথা সব জানালো। খ্যাঁক-শেয়াল তাই শুনে বললো: 'রাজপুত্র, আপনি যদি আমার কথা শুনতেন তাহলে এ ফাঁপরে পড়তেন না। চন্দ্রপুরী থেকে অলোর তরবারি চুরি করা সে এক অসাধ্য কাজ। তার চাইতে পাঁচমাথা-দৈত্যের কাছ থেকে আজব পাখি চুরি করা বিশ গুণ সহজ।'

'তাহলে এখন কি হবে?' রাজপুত্র খ্যাঁকশেয়ালকে জিজ্ঞেস করলো।

খ্যাঁকশেয়াল তখন বললো, 'আবার আমার পিঠে চেপে বসুন। তাহলে আশা করি আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু হবে।'

খ্যাঁকশেয়াল ছুটে চললো তো চললো। ছোটার তার বিরাম নেই। ছুটতে ছুটতে কোন্ দেশে এসে পৌঁছল আমি তা জানি না। বলতেও পারবো না। এক সময় ছোট একটা পাহাড়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো সে রাজপুত্রকে নিয়ে। খ্যাঁকশেয়াল রাজপুত্রকে পাহাড়ের ওপর বসিয়ে বললো,

'এবার আপনি এক কাজ করুন, এখানে চুপচাপ বসে গলা ছেড়ে

কাঁদতে শুরু করুন। আপনার কান্না শুনে চাঁদের দেশের বুড়ী বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করবে আপনি কাঁদছেন কেন। আপনি কিন্তু সমানে কাঁদতে থাকবেন। ওরা তখন আপনাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাবে তাদের পুরীতে। অনেক মিষ্টি কথা বলে কেন কাঁদছেন জানতে চাইবে। আপনি তখন 'আলোর সাদা তরবারি'খানা চাইবেন। আপনাকে শান্ত করতে ওরা তরবারিখানি দেবে আপনার হাতে। আর তরবারিখানি পাশে রেখে দোলনায় আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে।'

খ্যাঁকশেয়ালটির কথামত রাজপুত্র গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করলো। তার কান্না শুনে ছুটে এলো চাঁদের দেশের বুড়ী আর রাজপুত্রকে পাঁজা-কোলা করে নিয়ে গেল তাদের ঘরে। আর খ্যাঁকশেয়ালটি যেমন বলেছিল তেমনি তাকে শান্ত করার জন্য 'আলোর সাদা তরবারিখানি' দিলো তার হাতে। আর তরবারিখানি দোলনায় তার পাশে রেখে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলো।

রাত যখন গভীর হলো রাজপুত্র তখন উঠে বসলো তার দোলনায়। আর একটু পরেই 'আলোর তরবারি'খানি নিয়ে চুপিচুপি সে বেরিয়ে এলো চন্দ্রপুরী থেকে। বেরিয়েই ছুটতে শুরু করলো রাজপুত্র। ছুটতে ছুটতে একসময় পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে সে ভাবলো : তাইতো, সত্যিকারের 'আলোর সাদা তরবারি'টা সে ঠিকমতো আনতে পেরেছে তো চুরি করে ?

এই বলে রাজপুত্র তখন তরবারিটা খাপ থেকে টেনে বার করলো দেখার জন্য। আর যেই না তরবারিটা বার করা খাপ থেকে অমনি ঝনঝন শব্দে বিকট আওয়াজ করে উঠলো সেটা। আর তাই শুনে চন্দ্রপুরীর মেয়েরা সব জেগে উঠলো। আর ছুটে এসে ধরে ফেললো রাজপুত্রকে। বললো : 'একি কথা গ্রীসদেশের রাজকুমার, চন্দ্রপুরীতে এসেছো 'আলোর সাদা তরবারি'টা চুরি করতে ?'

এই বলে ওরা সব রাজপুত্রকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখলো পরদিন সকাল না হওয়া পর্যন্ত। পরদিন সকাল হলে ওরা রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করলো, 'যদি তুমি প্রাণে বাঁচতে চাও তবে সূর্যপুরী গিয়ে সূর্যকন্যাকে চুরি করে আনো।'

কথায় বলে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা !' রাজপুত্র মনে মনে ভাবলো

প্রাণে মরার চাইতে সূর্যপুরী গিয়ে সূর্যকন্যাকে চুরি করে আনাই ভালো। এই ভেবে রাজপুত্র পথ ধরে চলতে শুরু করলো সূর্যপুরীর দিকে। খ্যাঁকশেয়াল ওকে দেখে বললো: 'আপনি তো আমার কথা শুনলেন না। তাই নিজের বিপদ ডেকে আনলেন। এখন আবার সূর্যকন্যা চুরি করতে সূর্যপুরী চলেছেন। আরে বোকা, সূর্যপুরীতে কেউ কি কখনো যেতে পারে সূর্যকন্যাকে চুরি করতে? আপনার চাইতে কত বড় বড় চোর-ডাকাত সূর্যকন্যাকে চুরি করতে গিয়ে প্রাণ হারালো!'

খ্যাঁকশেয়াল একটু থেমে আবার বললো: সূর্যকন্যাকে পাহারা দিচ্ছে নয় নয় জন ইয়া বড় পাহারাদার। তাদের পাশ ঘেঁষে সাধ্যি কার? তাই আপনি এক কাজ করুন। ধোঁয়াটে এ পোশাকটি নিন সঙ্গে করে। যেই ওদের দেখবেন নিজেকে এটা দিয়ে ঢেকে নেবেন। কিন্তু খবরদার, আমার কথামত কাজটি না করলে আপনাকে প্রাণ নিয়ে আর ফিরতে হবে না।'

রাজপুত্রের সঙ্গে খ্যাঁকশেয়ালটিও এবার পিছু পিছু চললো। রাতদিন পথ হেঁটে হেঁটে ওরা একসময় উপস্থিত হলো সূর্যপুরীতে। সূর্যপুরীর পাহারাদারদের দেখে খ্যাঁকশেয়ালটি অমনি অদৃশ্য সেই পোশাকটি দিয়ে আড়াল করে রাখলো রাজপুত্রকে। আর ফিস্ ফিস্ করে বললো, 'ওদের পাশ কাটিয়ে এবার আপনি সূর্যপুরীতে ঢুকে পড়ুন। ওরা আপনাকে দেখতে পাবে না। তারপর রাজকন্যেকে চুরি করে আপনি যখন ফিরে আসবেন আমি তখন এখানে থাকবো। আমাকে খুঁজে পেতে আপনার দেরি হবে না।'

খ্যাঁকশেয়ালের কথামতো রাজপুত্র অদৃশ্য সেই পোশাক পরে পাহারাদারদের সামনে দিয়ে ঢুকে পড়লো সূর্যপুরীতে। আর খুঁজে খুঁজে যে পালঙ্কে সূর্যকন্যা শুয়ে আছে সে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সূর্যকন্যা রাজপুত্রকে দেখে বলে উঠলো: 'সে কি! তুমি এই পুরীতে এলে কি করে? আমার বাবা যে লোকজন কাউকে এ ঘরে ঢুকতে দেন না।'

রাজপুত্র তখন সূর্যকন্যাকে সব কথা খুলে বললো। সূর্যকন্যা তখন তাকে খুব আদর-যত্ন করলো। বললো: 'কিন্তু আমাকে নিয়ে

তুমি পালাবে কি ভাবে?'

রাজপুত্র তখন করলো কি, সূর্যপুরীর একটা জানালা খুলে দিলো। আর সেই জানালা খুলে সূর্যকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে এলো।

খ্যাঁকশেয়াল তখন তার কথামতো তাদের পাশে এসে উপস্থিত হলো। বললো, 'রাজপুত্র, আপনারা দু'জন আমার পিঠে চেপে বসুন। আমি আপনাকে নিয়ে সরে পড়ছি এখান থেকে।'

রাজপুত্র আর সূর্যকন্যা তাই করলো। খ্যাঁকশেয়ালের পিঠে চেপে বসলো তারা। আর তক্ষুণি খ্যাঁকশেয়াল তাদের নিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো দিলো ছুট। ছুটতে ছুটতে ওরা যখন চাঁদের বুড়ীর দেশে এসে পৌঁছুল তখন খ্যাঁকশেয়াল বললো, 'আপনি যদি আলোর তরবারির বদলে সূর্যকন্যাকে দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হবে।'

রাজপুত্র বললো, 'সে আমি দিচ্ছি না।' খ্যাঁকশেয়াল বললো, 'তাহলে এক কাজ করুন, আমাকে বরং চাঁদের বুড়ীব কাছে দিয়ে দিন।'

'সে আমি পারবো না। তোমাকে কিছুতেই আমি হাতছাড়া করতে পারবো না।' রাজপুত্র বলল।

'না রাজপুত্র, আপনি অতো ভাববেন না। আমাকে ওরা বেশিদিন আটকে রাখতে পারবে না।'

রাজপুত্র তাই করলো। খ্যাঁকশেয়ালকে সূর্যকন্যা সাজিয়ে সে চন্দ্রপুরীতে গিয়ে ঢুকলো। আর 'আলোর সাদা তরবারি'খানি বাগিয়ে নিলো। খ্যাঁকশেয়ালকে চন্দ্রপুরীতে রেখে রাজপুত্র তখন এগিয়ে চললো। কিন্তু দু-একদিন যেতে না যেতেই খ্যাঁকশেয়াল এসে ওদের ধরে ফেললো। বললো, 'আচ্ছা রাজপুত্র, এটা কি ভালো হবে সামান্য একটা আজব পাখির জন্য আপনি অমন সুন্দর আলোর তরবারিটা হাতছাড়া করবেন?'

'তা না করে উপায় কি?'

'কেন? আপনি এক কাজ করুন। আমি নিজেকে আলোর তরবারিখানি বানিয়ে নিচ্ছি। আপনি আমাকে দৈত্যের কাছে দিয়ে আজব পাখিটি নিয়ে যান। পরে তা অনেক কাজে আসবে।'

রাজপুত্র তাই করলো। খ্যাঁকশেয়ালকে ওদের কাছে রেখে আজব পাখিটা আনতে গেল দৈত্যপুরী। রাজপুত্রকে দেখে পাঁচমাথা-দৈত্য

তখন বলে উঠলো : 'আলোর তরবারি'খানা ঠিক এনেছো দেখছি। এই তরবারির এক কোপে সামনের ঐ ওক গাছটা আমি কেটে ফেলবো। আমার বাবাও তাই করেছিলেন দশ বছর আগে।'

রাজপুত্র আজব পাখিটা নিয়ে দৈত্যপুরী থেকে বেরিয়ে এলো। কিছুদূর যেতে না যেতে ওর সাথে আবার দেখা হলো খ্যাঁকশেয়ালের। দেখলো খ্যাঁকশেয়ালটির ল্যাজের গোছাটা গোঁজা রয়েছে তার মুখে। তাই দেখে রাজপুত্র বলে উঠলো : 'আরে তোমার কি হয়েছে?'

'সে কথা আর বলবেন না। তরবারি হাতে করে পাঁচমাথা-দৈত্য তখন করল কি, এককোপে ওকগাছটি কাটতে গেল। আরে, আমি তো আর সত্যিকারের আলোর তরবারি নই। গাছ কাটা যাবে কি করে? খানিকটা গাছের ছালই শুধু কাটা গেল। আর আমার সামনের দু'পাটি দাঁত গেল ভেঙে।'

তাই শুনে রাজপুত্র খুব দুঃখ করতে লাগলো। বললো : 'আহা! আমার জন্য তোমার অমন দাঁত খোয়াতে হল।'

খ্যাঁকশেয়াল তখন তাকে প্রবোধ দিলো। বললো, 'এ নিয়ে আর দুঃখ করবেন না। আমার পিঠে চড়ে বসুন। এখনও অনেক পথ যেতে হবে।'

পথ ধরে চলতে চলতে খ্যাঁকশেয়াল এসে থামলো পথের ধারে এক ঝর্ণার সামনে। রাজপুত্রকে বললো : 'এই আলোর তরবারি দিয়ে এককোপে আমার মাথা কেটে ফেলে দিন ঝর্ণার জলে। না হলে আমিই আপনার মাথা কেটে ফেলবো।'

রাজপুত্র দেখলো এছাড়া আর উপায় নেই। কথায় বলে, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' তাই সে এককোপে খ্যাঁকশেয়ালটির মাথাটা কেটে ফেলে দিল ঝর্ণার জলে। আর চোখের পলক পড়তে-না পড়তে ঝর্ণার জল থেকে উঠে এলো সূর্যকন্যার বাবা সূর্যদেব।

তখন সকলে মিলে রাজবাড়িতে এসে পৌঁছল। মহা ধুমধাম করে রাজপুত্রের সঙ্গে মোরগ-কন্যার বিয়ে হয়ে গেল। তারপর থেকে সুখে-শান্তিতে ঘরকন্না করতে লাগলো ওরা।

৯

এক যে ছিলো ছেলে। সাত বছর একনাগাড়ে সে খেটে গেল। কিন্তু একটা কানাকড়িও জুটলো না। তাই সে একদিন বেরিয়ে পড়লো। হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছল এক শহরে। রাত হয়েছিল। তাই সে করল কি, এক পাঁচিলের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লো। আর পড়লো ঘুমিয়ে।

এখন হয়েছে কি, পাঁচিলের গায়ে ছিল একটা ফুটো। ফুটোটা দিয়ে ছেলেটা দেখলো ও পাশে রয়েছে মস্ত এক রাজপুরী। আর সেই ফুটো দিয়ে ছেলেটা তখন প্রবেশ করলো অচিন সেই রাজপুরীতে। রাজপুরীর আশেপাশে নানা পথঘাট। প্রাসাদের পর প্রাসাদ। ঘোড়াশালে ঘোড়া। ভেড়াশালে ভেড়া। লোকলস্কর বিস্তর। রাজপুরীতে রাজা রয়েছেন। আছেন রানী। কিন্তু তাঁরা কেউ বেঁচে নেই। রাজার ছিলো এক রাজকন্যা। রাজকন্যাই রাজ্যের দেখা-শোনা-তদারক সব করতো। করতো সৈন্যসামন্ত পরিচালনা। কিন্তু রাজপুরীটা ছিলো অভিশপ্ত। আর এ অভিশাপে রাজপুরীর সবাই হয়ে গেছে পাষাণ। ছেলেটা যেতে যেতে রাজার কাছে এগিয়ে গেল। দেখে কি, রাজা আর নেই। বদলে গেছেন পাথরের মূর্তিতে।

ছেলেটি তো অবাক! তাজ্জব ব্যাপার! লোকজন সবাই যে হয়ে গেছে পাথরের মূর্তি।

এমন সময় একটি বিড়াল কোত্থেকে এগিয়ে এলো ম্যাও ম্যাও করতে করতে। আর তার সামনে রেখে গেল নানা খাবার। খিদে পেয়েছিল। তাই ছেলেটা বসে খেয়ে নিলো। রাত্রে আবার এলো বিড়ালটা। এসে রেখে গেল নানা খাবার-দাবার। শুধু তাই নয়, রেখে গেল এক বাক্স তাসও। বললো : 'একটু পরে এক দৈত্য আসবে। আর এসে বলবে, চলো, তাস খেলি আমরা। তুমি কিন্তু তাস খেলতে বসবে ওর সঙ্গে। খেলতে খেলতে ও একসময় তোমার মুখে খানিকটা থুতু ছিটিয়ে দেবে। তুমি কিন্তু তখন কিছু বোলো না। মুখ বুজে সহ্য করে যেও। তবে

ঘড়িটার দিকে নজর রেখো। ঘড়িতে যেই দশটা বাজবে, অমনি ওর গালে একটা চড় কষিয়ে দিও।'

যেই না বলা, অমনি কিছুক্ষণ পরে চারদিক কাঁপিয়ে পঙ্গপালের মত অসংখ্য দৈত্যদানব এসে হাজির হল রাজপ্রাসাদের মধ্যে। এসেই ওরা ঘিরে ধরলো ওকে। আর কিলচড় মারতে লাগল চাঁদা করে। কাটতে লাগল নানা টিটকারি। এমন ভাবো চললো রাত বারোটা অবধি। তারপর ঘুমের ঘোরে যেই ডেকে উঠলো মোরগ, অমনি ওরা পিটটান দিলো। সে আর করে কি? বিছানায় শুয়ে পড়লো আর পড়লো ঘুমিয়ে।

ভোর হতে না হতেই বিড়ালটি আবার এলো আর দিয়ে গেল নানা খাবার-দাবার। রাত্রেও বিড়ালটি এসে তাকে খাবার-দাবার দিয়ে গেল। বললো: 'আজকেও আবার আসবে। আর এসে তোমার সঙ্গে তাস খেলতে চাইবে। রাত ঠিক দশটা পর্যন্ত ওর সঙ্গে তুমি খেলবে। আর যেই ঘড়িতে দশটা বাজবে অমনি ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দিও।'

তাই হলো। দৈত্য এসে বললো: 'এই, এক হাত তাস খেলবে নাকি? চলো খেলি।'

দুজনে ওরা তখন তাস খেলতে বসলো। ঘড়িতে যেই ঢং করে দশটা বাজলো, ছেলেটি অমনি দৈত্যটার গালে বিরাশী সিক্কা ওজনের চড় দিলো কষিয়ে। তারপর আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে পঙ্গপালের মতো দৈত্যদানবের পাল এসে তাকে ঘিরে ধরলো আর কিলচড় মেরে জ্বালিয়ে মারলো। ছেলেটা কিন্তু ঘাবড়ে গেলো না। মুখ বুজে রইল। তারপর যেই ঘড়িতে বারোটা বাজলো, দৈত্যদানবের দল অমনি পালালো। ওরা চলে যেতে সে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো, আর দিল লম্বা এক ঘুম।

ভোরবেলা তার ঘুম ভাঙ্গলো, বিড়ালটি আবার সামনে এসে রেখে গেল খাবার-দাবার। শুধু তাই নয়। তার জন্য এনেছে এক রাজপোশাক। খাবার-দাবার খেয়ে সে রাজপোশাকটা পরে নিলো। তারপর চললো অন্দরের বারো মহলের দিকে। এ মহলে এসে দেখে এক পাষাণ-কন্যা শুয়ে আছে তার বিছানায়। রাজকন্যার একদিক পাথরের মতো অসাড় হলেও অপর দিকটা তখনও জীবন্ত, সজীব। রাজকন্যা ওকে দেখে বললো: 'এই রাজপুরীর তুমি হলে রাজা, আর আমি হলাম রানী। কিন্তু খবরদার! আমার কাছে এসো না।'

আবার রাত হোল। বিড়ালটি আবার ওর জন্য খাবার-দাবার নিয়ে এলো। বললো: 'আজ রাত্রেও দৈত্যটা আসবে।' আবার তোমার সংগে তাস তাস খেলতে চাইবে। আর যেই ঘড়িতে দশটা বাজবে, আবার ওর গালে একটা চড় কষিয়ে দিও। পংগপালের মত দৈত্যদানব এসে তোমায় তখন জ্বালিয়ে মারবে। তুমি কিন্তু সব সহ্য করে যেও!'

তাই হোল। রাত্রি হলে দৈত্যটা আবার এলো। বললো: 'কি হে ছোকরা, এক হাত তাস খেলবে নাকি? চলো খেলি।'

ওরা তখন খেলতে বসলো। আর ঢং করে ঘড়িতে যেই দশটা বাজলো, আবার ছেলেটি ওর গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের চড় কষিয়ে দিলো। চড় খেয়ে দৈত্যটা পালালো। কিন্তু একটু পরেই পংগপালের মতো দৈত্যদানবের দংগল এসে কিল-চড় মেরে তাকে জ্বালাতন করতে লাগলো। সে কিন্তু মুখ বুজে সব সয়ে গেলো। তারপর যেই ঘড়িতে বারোটা বাজলো, অমনি ওরা যে দিক দিয়ে এসেছিল সে দিক দিয়ে চলে গেলো। আর ছেলেটি তখন বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

ব্যান্ড আর নহবতের বাজনা শুনে তার ঘুম ভাংগলো। জেগে উঠে শোনে কি, প্রহরী-সান্ত্রীর দল হেঁকে বলছে: 'নতুন মহারাজের জয় হোক। জয় হোক নতুন মহারাজের।'

একটু পরেই তার সামনে কুর্নিশ করে মন্ত্রীপরিষদ ও সবাই মিলে এসে দাঁড়াল। তারপর তাকে কাঁধে তুলে নিলো।

'জয় হোক নতুন মহারাজের।'

ওদের কাঁধ থেকে তড়াক করে সে নেমে পড়লো।

তারপর অন্দর মহলের দিকে সে ছুটে যেতে যেতে বললো: 'আমি মহারানীকে ডেকে আনছি।'

অন্দর মহলে ঢুকেই দেখে কি, বিছানায় শোয়া সেই পাষাণ-কন্যা দাঁড়িয়ে আছে এক বিকট আকৃতি ধরে। ঝাঁকড়া মাথাটা তার গিয়ে ঠেকেছে কাড়িকাঠে। ঠিকড়ে-পড়া চোখ দুটো জ্বলছে ভাঁটার মতো। মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। দরজা খুলে বিকট ওই মূর্তি দেখে, ছেলেটি তো থ'। রাজকন্যা হাত নেড়ে ওকে ইশারায় ডাকলো। আর সংগে সংগে কোমর পর্যন্ত তার পাথর হয়ে গেলো।

রাজকন্যা বললো : 'তুমি একটু অপেক্ষা করলে না কেন ? শাপ থেকে মুক্ত হলেই আমি তোমার কাছে যেতাম। যাক্, তুমি আর আমার কাছে কখনো এসো না। ঘোড়াশালা থেকে বাবার ঘোড়াটি নিও। আর নিও তাঁর তরবারিখানি। আর কোষাগারে গিয়ে যত খুশি টাকাকড়ি নিয়ে যাও।'

ছেলেটি তাই করলো।

ঘোড়াশালে ঢুকে রাজার প্রিয় ঘোড়াটি সে বেছে নিলো। নিলো তাঁর তরবারিখানি। ধনাগারে ঢুকে ধনরত্নও নিলো বিস্তর। রাজপুরী ছেড়ে এবার সে চললো আর এক নতুন রাজ্যে। সেখানে গিয়ে দেখে কি, রাজায় রাজায় তুমুল লড়াই চলছে। এক রাজা তাঁর রাজকন্যাকে অপর রাজার রাজপুত্রের সংগে বিয়ে দেবে না, তাই দুজনের মধ্যে বেধেছে এই লড়াই।

এদিকে হয়েছে কি, রাজারা যুদ্ধ করে চলেছেন তো চলেছেন। রাজ্যে কিন্তু দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ। দেশে হাহাকার। সৈন্যসামন্ত না খেতে পেয়ে মরতে লাগলো কাতারে কাতারে।

ছেলেটা যেতে যেতে এক সরাইখানায় এসে হাজির হলো। সরাইখানার মালিক আর্মেনিয়ার লোক। ছেলেটি তাকে শুধালো : 'এদিককাব খবর কি ?'

'খবর ভালো নয় কর্তা, রাজারা তো সাত বছর ধরে এক নাগাড়ে যুদ্ধ করে চলেছেন, এদিকে রাজ্যে পড়ে গেছে হাহাকার। কারো মুখে নেই একমুঠো খাবার। সৈন্যসামন্তরা পর্যন্ত না খেয়ে মরছে।'

তাই শুনে ছেলেটা করলো কি, সৈন্যসামন্তদের ডেকে এনে খেতে দিলো পেট ভরে, পান করতে দিলো আকণ্ঠ। তারপর সরাইখানার মালিককে ডেকে বললো : 'জানো, আমি ইচ্ছে করলে শত্রুপক্ষের সৈন্যসামন্ত, সবাইকে কেটে দু'খান করে দিতে পারি।'

তাই শুনে সরাইখানার মালিক ছুটলো রাজার কাছে। রাজাকে ডেকে বললো : 'মহারাজ, আমার সরাইখানায় এক রাজার ছেলে এসেছেন। উনি বলছেন ইচ্ছে করলে শত্রুপক্ষের সৈন্যসামন্তদের কেটে দু'খান করে দিতে পারেন।'

রাজা তখন ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। শুধালেন : 'তুমি যা বলছ সত্যি নাকি ? তুমি শত্রুপক্ষের সৈন্যদের কেটে দু'খান করে দিতে পার ?

'হ্যাঁ মহারাজ! পারি।'

'যদি পার, তাহলে রাজকন্যাকে পাবে। আর পাবে অর্ধেক রাজত্ব।'

তাই শুনে ছেলেটি তখন ঘোড়া হাঁকিয়ে কোষ থেকে তরবারি বার করে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হলো। একবার ডান হাতে তরবারি ধরে অর্ধেক সৈন্য কেটে ফেললো আর একবার বাঁ হাত দিয়ে বাকী অর্ধেককে কেটে ফেললো। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হলো রাজার কাছে। আর রাজকন্যাকে বিয়ে করে লাভ করলো অর্ধেক রাজত্বও।

এখন হয়েছে কি, একদিন রাজা রাজকন্যাকে ডেকে বললেন: 'অবাক কথা, একা একা একখানা তরবারি দিয়ে এতগুলি সৈন্যসামন্তকে খতম করলো, ওর এই আশ্চর্য শক্তিটা থাকে কোথায় জেনে আয় তো?' ছেলেটি অত ভাবেনি। রাজকন্যাকে বলে ফেললো তার মন্ত্রপড়া তরবারির কথা।

তাই শুনে রাজকন্যা ওর বাবার কাছে সব লিখে পাঠালো। আরও লিখল, নতুন একখানি তরবারি যেন তার কাছে পাঠানো হয়। রাজার তরবারিখানি পেয়ে রাজকন্যা তখন ছেলেটির সেই মন্ত্রপড়া তরবারিখানি পালটিয়ে নিলো। আর তা পাঠিয়ে দিলো বাবার কাছে।

মন্ত্রপড়া তরবারিখানি হাতে পেয়েই, রাজা তখন ছেলেটিকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। অত-শত জানা ছিলো না ছেলেটির। রাজকন্যা তার সঙ্গে যে প্রতারণা করবে সে কল্পনাও করেনি। খোশমেজাজে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারাল বেচারী। রাজা তখন ওকে কেটে টুকরো টুকরো করে এক থলেতে পুরে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বলে উঠলো ঘোড়াটাকে:

'যা, তোর মনিবকে যেখান থেকে এনেছিলি সেখানে নিয়ে যা।'

ঘোড়াটা তখন থলে ভর্তি কাটা দেহ নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হোল রাজপ্রাসাদে। রাজকন্যার অর্ধেক পাষাণ মূর্তি তাই দেখে কেঁদে উঠলো চিৎকার করে। আহা! অমন দশা ওর করলো কে? সে তখন ছেলেটির দেহের কাটা মাংসগুলি টেবিলের উপর পরপর একসঙ্গে সাজিয়ে দিলো। আর মজা ইঁদারা থেকে খানিকটা পচা জল ছিটিয়ে দিলো তাতে। সঙ্গে সঙ্গে কাটা মাংসগুলি জুড়ে গেলো। এবার সে খানিকটা টাটকা জল ছিটিয়ে দিলো শবের উপর। অমনি ছেলেটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। পাষাণকন্যা তখন ওকে বললো: 'যাও, ধনাগারে গিয়ে যতখুশি ধনরত্ন

নাও গে। আর যাও সেই সরাইখানার মালিকের কাছে। ও যা চায় তাই ওকে দিও। বোলো, তুমি এক সুন্দর ঘোড়া হয়ে যাবে। আর সেই ঘোড়াটি নিয়ে ও যেন রাজার কাছে বিক্রি করে আসে।' এই বলে পাষাণকন্যা তখন বিড়ালের লেজ থেকে এক গোছা লোম নিয়ে ছেলেটির কব্জিতে বেঁধে দিলো। আর জানালো, এবার এক ডিগবাজি খেলেই সে অমনি এক ঘোড়া হয়ে যাবে। আর কব্জি থেকে লোমগুলো খুলে ফেললেই আবার মানুষ হয়ে যাবে।

ছেলেটি তাই করলো। সরাইখানায় গিয়ে, সরাইখানার মালিক সেই আর্মেনিয়ান বুড়োটির হাতে একরাশ ধনরত্ন গুঁজে দিলো। আর পাষাণকন্যার নির্দেশমতো বিড়ালের লোমগুলো কব্জিতে বেঁধে ডিগবাজি খেতেই সে হয়ে গেলো সাদা ধবধবে এক টাট্টু ঘোড়া। সরাইখানার মালিক তখন ঘোড়াটি নিয়ে হাজির হলো রাজার কাছে। অমন সুন্দর ঘোড়া, রাজার ভারী পছন্দ হলো। চড়া দামেই ওটা তিনি কিনে নিলেন। তারপর চেপে বসলেন ঘোড়াটার পিঠে। যেই না চড়া, ঘোড়া তড়াক করে সামনের দু'পা তুলে দিলো এক লাফ। টাল-সামলাতে না পেরে রাজা ধমাস করে ছিটকে পড়লেন কঠিন মেঝের উপর। আর সংগে সংগে মারা গেলেন।

ঘোড়া তখন করলো কি, রাজার কোমরবন্ধ থেকে তরবারিখানি দাঁতে দিয়ে কামড়ে নিয়ে হাজির হলো সরাইখানাতে। সরাইখানার মালিক যেই বিড়ালের লোমগুলো তার কব্জি থেকে খুলে নিলো অমনি চোখের পলকে ঘোড়া হয়ে গেলো এক সুন্দর রাজপুত্র।

রাজপুত্র তখন সরাইখানার মালিককে রাজসিংহাসনে বসিয়ে নিজে চললো সেই পাষাণপুরীর দিকে। ততদিনে পাষাণকন্যার শাপমোচন শেষ হয়েছে। ওরা দুজনে তখন বিয়ে-থা করে সুখে-শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগলো।

এখানে একটা কথা কিন্তু চুপি চুপি বলে রাখি, পাষাণপুরীর পাষাণকন্যাটিই হোল রাজপুরীর সেই বিড়ালটি।

১০

এক ছিলো মস্ত বড়ো লোক। তার ছিলো বিস্তর ধন-দৌলত। অনেক ছিলো টাকাকড়ি। আর ছিলো এক ছেলে। বাপ-মায়ের চোখের মণি সে।

ছেলে বড়ো হয়ে উঠলো। বাপ-মা তাকে দিলেন পাঠশালায় পাঠিয়ে। পাঠশালায় গিয়ে ছেলে কিন্তু পড়াশুনায় মন দিলো না। বন্ধুদের নিয়ে শুধু খেলা-ধুলো হৈ-হল্লা করে বেড়াত। এখন হয়েছে কি, একদিন সে বাড়ি এসে বাবাকে বললো, 'আমার কিছু টাকা লাগবে বাবা।'

'বেশ তো নাও না।' এই বলে বাবা আদরে ছেলের হাতে চার-পাঁচটি টাকা ভর্তি থলে তুলে দিলেন।

টাকাগুলো নিয়ে ছেলে খুশি হয়ে ফিরে গেলো আর বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-হল্লা করে তাদের খাইয়ে সব টাকাটা দিলো উড়িয়ে। পরদিন আবার বাবার কাছে এসে সে ধরণা দিলো : 'আমায় আর কিছু টাকা দাও, বাবা।'

বাপ এবারও কিছু টাকা দিলেন, 'এই নাও বাবা। দেখে-শুনে খরচ করো।'

টাকাটা নিয়ে ছেলে খুশি হয়ে ফিরে গেল। আগের দিনের মতো সেই টাকাটাও বন্ধুদের নিয়ে খরচ করে বসলো। পরদিনই আবার ছেলেটা বাবার কাছে এসে হাজির। বললো, 'আমায় আরও কিছু টাকা দাও বাবা।'

'টাকা তো আর ঘরে নেই।' বাবা বললেন, 'রুপোর ওই বাসন-কটা আছে, তাই বিক্রি-সিক্রি করে তোমার দরকার মিটিয়ে নাও।'

ছেলেটা তাই করলো। রুপোর বাসন বেচে যা পেল তাই দিয়ে বন্ধু-বান্ধব মিলে খুব মজা করলো।

কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই ছেলে আবার বাবার কাছে এসে হাজির। বললো, 'আমায় আরও কিছু টাকা দাও।'

'টাকা টাকা টাকা! অত-টাকা কোথায় পাবো, বাবা? নাও, ঘর-দোর যা আছে সব বেচে দাও। বেচে টাকা নাওগে!' বাবা রেগেমেগে বলে উঠলেন।

ছেলে কিন্তু তাই করলো। লোক ডেকে ঘরবাড়ি সব দিলো বেচে। আর টাকাটা নিয়ে চললো সবাই মিলে মজা করতে।

কিছুদিন গেলো। ছেলেটি হঠাৎ একদিন এসে বললো, 'বাবা, আরও কিছু টাকা দাও।'

'টাকা আর পাবো কোথায়! তোর যদি টাকার এতই দরকার, তবে এক কাজ কর, আমাকে আর তোর মাকে দাস-বাজারে নিয়ে গিয়ে বেচে দেগে।'

বাবা বললেন আর আহাম্মক ছেলেটা তাই করে বসলো। বাপ-মা দুজনকে নিয়ে গিয়ে 'ক্রীতদাস বাজারে দিলো বিক্রি করে। এক রাজা ওদের দুজনকে কিনলেন। বাপ আর মাকে বিক্রি করে ছেলেটা যে টাকা পেলো, তাই দিয়ে কিনলো একটা ঘোড়া আর নতুন জামা-কাপড়। তাই পরে টগবগিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়লো সে।

একদিন গেলো। দুদিন গেলো। ছেলে আর আসে না। বাপ-মা দুজনে তখন কান্না শুরু করে দিলেন। তাই দেখে রাজা ছুটে এসে জিগ্গেস করলেন, 'তোমরা দুজন কাঁদছো কেন? কি হয়েছে?'

বুড়ো আর বুড়ী তখন খুলে বললো সব কথা। রাজা শুনে তখ্খুনি বুড়োর ছেলেকে ধরে আনবার জন্য লোক পাঠালেন।

এখন হয়েছে কি, রাজার লোকজন বেরোবার আগে বুড়োর ছেলেটি ঘোড়ায় চড়ে এসে হাজির হোল বাপ-মায়ের কাছে। রাজা ওকে দেখে এক টুকরো কাগজে কি যেন লিখলেন। তারপরে সেটা একটা খামের মধ্যে পুরে আঠা দিয়ে এঁটে দিলেন ছেলেটার হাতে। বললেন, 'এই চিঠিখানা অমুক জায়গায় নিয়ে যাও। আর অমুকের হাতে দিয়ে দিও। আর তার কাছ থেকে তুমি যা পাবে তাতে তোমার টাকা-পয়সার কোনোদিন অভাব হবে না।'

ছেলেটা তখন রাজার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছে। এদিকে আকাশে সূর্য মাথার ওপর উঠে এলো। ছেলেটার ক্ষিদে আর তেষ্টায় প্রাণ যায় যায়। কিন্তু

কোথাও একফোঁটা জলের চিহ্নমাত্র নেই। তবু ছেলেটা ঘোড়া হাঁকিয়ে চললো। কিছু দূরে গিয়ে দেখে এক গাছতলায় রয়েছে জলের একটি কুয়ো। জল খেতে ছেলেটা ঘোড়া থেকে নামল। নেমে কুয়োটার ধারে গিয়ে দেখে জল তার রয়েছে অনেক নিচে। নাগালের বাইরে।

ছেলেটা তখন করলো কি, বুদ্ধি করে চিঠিখানি তার কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলো কুয়োর মধ্যে। আর চিঠিখানা ভিজে ফেঁপে উঠতেই ধীরে ধীরে সেটা টেনে তুললো আর তাই চুষেচুষে তেষ্টা মিটিয়ে নিলো খানিকটা।

হঠাৎ তার খেয়াল হলো, আচ্ছা, চিঠিতে কি লেখা ছিলো তা তো জানা হলো না! তাই সে ভিজে চিঠিখানা মেলে ধরলো চোখের সামনে। আর দেখে কি, তাতে লেখা আছে :

চিঠি পেয়েই পত্রবাহকের মাথা কেটে ফেলবে। টাকার জন্য সে তার বাবা আর মাকে পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছে।

১১

বড়োলোক বাবুর ছিলো ফুটফুটে এক ছেলে। ছেলেটা দিন দিন বড়ো হয়ে উঠলো। বাপ-মা ছেলেটাকে বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী করতে চাইলেন। কিন্তু ছেলের আর বউ পছন্দ হয়না। দেশ-বিদেশ থেকে কত সুন্দরী মেয়ের খোঁজ-খবর এলো। কিন্তু ছেলের পছন্দ হোল না কাউকে। এইভাবে দেখতে দেখতে দশ বছর কেটে গেলো। বাপ-মা মহা ভাবনায় পড়লেন।

এখন হয়েছে কি, খোকাবাবু একদিন স্বপ্ন দেখলো: এক ভিনদেশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে সে। সেখানে মাঠের মাঝখানে রয়েছে একটা পুকুর। আর সেখানে স্নান করছে তিন তিনটে পরী। পরী মেয়ে তিনটি তাদের ডানাওয়ালা সেমিজগুলো এক গাছতলায় রেখে জলে নামলো আর নিজেরা মনের সুখে স্নান করতে লাগলো।

খোকাবাবুর স্বপ্ন গেলো ভেঙে। পরদিন সে ঘুম থেকে উঠে বাবার কাছে গিয়ে বললো: 'বাবা, আমি এখন বিদেশে যেতে চাই। আপনি আমায় যেতে অনুমতি দিন'

বাবা ছেলেকে যেতে অনুমতি দিলেন। আশীর্বাদ করে বললেন: 'আমাদের সঙ্গে যদি থাকতে না চাও, তবে যাও। সঙ্গে কিন্তু টাকাকড়ি নিও বেশি করে।'

খোকাবাবু টাকাকড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। আর চলতে চলতে এসে উপস্থিত হলো স্বপ্নে দেখা ভিনদেশের সেই নির্জন জলাশয়টার কাছে। আর দেখলো তিনটি অপরূপা সুন্দরী পরী পাড়ের ওপর তাদের জামা কাপড় ছেড়ে জলে নেমে স্নান করছে। খোকাবাবু পুকুরের ধারে এসে দাঁড়াতেই পরীরা জল থেকে অমনি তাড়াহুড়ো করে উঠে, নিজ নিজ পোশাক পরে উড়ে গেলো আকাশপথে।

পরীরা চলে যেতেই খোকাবাবু কান্নায় ভেঙে পড়লো। তার কান্না শুনে এক বৃদ্ধ এসে হাজির হোল তার সামনে। জিজ্ঞেস করলো:

'বাছা, তুমি কাঁদছ কেন?'

'কাঁদব না ? সুন্দরী মেয়েগুলোকে ধরতে গেলাম আর তারা আমায় দেখে অমনি পালিয়ে গেলো । একজনকেও ধরতে পারলাম না ।'

'ওদের ধরে নিয়ে তুমি করবে কি ?'

'কেন, আমি বিয়ে করবো ।'

'তুমি কি তিনজনকেই বিয়ে করতে চাও ?'

'না, সব চাইতে ছোট যে জন শুধু তাকেই আমি চাই ।'

'বেশ তাই হবে। তবে শোন,' বুড়ো জবাব দিলো : 'আমি তোমার জন্য জলাশয়ের ধারে একটা গর্ত খুঁড়ে রাখছি। এই গর্তে লুকিয়ে থেকে তুমি দেখবে সেমিজ ছেড়ে তারা কখন জলে নামছে। যেই জলে নামবে অমনি তুমি গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়বে। আর সব চাইতে ছোট পরীটার পোশাকটা নিও তুলে। তোমায় দেখে অন্য দুটো পরী তখন সেমিজ পরে পালিয়ে যাবে। ছোটটা আর পালাতে পারবে না। সে শুধু তোমার কাছে সেমিজটা ফিরিয়ে দেবার জন্য কাকুতি-মিনতি করবে। তুমি তাতে কান দিও না। সেমিজটা দিও না আর ওকে।'

তাই হোল। খোকাবাবু বুড়োর খোঁড়া গর্তের মধ্যে নিজেকে রাখলো লুকিয়ে আর ওত পেতে রইলো কখন পরী তিনজন আসবে আবার নাইতে।

এক সময় পরীরা এসে নিজেদের সেমিজগুলো খুলে রাখলো এক জায়গায়। আর নেমে পড়লো জলে।

খোকাবাবু তখন করলো কি, গর্ত থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে ছোট পরীর সেমিজটা তুলে নিলো নিজের হাতে।

খোকাবাবুকে দেখে আর দুই পরী জল থেকে তাড়াহুড়ো করে উড়ে গেলো নিজ নিজ পোশাক পরে। কিন্তু ছোট পরীটার কপালে তা আর হয়ে উঠলো না। সে বেচারী বিস্তর কান্নাকাটি শুরু করলো। জামাটা ফিরে পাবার জন্য খোকাবাবুর কাছে কাকুতি-মিনতি করলো।

খোকাবাবু কিন্তু তাতে কান দিলো না। কিছুতেই জামাটা দিলো না ফিরিয়ে। তারপর ছোট পরীকে নিয়ে খোকাবাবু ফিরলো নিজের বাড়িতে।

ছেলেকে সুন্দরী একটা মেয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরতে দেখে বাপ-মা তার

খুব খুশি হলো। আর মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে দিয়ে দিলো। ছোট পরীকে বিয়ে করে খোকাবাবু সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলো।

এমনি করে পাঁচ-পাঁচটি বছর কেটে গেলো। ঘর আলো করে খোকাবাবুর এক ছেলেও জন্মালো। খোকাবাবু কিন্তু ভুলেও পরীর সেই সেমিজটা কাউকে দেখতে দেয়নি। চিলে-কোঠার একটা ঘরে তালা বন্ধ করে রাখলো সেটা। আর চাবিটা রাখলো তার মা'র কাছে। বারবার বলে দিলো: 'খবরদার মা, ঘরটা কিন্তু কক্ষণো খুলো না।' হায় রে! সে যদি জানতো, পরীর পোশাকটা পুড়িয়ে না ফেলে কি ভুলটাই না করলে!

এখন হয়েছে কি, খোকাবাবু একদিন খেতের কাজে একলা গিয়েছিলো মাঠে। তখন তার বৌ মায়ের কাছে গিয়ে বললো: 'আমি এতদিন এ বাড়িতে রইলাম আপনি কখনও আমাকে ওপরের ঐ চিলে-কোঠাটা দেখতে দেন নি। সব সময় তালা দিয়ে বন্ধ করে রেখে দেন। স্বামীর বাড়ি-ঘর-দোর সব আমার কি দেখতে ইচ্ছে করে না, মা?'

'বেশ তো মা, দেখবে বৈ কি? এই নাও চাবি, গিয়ে দেখো।' এই বলে শাশুড়ি বউকে চিলেকোঠার চাবিটা দিলো।

বউ শাশুড়িকে নিয়ে চিলে-কোঠা ঘরে গিয়ে ঢুকলো। আর ঢুকে দেখতে পেলো দুই ডানাওয়ালা তার সেমিজটা পড়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। তাই দেখে বউ বললো:

'এই পোশাকটা পরলে মা, আমাকে কিন্তু একদিন বেশ দেখাত। আজকে একবার পরে দেখবো?'

শাশুড়ি বললো: 'বেশ তো, পরো না। যদি দেখতে ভালো লাগে আবার পরে দেখো।'

বউ তখন তার পুরনো পোশাকটা আবার পরে নিলো। আর তাই পরে শাশুড়িকে বললো: 'আমি চললাম। ভগবান আপনাদের সুখে শান্তিতে রাখবেন। আমার ছেলেটাকে একটু দেখাশুনো করবেন। আর স্বামীকে প্রণাম জানাবেন। আমি চললাম। আমাকে আর দেখবেন না এখানে।'

এই বলে সে ডানা ঝাপটিয়ে আকাশে উড়ে গেল। আর ফিরে এলো তার নিজের বাড়িতে ডাইনী মা'র কাছে।

এদিকে দুপুরে স্বামী বাড়ি ফিরে দেখে তার স্ত্রী নেই। সে তখন মাকে জিজ্ঞেস করলো : 'মা, তোমাদের বউ গেলো কোথায় ?'

মা তখন জবাব দিলো : 'বউমা আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে চিলে-কোঠায় গিয়েছিলো। সেখানে গিয়ে সে তার পুরনো পোশাকটা দেখতে পায়। আর তাই পরে আকাশপথে উড়ে গেলো। বলে গেলো আর ফিরবে না। ছেলেটার যেন দেখাশুনার অভাব না হয়।'

তাই শুনে ছেলে মাথায় হাত দিয়ে বসলো। বললো : 'আমি এখনই তাকে খুঁজে বার করবো।'

এই বলে এক গাদা টাকা নিয়ে সে বেরিয়ে পরলো বাড়ি থেকে ভগবানের নাম করে।

যেতে--যেতে—যেতে—সে একসময় এসে উপস্থিত হলো এক যাঁতা-ওয়ালার বাড়ি। যাঁতাওয়ালাকে সে তখন তার দুঃখের কথা সব বললো। তাই শুনে যাঁতাওয়ালা বললো : 'তুমি দুঃখ করো না ভাই, আমি তোমার পরী-বউকে আবার ফিরিয়ে আনবো।' যাঁতাওয়ালা তাকে সান্ত্বনা দিলো। আরও বললো : 'তোমার পরী-বউ হোলো এক ডাইনী বুড়ির মেয়ে। আমার এখান থেকেই ডাইনী বুড়ির গম-ময়দা সব চালান যায়।'

বড়োলোকের ছেলে যাঁতাওয়ালাকে বললো : 'তুমি এক কাজ করো ভাই। গমের একটা বস্তার মধ্যে আমাকে লুকিয়ে রাখো। আর আমার সঙ্গে থলের মধ্যে কিছু খাবার-দাবার দিও। একটা দড়ি দিয়ে আমায় বেশ করে বস্তার সঙ্গে বেঁধেও রেখো।' এই বলে সে যাঁতাওয়ালার হাতে এক কাঁড়ি টাকা তুলে দিলো। বললো : 'আমি যা যা বললাম তাই করো কিন্তু। আমি তোমাকে আরও অনেক টাকা দেব।'

যাঁতাওয়ালা তার কথামত কাজ করলো। ময়দার এক বস্তার মধ্যে তাকে পুরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলো।

তার একটু পরেই চারজন দৈত্য এসে হাজির হলো যাঁতাওয়ালার বাড়ি। সবচাইতে যে বস্তাটা দেখলো ভারী সেটাই ওরা বেছে নিলো। এ বস্তাটাতেই বড়োলোকের ছেলেটা ছিলো লুকিয়ে। দৈত্যগুলো পিঠে করে বস্তাশুদ্ধ ওকে নিয়ে চললো ডাইনী-বাড়ি। আর ডাইনী-বাড়ি পৌঁছে থলে শুদ্ধ তাকে রাখলো নামিয়ে।

পরদিন ছিলো ও বাড়িতে বিয়ের ভোজ। সকালবেলা বস্তা থেকে

ময়দা নিতে এলো একটা মেয়ে। আর এই মেয়েটাই হলো পরী-বউ। তার স্ত্রী। থলের মধ্যে স্বামীকে দেখতে পেয়ে পরী-বউ বলে উঠলো: 'একি! তুমি? তুমি এখানে এলে কি করে?'

'হ্যাঁ, আমি। আমি এসেছি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে।'

'আমাকে নিযে যাবে! কিন্তু তার আগেই আমার মা যে তোমাকে মেরে ফেলবে।'

মেয়েকে মানুষের ঘরের ছেলের সংগে কথা বলতে শুনে ডাইনী-মা ছুটে এলো। বললো: 'ও তুমি? তুমিই বুঝি আমার মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলে? বিয়ে করেছিলে। তা তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে দেখতে পাচ্ছি। তোমাকে আমি প্রাণে মারবো না। তোমার বৌকে তুমি আবার নিয়ে যেতে পারবে। যদি তুমি, আমি যা বলি করতে পারো।'

ডাইনী বুড়ি তখন তাকে আদর-যত্ন করে খেতে দিলো। রাতে শোবারও সব ব্যবস্থা করে দিলো। পরদিন যখন তার ঘুম ভাঙলো ডাইনী বুড়ি তাকে ডেকে নিয়ে বললো:

'দেখ বাছা, সামনে দেখতে পাবে বিরাট একটা বন। এই বনের সব ক'টা গাছ যদি তুমি কেটে কেটে একসার করে রাখতে পার আর ডালপালাগুলি যদি পার আলাদা করে সাজিয়ে রাখতে, তাহলে আমি তোমায় বউ নিয়ে দেশে যেতে দেব। নইলে নেব তোমার গর্দান।'

এই বলে ডাইনী বুড়ি তার হাতে তুলে দিলো কাঠের একটা কুঠার আর কাঠের একটা শাবল। তাই নিয়ে সে চললো বনে। আর বনে গিয়ে দেখে সত্যি বনটা মস্ত বড়ো। গাছপালা তার অনেক। তাই দেখে তার বুক ফেটে কান্না এলো। বললো: 'হায় রে কপাল! কাঠের এ কুঠার আর শাবল নিয়ে আমি এতগুলো গাছ কাটবো কি করে?'

তবুও সে আশা ছাড়লো না। কাঠের কুঠারটা নিয়ে একটা গাছের গোড়ায় জোরে সে কোপ মারলো। কিন্তু তাতে গাছটা কাটা না গিয়ে কাঠের কুঠারটাই গেলো দু'-টুকরো হয়ে ভেঙে। সে তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করলো গলা ছেড়ে। একটু পরেই সে দেখতে পেলো তার স্ত্রী পরী-বউ খাবার আর জল নিয়ে আসছে তার দিকে। তাকে কাঁদতে দেখে তার বউ বললো:

'এমন করে কাঁদছ কেন তুমি ?'

'বলো কি, কাঁদবো না ? তোমার মা আমাকে কাঠের একটা কুঠার দিয়ে বললো কিনা বনের সব গাছ কাটতে হবে। গাছ কাটতে গিয়ে কুঠারটাই গেলো ভেঙে। এখন কি তিনি আমার আস্ত রাখবেন ?'

বৌ বললো : 'তুমি কেঁদো না। মন খারাপ করো না। খাবারটুকু খেয়ে নাও, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সে তখন খুশি হয়ে পেট ভরে খাবার-দাবার খেলো। তখন তার বউ বললো, 'এদিকে এসো আমি তোমার মাথার উকুনগুলো বেছে দিই।'

সে তখন তার বউ-এর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো। আর একটু পরেই পড়লো ঘুমিয়ে। তার বউ তখন করল কি, মুখে আঙুল পুরে তিনবার তিনটে শিস্ দিলো। আর সংগে সংগে এসে হাজির হোল এক দংগল কিম্ভুত-কিমাকার দৈত্য-দানব। দৈত্যরা পরী-বউ-এর কাছে গিয়ে বললো : 'দিদিমণি, আপনি আমাদের তলব করেছেন কেন ?'

তখন পরী-বউ বললো : ঐ সামনে যে বাগানটা দেখছ তার সব কটা গাছ তোমাদের কেটে ফেলতে হবে। তবে গাছগুলো থাকবে একপাশে আর ডালপালাগুলো অন্যপাশে। একটা ডালপালারও যেন নড়চড় না হয়।'

দৈত্য-দানবের দল তাই করলো। বনের গাছগুলো কেটে কেটে একসার করে রাখলো আর ডালপালাগুলো আর একসার। একটা ডালপালারও নড়চড় হলো না।

পরী-বউ তখন তার স্বামীকে জাগিয়ে দিলো। বললো :

'ওঠ, এই দেখ, তোমার গাছপালা সব কাটা হয়ে গেছে। কাটা গাছগুলো রয়েছে একদিকে আর ডালপালাগুলো অন্যদিকে।' সন্ধ্যা হবার আগেই সে এলো বাড়ি ফিরে। ওকে বাড়ি ফিরতে দেখে ডাইনী বুড়ি জিজ্ঞেস করলো : 'আমার গাছগুলো সব কাটা হয়েছে তো ?'

'হ্যাঁ মা, সব কাটা হয়েছে।'

ডাইনী বুড়ি তখন নিজে গেলো দেখতে গাছ সব কাটা হয়েছে কিনা। আর গিয়ে দেখে সত্যি সত্যিই কাটা হয়েছে। গাছগুলো রয়েছে একপাশে আর ডালপালা রয়েছে অন্যপাশে। তাই দেখে ডাইনী বুড়ির মনে খুব দুঃখ হলো। তবু কিন্তু সে ওকে পেট ভরে খেতে দিলো। শোবারও

জায়গা করে দিলো। পরদিন ভোরবেলা ডাইনী বুড়ি জেগে উঠে ওকে বললো :

'দেখ বাছা, আমি তোমাকে আমার মেয়ে নিয়ে যেতে দেবো, যদি তুমি একটা কাজ করো।'

'কি কাজ, মা ?'

'কাজটা হোল তুমি আবার কাটা গাছগুলো যার যার জায়গায় রাখবে পুঁতে। ডালপালাগুলোও তাদের যেন জোড়া লেগে যায়। একাজ করতে যদি না পারো তাহলে বলে রাখলাম তোমার কিন্তু মুণ্ডু কাটা যাবে।'

কাটাগাছ, তা কি আবার জোড়া লাগে ! তাকে তাই করতে হবে ! কিন্তু উপায় নেই। হতভাগা সে। তাই ভাবতে ভাবতে সে আবার বনের দিকে রওনা হোল। আর কাটাগাছগুলোর পাশে লুটিয়ে পড়ে কান্না শুরু করে দিলো।

একটু পরে তার বউ খাবার আর জল নিয়ে এসে হাজির হোল বনের মধ্যে। আর স্বামীকে অমন করে কাঁদতে দেখে বলে উঠলো :

'বাছুরের মত তুমি অমন করে কাঁদছো কেন ?'

'বল কি, কাঁদবো না ? তোমার মা যে আমাকে আবার বনের কাটাগাছগুলো জোড়া লাগাতে বলে দিলেন। ডালপালাগুলোও যার যার জায়গায় জুড়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। কাটা গাছ কি আবার জোড়া লাগে ? আমি এখন করবো কি ?'

'তোমাকে তা ভাবতে হবে না। সে আমি দেখছি। তোমার খাবার এনেছি। তুমি এখন খেয়ে নাও।'

এই বলে পরী-বউ তাকে খেতে দিলো নানা খাবার আর পান করবার জন্য জল দিলো। পেট ভরে সে তা খেলো। খেয়ে আরামের হাঁফ ছাড়লো। তার বউ তখন বললো :

'এবার এদিকে এসো। তোমার মাথায় উকুন হয়েছে। উকুনগুলো আমি বেছে দিই।'

সে তখন পরী-বউ-এর কাছে গেলো। আর কোলে তার মাথা রেখে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

এদিকে হয়েছে কি, ডাইনী মেয়ে তার মুখের মধ্যে আঙুল পুরে

শিস্ দিলো তিন তিনটে। আর সংগে সংগে এসে হাজির হলো একদল কিম্ভূত-কিমাকার দৈত্য-দানব। তারা এসে বললো :

'দিদিমণি, আমাদের আপনি তলব করেছেন কেন? আমরা আপনার কি কাজ করতে পারি?'

পরী-বউ তখন বললো : 'কাটা ঐ গাছগুলো আবার জোড়া লাগাতে হুকুম করছি। ডালপালাগুলোও যেন তাদের ঠিক ঠিক জায়গায় জোড়া লাগে। নড়চড় যেন না হয় কোথাও।'

'বেশ তাই হবে।'—এই বলে দৈত্য-দানবের দল ওখান থেকে চলে গেলো। আর একটু পরে বড়োলোকের ছেলে জেগে উঠে দেখে বনের কাটা গাছগুলো আবার যার যার জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কাটা ডালপালাগুলো আবার জোড়া লেগে গেছে আগের মতো। বড়োলোক-বাবুর ছেলে খুশি হয়ে ফিরে এলো সন্ধ্যা হবার আগেই। তাকে বাড়ি ফিরতে দেখে ডাইনী বুড়ী বলে উঠলো :

'কি, কাজ তোমার শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ মা, গাছগুলো আবার জোড়া লেগে গেছে।'

ডাইনী বুড়ি তখন নিজে দেখতে গেলো বনে। বনে গিয়ে দেখে সত্যি সত্যি গাছগুলো সব জোড়া লেগে গেছে। তাই দেখে মনে মনে সে কিন্তু খুব একটা খুশি হতে পারলো না। তবু বাড়ি ফিরে জামাইকে খেতে দিলো পেট ভরে। শোবারও জায়গা করে দিলো। আর মনে মনে বললো : ওকে নিয়ে এখন কি করা যায়? পরদিন ঘুম থেকে উঠে ডাইনী বুড়ি তাই তাকে ডেকে বললো :

'দেখ বাছা, তুমি আমার মেয়েকে আবার নিয়ে যেতে চাও, নাও; আমি আপত্তি করবো না। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।'।

'বেশ তো বলুন না কি কাজ।'

'কিছুদূর গেলেই তুমি দেখতে পাবে খুব বড়ো একটা পুকুর। পুকুরের সবটা জল এই চালুনী দিয়ে সেঁচে ফেলতে হবে। এমনভাবে সেঁচে ফেলতে হবে যেন একটা মাছও তার না মরে।'—এই বলে ডাইনী বুড়ি তাকে একটা চালুনী দিলো বড় বড় ছেঁদাওয়ালা।

তাই নিয়ে বড়োলোকের ছেলে পুকুর পাড়ে গেলো জল সেঁচতে। চালুনীটা একবার জলে ডুবিয়ে জল তুলতেই সবটা জল তার পড়ে

গেলো। তাই দেখে বুক ফেটে তার কান্না পেলো। এই শতছিদ্র চালুনী দিয়ে কি করে সে পুকুরের জল সবটা সে সেঁচে ফেলবে বুঝতে পারলো না। তাই পুকুর পাড়ে পা ছড়িয়ে বসে সে কান্না শুরু করে দিলো। একটু পরেই সে দেখতে পেলো পরী-বউ খাবার আর জল নিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। তাকে দেখে বললো :

'অমন করে তুমি কাঁদছো কেন ?'

'বলো কি, কাঁদব না ? এই শতছিদ্র চালুনী দিয়ে পুকুরের সব জল কি সেঁচা যায়। একটা যদি গামলাও দিতেন, তবুও আমি চেষ্টা করতাম। তোমার মা তো তাই হুকুম দিলেন। নইলে যে আমার মুণ্ডু নেবেন।'

তাই শুনে পরী-বউ বললো : 'ঠিক আছে। তুমি আর কেঁদো না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পরী-বউ তখন ওকে খেতে দিলো। জল দিলো পান করতে। আর সে দিব্যি খেয়ে-দেয়ে বৌ-এর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো। বৌ তখন তার উকুন বাছতে বাছতে মুখে আঙুল দিয়ে তিনটি শিস দিলো। আর সংগে সংগে এসে হাজির হোল কিম্ভূত-কিমাকার এক-দঙ্গল দৈত্যদানব। ওরা এসে পরী-বৌকে জিজ্ঞেস করলো : 'দিদিমণি, আমাদের খোঁজ করছেন কেন? এখন কি করতে হবে হুকুম করুন। এক্ষুণি করে দিচ্ছি।'

পরী-বৌ তখন বললো : 'এই সামনে যে পুকুরটি দেখছ তার সবটা জল নিঃশেষে সেঁচে ফেলতে হবে। যেন এক ফোঁটাও জল না থাকে কোথাও। আর পুকুরের একটা মাছও যেন না মরে।'

দৈত্য-দানবরা তাই করলো চোখের পলক পড়তে না পড়তে। পুকুরের একটা মাছও মরলো না। ওরা বিদায় নিতেই খোকাবাবুর ঘুম ভেঙে গেলো। জেগে উঠে দেখে পুকুরের কোথাও একফোঁটা জল নেই আর সব কটা মাছও আছে বেঁচে। তাই দেখে তার খুশি আর ধরে না। অমনি সে ছুটলো বাড়ির দিকে। বাড়ি এসে শাশুড়ীকে বললো : 'হ্যাঁ মা, আমি পুকুরের সবটা জল সেঁচে ফেলেছি। একটা মাছও মরেনি।'

শাশুড়ী তার অমনি ছুটলো দেখতে। দেখে, সত্যি সত্যিই পুকুরে

এক ফোঁটাও জল নেই। মাছগুলো সব রয়েছে বেঁচে। দেখে তার মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। বাড়ি ফিরে মনে মনে ভাবলো: 'ওকে নিয়ে এখন কি করা যায়? তিন তিনটি কাজ দিলাম করতে। সব কাজই ও ঠিক ঠিক করেছে। তবু আর একবার পরখ করা যাক।'

এই বলে সে তখন তাকে খেতে দিলো। জল দিলো পান করতে। শোবার ঘরও দিলো দেখিয়ে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে ডাইনী বুড়ি ওকে ডেকে তুললো। বললো: 'হ্যাঁ বাছা, তুমি আমার মেয়েকে বউ করে নিয়ে যেতে চাও যাও। আমি আপত্তি করব না। কিন্তু তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে।'

'কি কাজ মা বলুন, এক্ষুণি করে দেবো।'

'পুকুরের যে জলটা তুমি সেঁচে ফেলেছ তা তোমাকে আবার সেই জল দিয়ে পুকুরটা ভর্তি করতে হবে। দেখো, জলে যেন আরও বেশি মাছ থাকে।'

তাই শুনে সে মাথা নেড়ে সায় দিলো:

'তাই হবে।' কিন্তু পুকুরপাড়ে গিয়ে সে আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো: 'হায়রে, কি কপাল নিয়েই না এসেছি। এখন অত জলই বা পাই কোথায়? আর অত মাছ!' এই বলে সে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

তার কান্না শুনে পরী-বৌ এসে হাজির হোল। জিজ্ঞেস করলো সে অমন করে কাঁদছে কেন? তখন সে তার কান্নার কারণ বললো: 'এই শুকনো পুকুর আমি এখন ভর্তি করবো কেমন করে? আর অত মাছই বা পাব কোথায়? তা না হলে, তোমার মা যে আমায় মেরে ফেলবেন।'

পরী-বৌ তখন বললো: 'এ নিয়ে তুমি ভেবো না। এই নাও, খাবার এনেছি, খাও। জল এনেছি, জল খাও।'

খোকাবাবু তাই করলো। পেট ভরে খাবার খেলো। পরী-বৌ তখন বললো: 'আমার কাছে এস। আমি তোমার মাথার উকুন বেছে দিই।'

পরী-বৌ এর কোলে মাথা রেখে সে শুয়ে পড়লো। আর একসময়, কখন ঘুমিয়ে পড়লো।

খোকাবাবু ঘুমিয়ে পড়লে পরী-বৌ তখন করলো কি, মুখের মধ্যে আঙুল পুরে সে আবার তিনটি শিস দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে এসে;

উপস্থিত হোল এক দঙ্গল কিম্ভূত-কিমাকার দৈত্য-দানব। তারা এসে পরী-বৌকে জিজ্ঞেস করলো : দিদিমণি, আপনি আমাদের খোঁজ করছেন কেন ? আমরা কি করতে পারি ?'

পরী-বৌ তাদের হুকুম করলো : 'ঐ যে শুকনো পুকুরটা দেখছ তা কানায় কানায় ভর্তি করে দাও জলে। আর তাতে যেন অনেক মাছ থাকে।'

চোখের পলক পড়তে না পড়তে দৈত্য-দানবরা তাই করলো। পুকুরটা দিলো জলে কানায় কানায় ভর্তি করে। আর অনেক মাছও কিলবিল করতে লাগলো পুকুরে। খোকাবাবু তখন ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখলো, পুকুরটা জলে ভর্তি হয়েছে আর পুকুরে অনেক মাছ। খোকাবাবু খুশি হয়ে ছুটলো বাড়ির দিকে আর সুখবরটি দিলো তার শাশুড়ীকে।

'ঠিক বলছো তো ?'

'হ্যাঁ মা, ঠিক। আপনি গিয়ে দেখে আসুন।'

ডাইনী বুড়ি অমনি ছুটলো দেখতে। দেখে পুকুরে আবার হয়েছে জল। আর অনেক মাছ। তাই দেখে সে কিন্তু খুব খুশি হতে পারলো না। বাড়ি ফিরে ভাবলো : 'তাই ত, ওকে নিয়ে কি করা যায় এখন! চার-চারবার তো পরীক্ষা করলাম। কিন্তু প্রতিবারই তো সে উত্তরে গেল। এবার আর পরীক্ষা নয়। মেরেই ফেলবো ওকে।' তবুও ডাইনী বুড়ি তাকে খেতে দিলো। শোবারও দিলো ব্যবস্থা করে।

রাতে পরী-বউ স্বামীর কাছে এসে বললো :

'ওঠো, এক্ষুণি আমাদের পালাতে হবে। কাল আমার মা তোমাকে মেরে ফেলবে। তাই এক্ষুণি চলো পালাই।' পরী-বউ স্বামীকে আরো বললো : 'আমার মা যদি আমাদের পিছু নেয় তখন আমি হয়ে যাবো সুন্দর একটি ফুল। আর তুমি হবে তৃণভূমি।'

'বেশ তাই হবে।'

'আর যদি দেখ বাবা আমাদের পিছু নিয়েছে তাহলে আমি হবো এক গির্জা আর তুমি হবে এক বুড়ো পাদরী।'

'বেশ তাই হব।'

'আর যদি তুমি দেখতে পাও আমার কোনো বোন আমাদের পিছু নিয়েছে, তখন আমি হয়ে যাবো একটি পাতিহাঁস। আর তুমি হয়ো একটা পুরুষ-হাঁস।' সে আবার বললো :

'আমি কিন্তু হাঁস হয়ে বেশিক্ষণ বাঁচবো না। যা কিছু করার তুমি তাড়াতাড়ি করে নিয়ো। আমার বোন যদি বলে : 'হ্যাঁ ভাই ফিরে আয়, আমাদের ছেড়ে যাস না। তুমি কিন্তু তার মিষ্টি কথায় ভুলো না। সংগে সংগে তুমি এক পুরুষ-হাঁসের বেশ ধরে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তোমার ডানা দিয়ে তার মাথায় ঘা মেরে তাকে মেরে ফেলবে।'

'বেশ তাই হবে।'

ওরা তখন ডাইনী-বাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। কিছুদূর যেতে-না-যেতেই ওরা বুঝলো কে বা কারা যেন তাদের পিছু নিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে পরী-বউ দেখে তার দিদি হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে আসছে তাদের দিকে। দেখেই পরী-বউ তখনি তার স্বামীকে বললো : 'এখনই তুমি সবুজ এক তৃণভূমি হয়ে যাও আর আমি হচ্ছি সুন্দর একটি ফুল।'

দেখতে দেখতে পরী-বউ আর তার স্বামী তাই হয়ে গেলো। পরী-বউ হোল সুন্দর একটি ফুল। আর তার স্বামী হলো সবুজ এক-ফালি তৃণভূমি।

এদিকে দিদি এসে দেখে কোথাও কেউ নেই। শুধু এক ফালি তৃণভূমি আর তাতে ফুটে আছে সুন্দর একটি ফুল।

তাই দেখে সে বাড়ি ফিরে গেলো। আর ফিরে গিয়ে মাকে সব বললো। ডাইনী-মা তো সব শুনে রেগে আগুন। 'মাঠের মাঝখানে বন গজিয়ে উঠলো কেমন করে। আর তাতে ফুলই বা ফুটলো কেমন করে? তাই যদি ফোটে, ফুলটা তুই তুলে আনলি না কেন?'

রেগে-মেগে ডাইনী-মা নিজেই চললো এবার মেয়ে আর জামাইকে ধরে আনতে। এদিকে ওরা কিন্তু অনেক দূর চলে গেছে। ডাইনী-মা তবুও তাদের পিছু পিছু ছুটলো। পরী-বউ তখন তার স্বামীকে বললো : 'আমি এবার এক পাতিহাঁস সেজে নিচ্ছি। তুমিও একটা রাজহাঁস সেজে নাও।' এই বলে সংগে সংগে পরী-বৌ নিজে একটা পাতিহাঁস হয়ে গেলো, আর পুকুরের জলে সাঁতার কেটে বেড়াতে লাগলো। আর তার স্বামীও হয়ে গেলো এক রাজহাঁস। ডাইনী-মা

পুকুর পারে এসে দেখে পুকুরের জলে সাঁতার কাটছে একটা পাতিহাঁস। একটি রাজহাঁসও রয়েছে তার সাথে। এরা যে কারা তা বুঝে নিতে দেরি হোল না তার। সে তাই বলে উঠলো : 'দাঁড়া, তোদের আমি ধরছি এবার।' এই বলে সে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ছদ্মবেশী রাজহাঁসটির তখন পরী-বউ-এর কথা মনে পড়লো। সে তাই করলো কি, ডাইনী-মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডানার ঘা মেরে মেরে তাকে প্রাণে মেরে ফেললো।

পরী-বউ আর তার স্বামী তখন জল থেকে উঠে নিজ নিজ বেশ ধরে পথ চলতে শুরু করলো। কিছুদূর যেতে-না-যেতেই তারা দেখলে আবার কে যেন পিছু নিয়েছে তাদের। মুখ ফিরিয়ে দেখে তাদের বুড়ো বাপ ছুটে আসছে তাদের ধরার জন্য। পরী-বউ তখন তার স্বামীকে বললো : 'আর দেরি কোরো না। তুমি এখনই এক বুড়ো পাদরী হয়ে যাও। আর আমি হয়ে যাচ্ছি গির্জা।'

সঙ্গে সঙ্গে বনের ধারে গজিয়ে উঠলো এক গির্জা। আর তার মধ্যে দেখা গেলো এক পাদরী সাহেবকে। বুড়ো বাপ এসে দেখে তার মেয়ে আর জামাই কেউ নেই কোথাও। শুধু রয়েছে এক গির্জা আর এক পাদরী। তাই দেখে তার কেমন যেন খটকা লাগল। মনে মনে ভাবলো : পাঁচ কুড়ি বছর তার বয়স হোল। জীবনে কোনোদিন সে পাদরী সাহেবকে চোখে দেখে নি। দেখে নি কোনো গির্জা। দু'দিন পরে সে মরবে। মরবার আগে ভগবান তার সাথে কি লীলাটাই না খেললে। এইসব ভাবতে ভাবতে সে বাড়ি ফিরলো।

বাপকে বাড়ি ফিরতে দেখে তার দুই মেয়ে তাকে ঘিরে ধরলো। বললো :

'একি, তুমি শুধুহাতে ফিরে এলে? বোন আর তার বরকে ধরে আনতে পারলে না? ওরা যে মাকে মেরে ফেলেছে। বোনটা আমাদের সব কারিকুরী তার বরকে শিখিয়ে দিয়েছে, ওদের মেরে ফেলতে না পারলে যে আমাদের রক্ষে থাকবে না।'

এই বলে বড়ো বোন নিজেই চললো ওদের ধরে আনতে।

এদিকে পরী-বউ আর তার স্বামী নিজেদের বেশ ধরে পথ চলতে শুরু করলো। কিছুদূর যেতে-না-যেতেই দেখতে পেলো তার দিদি তাদের

পিছু নিয়েছে। পরী-বউ তখন স্বামীকে বললো :

'আমি নিজে এক পাতিহাঁসের বেশ ধরছি। আর তুমিও এক পুরুষ-হাঁসের বেশ নাও। দিদি আমাকে ধরতে এলে তুমি ডানার ঘা মেরে মেরে তাকে মেরে ফেলবে।'

সে তাই করলো। নিজে এক পুরুষ-হাঁস সেজে বসলো। পরী-বউ বেশ নিলো এক পাতিহাঁসের। পথের মাঝখানে দুটি হাঁস দেখতে পেয়ে ডাইনী-দিদি বুঝতে পারলো ওরা কারা। সে তখন হাঁসটির কাছে গিয়ে বলতে লাগলো :

'হ্যাঁ ভাই, তুই আমার সঙ্গে চল্। তোদের আমি কিছু বলবো না। যদি তুই না যাস তবে আমি নিজে মরবো।' এই বলে ডাইনী-দিদি যেই পরী-বউকে ধরতে যাবে, অমনি পুরুষ হাঁসটি ডাইনী-দিদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাখার ঘা মেরে মেরে তাকে মেরে ফেললো পথের মাঝখানে। তাই দেখে পরী-বউ তখন বলে উঠলো : 'বাঁচা গেলো, এরপর আমাদের কেউ আর পিছু নেবে না।'

এই বলে ওরা আবার নিজ নিজ বেশ ধারণ করে চলতে শুরু করে দিলো বাড়ির দিকে। চলতে চলতে ওরা এক সময় এসে উপস্থিত হলো যাঁতাওয়ালার বাড়িতে। এই যাঁতাওয়ালার বাড়ি থেকে দৈত্যরা এসে তাকে থলে করে পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো ডাইনী-বুড়ির বাড়ি। পরী-বউ-এর খবর তাকে যাঁতাওয়ালাই দিয়েছিলো প্রথম।

যাঁতাওয়ালা ওদের দেখে খুশি হোল খুব। বললো : 'আমি ভেবেছিলাম ডাইনীদের হাতে তুমি মারা পড়েছ। এখন দেখতে পাচ্ছি তুমি তোমার পরী-বউ নিয়ে ফিরে এসেছ সশরীরে।'

বাবুর ছেলেও বন্ধুকে দেখে খুব খুশি হোল। আর বন্ধুর হাতে একরাশ টাকাকড়ি, হীরে-জহরৎ, মনি-মুক্তো তুলে দিলো।

খুশি হয়ে ওরা তখন নিজেদের দেশে ফিরে গেল।

ছেলে আর তার পরী-বউকে বাড়ি ফিরতে দেখে বুড়ো বাপ-মার খুশি আর ধরে না।

দীর্ঘ কুড়ি বছর পর তার নিজের বাপ-মাকে দেখে পরী-বউ এবং ছেলেটাও আহ্লাদে আটখানা।

বুড়ো বাপ-মা আর ছেলেকে নিয়ে পরী-বউ আর তার স্বামী সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করতে লাগলো।

১২

এক ছিলো রাজা। রাজার ছিলো তিন ছেলে—তিন রাজপুত্তুর। তাদের মধ্যে প্রথম দু'জন ছিলো খুব চালাক-চতুর আর ছোটটা ছিলো খুব বোকা। রাজার ছিলো একটা আপেলের গাছ। আর এই আপেল গাছে ফলতো সোনালী আপেল ফল। কিন্তু প্রতিদিন রাতে সেই ফল যেত চুরি। কে বা কারা এসে আপেলগুলো চুরি করে আর রাজা এজন্য চাকর-বাকরদের শাস্তি দিতে কসুর করতেন না।

এই দেখে রাজার বড় ছেলে একদিন বললো :

'বাবা, আমি রাত জেগে আপেল-চোরদের ধরবো। যদি চোর ধরতে না পারি আপনি আমায় প্রাণদণ্ড দেবেন।'

রাজা তাই শুনে বললেন : 'ভালো কথা। তুমি যেতে চাও, যাও।'

বড় রাজকুমার বাগানে আপেল গাছতলায় গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইলো। আর জেগে জেগে পাহারা দিতে লাগলো গাছের সোনালী আপেলগুলো। কিন্তু রাজপুত্র যেই একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছে অমনি কোত্থেকে এক সোনালী পাখি এসে গাছের সোনালী একটা আপেল ফল নিয়ে পালিয়ে গেলো।

পরদিন রাজা ঘুম থেকে উঠে বাগানে গিয়ে দেখেন সোনালী আপেল গাছে একটি আপেল নেই। রাজা তাই দেখে রাজপুত্রকে ডেকে বললেন :

'কাল রাতেও সোনালী আপেল গাছের সোনালী আপেল ফল চুরি গেছে। কিন্তু চোর কি ধরা পড়েছে?'

রাজপুত্র কিন্তু কোন জবাব দিতে পারলো না। রাজা তাই দেখে বললেন : 'তুমি যখন চোর ধরতে পারনি তখন তোমার গর্দান যাবে।'

তাই শুনে রাজবাড়ির সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলো। অমাত্যরা সবাই রাজার কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানালো : 'মহারাজ, রাজপুত্রকে এবারের মতো ক্ষমা করুন। চোর নিশ্চয় ধরা পড়বে।'

রাজা তাই রাজপুত্রকে ক্ষমা করলেন।

এবার মেজভাই-এর পালা। মেজ রাজকুমার রাজার কাছে গিয়ে বললো: 'বাবা, আমি সোনালী আপেল পাহারা দেব আর আপেল-চোরকে ঠিক ধরে আনবো।'

রাজা তাই শুনে বললেন: 'ভালো কথা, তুমি যেতে চাও, যাও।'

মেজ রাজকুমার আপেল গাছতলায় গিয়ে ওত পেতে বসে রইলো। আর প্রহর গুনতে লাগলো আপেল-চোর কখন আসে। কিন্তু মেজ রাজকুমার ঘুমের ঘোরে যেই একটু ঢুলে পড়েছে, অমনি কোত্থেকে এক সোনালী পাখি এসে সোনালী একটা আপেল ফল নিয়ে পালিয়ে গেলো।

পরদিন রাজা বাগানে গিয়ে দেখেন সোনালী আপেল গাছ থেকে একটি ফল চুরি গেছে কাল রাতে। তিনি তখন মেজ রাজকুমারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন:

'কাল রাতেও আপেল চুরি গেছে। তুমি কি চোরকে ধরতে পেরেছো?'

'না বাবা, ধরতে পারিনি, পালিয়ে গেলো।'

'চোরকে তুমি দেখেছো তা হলে?'

'হ্যাঁ বাবা, দেখেছি।'

'যদি দেখেই থাকো তবে পালালো কি করে?' তিনি তাই মেজ রাজকুমারের গর্দান নিতে হুকুম দিলেন। তাই শুনে রাজ্যের সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলো। অমাত্যরা সবাই মহারাজের কাছে ধরনা দিয়ে বললো:

'মহারাজ, মেজ রাজকুমারকে এবারের মতো মাপ করুন।'

মহারাজা তাই করলেন। রাজপুত্রকে ক্ষমা করলেন।

এবার ছোট ভাই-এর পালা। ছোট রাজকুমার মহারাজকে বললো: 'বাবা, আপনি যদি আমায় চোর ধরতে পাঠান, তাহলে আমি ঠিক আপেল-চোরকে ধরতে পারবো।'

'তোমার চালাক-চতুর ভাইরা চোর ধরতে পারলো না, আর তুমি কিনা বোকা-সোকা হয়ে বলছো আপেল-চোরকে ধরবে?'

'সে আপনি ভাববেন না বাবা, আমার দাদারা সব চালাক-চতুর হয়ে যা পারলো না, আমি বোকা মানুষ হয়েই তা পারবো।'

রাজা তাই শুনে বললেন: 'ভালো কথা, তাই যাও। ধরে আনো চোর। কিন্তু মনে রেখো, চোর ধরতে না পারলে তোমার গর্দান যাবে।'

'হ্যাঁ বাবা, চোর ধরতে না পারলে আপনি আমার গর্দান নেবেন। কিন্তু যদি চোর ধরতে পারি, তবে আমি আপনার প্রাণ নেবো।'

'বেশ তাই নিয়ো। আমি তাতে রাজী।'

বোকা রাজকুমার বাড়ি এসে চোর ধরার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। সন্ধ্যে হতে না হতে বাগানে গিয়ে সোনালী আপেল গাছটায় সে চড়ে বসলো। তারপর একটা সূচ বার করে গাছের ডালে তা বিঁধে নিলো। তারপর নিজের চিবুকখানা রাখলো তার ওপর আলতো করে। ভাবলো : 'আমার যদি ঘুম পায় তবে আমি ঢুলে পড়বো এই সূচটার ওপর আর তা আমার চিবুকে যাবে গেঁথে। আমিও তখন জেগে উঠবো।'

বোকা ছোটভাই এই ভাবে সারা রাত জেগে জেগে পাহারা দিলো আপেল গাছটা।

এদিকে হয়েছে কি, রাত ভোর হয়ে আসতেই কোত্থেকে এক সোনালী পাখি এসে বসলো আপেল গাছটার ওপব। তারপর পালাবার মতলব করে একটা সোনালী আপেল ফল তুলে নিলো।

ছোট ভাইও প্রস্তুত ছিল। সে অমনি তার গাদা বন্দুকটা তুলে নিয়ে গুলি ছুঁড়লো সোনালী পাখিটাকে তাক করে। গুলিটা সোনালী পাখিটার গায়ে ঠিক লাগলো না। তবে তিন তিনটে সোনালী পালক তার খসে পড়লো।

ছোট ভাই সোনালী পালক তিনটে কুড়িয়ে নিলো। আর তাই হাতে করে চললো রাজার কাছে। বাবা ছেলেকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন : 'এই যে, চোরটা ধরা পড়লো?'

'না বাবা, ধরতে পারিনি। তবে তিন-তিনটে পালক তার উপড়ে নিয়েছি।'

'তা হলে তুমি এবার আমার গর্দান নাও।'

'না বাবা, আমি আপনার গর্দান নেবো না।' এ বলে ছোট ভাই সোনালী পাখির সে তিনটে পালক দেখালো তার বাবাকে। ঝলমলে পালকগুলো দেখে রাজার চোখ গেল ধাঁধিয়ে। তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন।

বড় ভাই তখন বাবার কাছে গিয়ে বললো :

'বাবা, আমি পাখিটার খোঁজে যাচ্ছি।'

'যাও বাবা, তবে নিজের ওপর যত্ন নিয়ো।'

বড় রাজকুমার ধনাগারে গিয়ে বিস্তর ধন-রত্ন নিলো সংগে করে আর নিলো তেজী একটা ঘোড়া। আর তার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়লো সোনালী পাখির খোঁজে। ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে বড় রাজকুমার একসময় এসে উপস্থিত হলো এক সরাইখানায়। ঘোড়া থেকে নেমে সে তখন সরাইখানায় গিয়ে প্রবেশ করলো। আর চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খেয়ে নিলো এক রাশ। খেতে খেতে কান পেতে শুনলো পাশের ঘরে কারা যেন কিসব কথা বলে চলেছে তাকে নিয়ে। দেয়ালের একটা ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো পরীর মত দেখতে বারোটা মেয়ে বসে বসে তাস খেলছে পাশের ঘরে।

রাজপুত্র তখন ধীরে ধীরে দরজাটা খুললো। মেয়েগুলি তাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো :

'এই যে রাজকুমার, আসুন আমাদের সংগে খেলতে বসুন এক হাত।'

রাজকুমার তখন সুন্দরী ঐ মেয়েদের সাথে তাস খেলতে বসলো। আর খেলতে খেলতে নিজের টাকাকড়ি ধনদৌলত সব হারালো। এমন কি তেজী ঘোড়াটা পর্যন্ত খোয়ালো বাজী রেখে। গায়ের জামাটাও তাকে বাঁধা রাখতে হলো। শেষমেশ সে তখন সুন্দরী ঐ মেয়েগুলোর কাছ থেকে একশটি ফ্লোরিন ধার নিলো। আর তাই দিয়ে আবার তাসের বাজী ধরলো।

এ দানেও রাজকুমার হেরে গেলো।

রাজকুমারের হাতে তখন কানাকড়িটিও রইলো না। দেনার দায়ে তাই তাকে ধরে নিয়ে গেলো কোতোয়াল। আর পুরলো জেলখানায়।

'বড় ভাইকে ফিরতে না দেখে মেজ ভাই তখন যাবার জন্য প্রস্তুত হোল। সে তার বাবার কাছে গিয়ে বললো :

'বাবা, দাদা তো ফিরলো না। আমিই যাচ্ছি চোরটাকে ধরে আনতে।'

রাজা বললেন : 'তোমার দাদা গেলো, এখনও ফিরলো না। তুমিও আবার যেতে চাইছ ? তা যাও। তবে শরীরের প্রতি যত্ন নিয়ো।'

মেজ রাজকুমারও রাজার ধনাগারে গিয়ে বিস্তর টাকা-কড়ি, মনি-মুক্তো সংগে নিলো। আস্তাবলে গিয়ে বেছে নিলো তেজী একটা ঘোড়া। তাই চড়ে মেজ রাজকুমার চললো সোনালী পাখির খোঁজে। সেও এসে হাজির হোল সেই সরাইখানায়। আর চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খেতে বসলো

পেট ভরে। খেতে খেতে দেখে পরীর মতো দেখতে বারোটা মেয়ে বসে বসে তাস খেলছে। ওরা তাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো :

'আসুন রাজকুমার, আসুন, আমাদের সঙ্গে একহাত খেলে যান তাস।'

মেজরাজকুমারও ওদের সাথে তাস খেলতে বসলো। আর হারতে লাগলো প্রতি দানে দানে। এমনি করে মেজভাইও তার টাকা-কড়ি ধন-রত্ন সবই হারালো। এমন কি তেজী ঘোড়াটাও। পরনের কাপড়খানাও হারালো সর্বনেশে সেই তাস খেলায়।

রাজকুমার তখন মেয়েদের কাছ থেকে ধার করলো একশ'টা ফ্লোরিন। আর তাই নিয়ে আরও এক দান খেললো। এবারও কিন্তু তার জেতা হোল না। দেনার দায়ে তাই মেজ রাজকুমারেরও জেল হয়ে গেলো ছ'মাস।

একদিন নয়, দু'দিন নয়—ছয় ছয়টি মাস কেটে গেলো। রাজকুমারদের দেখা নেই। তাই দেখে ছোট রাজকুমার রাজার কাছে গিয়ে বললো, সে সোনালী পাখির খোঁজে যাবে। খোঁজ করবে তার দু'ভাই-এর। তাই শুনে রাজা বললেন :

'তুমি হলে বোকা-সোকা মানুষ, তুমি আবার কোথায় যাবে সোনালী পাখির খোঁজে? তবে যেতে চাও যাও! তোমার চালাক-চতুর দাদারা পারলো না যা, তুমি হয়তো তাই পারবে।' রাজা ছোট ছেলেকে যেতে অনুমতি দিলেন। বললেন :

'যাও, ধনাগারে গিয়ে তোমার খুশিমত ধনরত্ন, টাকা-কড়ি সঙ্গে নাওগে। তেজী একটা ঘোড়াও নিয়ো বেছে।'

ছোট রাজকুমার কিন্তু টাকা-কড়ি, ধনরত্ন কিছুই সঙ্গে নিলো না। শুধু সঙ্গে নিল দু'বোতল মদ। আর তাই নিয়ে ভগবানের নাম করে সে রওনা হোল বনের পথ ধরে। বনের মধ্যে কিছুটা গিয়ে সে দেখতে পেলো খোঁড়া একটা খরগোশ। খরগোশটা ছোট রাজকুমারকে দেখে ঝোপের আড়ালে পালাতে গেলো। কিন্তু পারলো না পালাতে। ধরা পড়লো রাজকুমারের হাতে।

খোঁড়া খরগোশটা তখন রাজপুত্রের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইলো। বললো : 'ঈশ্বরের দোহাই, আপনি আমায় প্রাণে মারবেন না।'

বোকা রাজপুত্র তাকে আর প্রাণে মারলো না। পকেট থেকে আধখানা পাঁউরুটি বার করে খরগোশটাকে খেতে দিলো। একটুখানি মদও খেতে দিলো তাকে। নিজেও খেলো খানিকটা। খরগোশটা পেট ভরে পাঁউরুটি আর মদ খেলো। তারপর রাজপুত্রকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো : 'বলবো আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন ?'

'কোথায় যাচ্ছি বল তো দেখি ?'

'যাচ্ছেন সোনালী পাখির খোঁজে। এই পাখিটার তিন-তিনটে পালক আপনি আপনার বন্দুক দিয়ে নিয়েছেন উপড়ে। তাই দেখে আপনার বাবা হয়ে গেছেন অন্ধ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই তো! তুমি অতো জানলে কি করে ?'

'তা আমি জানি।' খরগোশটা বললো, 'আরও শুনুন, আপনি যে সোনালী পাখির খোঁজে যাচ্ছেন সেখানে গিয়ে দেখতে পাবেন তিন-তিনটে খাঁচা রয়েছে পর পর। কোনোটা বা হীরে দিয়ে তৈরি ; কোনোটা বা সোনার, কোনোটা আবার কাঠের। হীরের খাঁচায় দেখতে পাবেন হীরের পাখি। সোনার খাঁচায় সোনালী পাখি, রুপোর খাঁচায় রুপোর পাখি আর কাঠের খাঁচাটায় রয়েছে বিশ্রী একটা পাখি। হীরে বা সোনার খাঁচা দেখে তা নেবার জন্য লোভ করবেন না কিন্তু। লোভ করলে কিন্তু মহাবিপদে পড়বেন।' খরগোশ তারপর বললো : 'এবার আপনি আমার পিঠে চেপে বসুন। আর ঘোড়াটাকে বনে ছেড়ে দিন ঘাস খেতে।'

রাজপুত্র তাই করলো। সে খোঁড়া খরগোশটার পিঠে চেপে বসলো। আর খরগোশটা তাকে নিয়ে চললো রাজবাড়ির দিকে. যেখানে রয়েছে সোনালী পাখি। যেতে যেতে খরগোশটা আবার রাজপুত্রকে মনে করিয়ে দিলো সে যেন সোনার খাঁচা দেখে ভুলে না যায়। আর কাঠের বিশ্রী খাঁচাটাকে যেন বেছে নেয়।

এখন হয়েছে কি, বোকা ছোট রাজপুত্র তো পাখি চুরি করতে গেলো। গিয়ে দেখে কি, সত্যি তিন-তিনটে খাঁচা রয়েছে ঝুলোনো। বিশ্রী খাঁচাটাকে দেখে সে ভাবলো, বিশ্রী এ খাঁচা নেবার চাইতে হীরে-মণি-মুক্তোর মতো দামী ওই খাঁচাটাই তো নেওয়া ভালো। এই বলে সে হীরের খাঁচাটা তুলে নিলো। আর যেই না তোলা অমনি হীরের খাঁচার

পাখিটা ডেকে উঠলো কিচমিচ করে। আর তাই শুনে রাজবাড়ির পাহারাদার, পাইক-বরকন্দাজ সান্ত্রীরা সব ছুটে এলো। আর ছোট রাজপুত্রকে ধরে নিয়ে এলো রাজার কাছে।

পরদিন রাজা তাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন: 'তুমি অত রাতে আমার রাজপুরীতে প্রবেশ করলে কি করতে?'

'মহারাজ, আপনার যে সোনালী পাখিটা আমাদের সোনালী আপেল রোজ রাতে চুরি করে তাকে আমি ধরতে এসেছি।'

রাজা তাই শুনে বললেন:

'শোনো, তুমি সোনালী পাখি নিতে চাও, তাই দেব। তোমাকে কিন্তু একটা জিনিস আমায় দিতে হবে। পাশের রাজ্যের রাজার কাছে আছে রুপোলী এক ঘোড়া। তুমি যদি আমায় সেই রুপোলী ঘোড়াটা এনে দিতে পারো, আমি তাহলে তোমাকে এই সোনালী পাখিটা দিয়ে দেবো।'

'বেশ, তাই আনবো।' এই বলে রাজপুত্র রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো খোঁড়া খরগোশটার কাছে। আর বলতে লাগলো তার দুঃখের কাহিনী।

তাই শুনে খরগোশ বললো: 'আমি না আপনাকে বারবার মানা করে ছিলাম দামী খাঁচায় হাত দেবেন না। আপনি কিন্তু আমার কথা শুনলেন না। এখন তার জন্য অনুতাপ করুন।'

খরগোশ আবার বললো: 'সে যাক্। এখন আমার সঙ্গে আসুন। আমি যা বলি তা শুনুন। যে রাজবাড়িতে আপনাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি তার আস্তাবলে দেখবেন, তিন-তিনটে ঘোড়া বাঁধা আছে পাশাপাশি। তাদের মধ্যে একটি ঘোড়া সোনার, একটি রুপোর। আর তৃতীয় ঘোড়াটা রোগা, হাড্ডিসার। দরজার কাছে দেখবেন বাঁধা আছে। খবরদার সোনার কি রুপোর কোনো ঘোড়া ছোঁবেন না। রোগা ঘোড়াটাই বেছে নেবেন।'

ঘোড়া চুরি করতে গিয়ে রাজকুমার কিন্তু সোনার ঘোড়াটা বেছে নিলো।

মনে মনে বললো: 'সোনার ঘোড়া ছেড়ে কে আর ঐ হাড্ডিসার ঘোড়াটা নেয়?'

এই বলে সে সোনার ঘোড়াটার পিঠে চাপতে গেলো। আর সোনার ঘোড়াটা অমনি পিছনের পা দুটো ছুঁড়ে এমন জোরে ডেকে উঠলো যে

রাজবাড়ির সবাই জেগে উঠলো। পাহারাদার, পাইক-বরকন্দাজ, সান্ত্রীরা সব ছুটে এলো। আর বোকা রাজপুত্রকে ধরে নিয়ে এলো রাজার কাছে।

পরদিন রাজা রাজকুমারকে জিজ্ঞেস করলো: 'তুমি এতো রাতে রাজপ্রাসাদে ঢুকে কি করছিলে?'

'আমি আপনার রুপোর ঘোড়াটা চুরি করতে এসেছিলাম, মহারাজ! কেননা আমাদের পাশের রাজ্যের রাজা আমাকে বলে দিয়েছেন, আমি যদি আপনার রুপোর ঘোড়াটা নিয়ে তাঁকে দিতে পারি তাহলে তিনি আমাকে তাঁর সোনার পাখিটা দিয়ে দেবেন।'

'ওহ্. তাই বুঝি! আমি তোমাকে আমার রুপোর ঘোড়াটা দিয়ে দেব যদি তুমি একটা কাজ করতে পার। আমাদের পাশের রাজার আছে এক রাজকন্যা, তার মাথায় আছে সোনালী চুল। তুমি যদি তাকে ধরে নিয়ে আসতে পার তবে আমি তোমাকে রুপোর ঘোড়াটা দিয়ে দেব।'

'ও, তাই! সোনালী-চুল-রাজকন্যাকে আমি ঠিক নিয়ে আসবো মহারাজ।'

রাজপুত্র তখন খরগোশের কাছে গিয়ে সব বললো। তাই শুনে খরগোশ বলে উঠলো: 'আমি না বারবার আপনাকে নিষেধ করেছিলাম রুপোর ঘোড়াটায় চড়তে যাবেন না। হাড্ডিসার ঘোড়াটাই বেছে নেবেন। তা আপনি কিন্তু আমার কথা শুনলেন না। ভাগ্যিস্ প্রাণ নিয়ে ফিরেছেন। সে থাক, এখন আমার সাথে চলুন। আমি আপনাকে সোনালী-চুল-রাজকন্যার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

এই বলে খরগোশটা ছোট রাজকুমারকে সোনালী-চুল-রাজকন্যার কাছে নিয়ে চললো।

সোনালী-চুল-রাজকন্যার বাড়ির কাছে গিয়ে বললো:

'এখন যান রাজকন্যার সাথে খানা-পিনা করুন গিয়ে। রাতে দু'জনে যখন ঘুমিয়ে পড়বেন আমি তখন দু'জনকে পিঠে করে নিয়ে আসবো।'

রাজপুত্র তাই করলো। সোনালী-চুল-রাজকন্যার সাথে খানা-পিনা, খেলাধুলা করে রাত কাটালো। তারপরে দু'জনে যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন খরগোশ তাদের দু'জনকে নিয়ে চললো পিঠে করে।

সকালবেলা রাজকন্যে জেগে উঠে খরগোশকে জিজ্ঞেস করলো:

'আমায় কোথায় নিয়ে চললে?'

খরগোশ বললো : 'আমি আপনাকে রাজপুত্রের দেশের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। রাজপুত্রের সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে। আপনারা দু'জনে সুখে ঘর-সংসার করতে পারবেন।'

রাজকন্যা তাই শুনে খুশি হলো।

বোকা রাজপুত্র তখন খরগোশকে বললো : 'আচ্ছা সোনালী-চুল-রাজকন্যাকে তো আনলে, এখন রুপোর ঘোড়া আর সোনালী পাখি আনবে কি করে?'

'সে আমার কাজ, আমি করবো। আপনাকে ভাবতে হবে না।' এই বলে খোঁড়া খরগোশটা রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে নিয়ে রওনা হোল। আর রাত্রিবেলা রাজার আস্তাবলে গিয়ে রোগা হাড্ডিসার ঘোড়াটা আনলো চুরি করে। আর তাতে চেপে বোকা রাজপুত্রের কাছে হাজির হোল। রাজপুত্র তখন দেখে কি, তার চোখের সামনে রোগা হাড্ডিসার ঘোড়াটা আর নেই। তার জায়গায় দিব্যি সুন্দর একটা রুপোর ঘোড়া রয়েছে দাঁড়িয়ে। তাই দেখে তার আর খুশি ধরে না। রাজকন্যাকে তার ওপর চাপিয়ে ওরা তখন ভগবানের নাম করে রাজবাড়ির দিকে চললো যেখানে রয়েছে সোনালী পাখিটা। রাজবাড়ির বাইরে রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে রেখে এক নম্বর রাজপ্রাসাদে খরগোশ ঢুকে পড়লো। আর কাঠের খাঁচার পাখিটা নিয়ে এসে উপস্থিত হোল রাজপুত্র আর রাজকন্যার কাছে। রাজপুত্র আর রাজকন্যা অবাক হয়ে দেখে কি, কাঠের খাঁচায় সেই বিশ্রী পাখিটা হয়ে গেছে সোনার এক পাখি।

এখানে আমি চুপি চুপি বলে রাখি, সোনালী পাখি কিংবা রুপোর ঘোড়াটা কিন্তু খরগোশকে দেখে একবারও বিশ্রী ভাবে ডেকে ওঠে নি ; চেঁচিয়ে ওঠেনি, সবাইকে জাগিয়ে তুলে!

বোকা রাজপুত্র ও সোনালী-চুল-রাজকন্যা নিজ রাজ্যে ফিরে এলো। আর সোনালী পাখিটা তুলে দিলো অন্ধ বাবার হাতে। পাখিটা হাতে নিতেই অন্ধ রাজার দৃষ্টি আবার ফিরে এলো। বুড়ো রাজা তখন বোকা রাজপুত্র আর সোনালী-চুল-রাজকন্যাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। আর রাজ্যের ভার তুলে দিলেন তাদের হাতে।

রাজপুত্র আর রাজকন্যা সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলো।

১৩

তিন ভাই। ··

বড়ো দ্'ভাই ছিলো খ্ব চালাক-চতুর। কিন্তু ছোট ভাইটা ছিলো নেহাৎ বোকা-হ'াদা।

একদিন তিন ভাই গেলো পাহাড়ে কাঠ ক্ড়োতে। স্য্যিমামা যখন মাথার ওপর এসে পড়লেন, তিন ভাই তখন খেতে বসে দেখে কি, একঘটি জল হ'াদারামটা কখন মিশিয়ে রেখেছে জই-এর মণ্ডের সাথে। এই ঘোর বনে এখন আগ্ন কোথায় পাওয়া যায়? তিন ভাই মহাভাবনায় পড়লো।

এমন সময় হঠাৎ ওরা কিছ্ দ্রে দেখতে পেলো একটা বাড়ি। সে বাড়িতে থাকে বনের ব্ড়ো মৌ-রক্ষী।

'দাঁড়া' আমি আসছি'—এই বলে বড়ো ভাই ছ্টলো মৌ-রক্ষীর বাড়ির দিকে। ব্ড়োর কাছে গিয়ে সে বললো :

'আমায় একটু আগ্ন দাওনা, ঠাক্রদা ভাই।'

ব্ড়ো জবাব দিলো : 'তা দেবো। কিন্তু আগে একটা গান গেয়ে শোনাও তো দেখি।'

'গান তো আমি জানি না, ঠাক্রদা।'

'তবে একটু নাচো?'

'নাচতেও যে আমি ভালো পারি না।'

'ওঃ', তাও ব্ঝি পার না? তাহলে তো আগ্ন পাবে না'—এই বলে ব্ড়ো তার পাছা থেকে ঘ্যাচ করে কেটে নিলো এক তাল মাংস। আর ভাগিয়ে দিলো ওকে।

ম্খ চ্ন করে বড়ো ভাই শ্ধ্হাতে ফিরে এলো।

তাকে ফিরে আসতে দেখে তখন গজ্গজ্ করতে লাগলো মেজভাই।

'হ্ঁ! কোনো কাজের না বড়দা।' এই বলে সে নিজেই ছ্টলো আগ্ন আনতে।

বুড়োর বাড়ির কাছাকাছি এসে সে বলে উঠলো :

'ঠাকুরদা ভাই, ঠাকুরদা ভাই, একটুখানি আগুন দেবে ভাই ?'

বুড়ো জবাব দিলো :

'দেবো ভাই দেবো। তবে একটা গান গেয়ে আগে শোনাও তো দেখি।'

'তা ভাই, গান তো আমি জানি না।'

'তা হলে একটা কিস্‌সা শোনাও।'

মেজভাই জবাব দিলো : 'তাও তো জানি না ঠাকুরদা।'

বুড়ো তখন তাকে দিলে ভাগিয়ে আর ঘ্যাঁচ করে তার পাছা থেকে খানিকটা মাংস রাখলো কেটে।

চালাক-চতুর দু'ভাই তখন ফিরে এসে একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

বোকা ভাইটা এতক্ষণ বসে বসে দাদাদের কাণ্ড-কারখানা দেখছিলো। সে এবার বললো :

'হুঁ, তোমরা হলে সব চালাক-চতুর মানুষ, তবু কেউ পারলে না আগুন আনতে। এবার তাহলে আমিই দেখি আনতে পারি কিনা আগুন।'

এ বলে সে চললো মৌ-রক্ষীর বাড়ির দিকে। বুড়োর কাছে গিয়ে বললো :

'ঠাকুরদা ভাই, ঠাকুরদা ভাই, আগুন আছে নাকি ভাই তোমার কাছে ?'

বুড়ো তখন জবাব দিলো :

'আছে ভাই, আছে।'

'তা হলে একটু দাও না, ভাই।'

'দিচ্ছি, কিন্তু আগে একটু নাচো তো দেখি।'

'কি করে নাচতে হয় তা তো আমি জানিনা, ঠাকুরদা।'

'তাহলে একটা কিস্‌সা শোনাও।'

'বেশ ঠাকুরদা কিস্‌সা আমি বলছি তোমায়।'

খড়ের চাটাইটার ওপর ধপাস করে বসে জবাব দিলো হাঁদারাম।

'তবে কিনা একটা কথা। আমার মুখোমুখী হয়েই তোমায় বসতে

হবে, আর চুপটি করে শুনে যেতে হবে সব কথা—কোনো বাধা দিলেই আমি তোমার পাছা থেকে তিন তিন তাল মাংস কেটে নেবো। এই বলে রাখলাম ঠাকুরদা।'

জিপসী বুড়ো তাতেই রাজী। হাঁদারামের মুখোমুখী পা ছড়িয়ে সে বসে পড়লো। তার মাথার মস্ত বড়ো টাকটা চকচক করতে লাগলো রোদে। আর গলা খাঁকারি দিয়ে হাঁদারাম শুরু করে দিলো তার গল্প :

'কই, শুনছো তো ঠাকুরদা, শুনছো ?'

'হ্যাঁ ভাই শুনছি।' বুড়ো জিপসী উত্তর দিলো।

'জানো ঠাকুরদা, আমার একটা রঙ-বেরঙের কাঠের ঘোড়া ছিলো। ওটায় চড়ে আমি রোজ পাহাড়ে যেতাম কাঠ কাটতে। একদিন হয়েছে কি, কুড়ালটা কোমরবন্ধে আচ্ছা করে এঁটে আমি চেপেছিলাম ঘোড়ার পিঠে। পাকা রাস্তা পেয়ে ঘোড়াটা তখন ছুটে চললো গ্যাটগ্যাট করে দুলকি চালে। এদিকে ভাই হয়েছে কি, ঘোড়ার দুলকি চালে ছোটার সঙ্গে সঙ্গে ঠকঠক করে খালি ঘা খেতে লাগলো আমার কুড়ালটা তার পিঠে। এমনি করে ঘা খেয়ে খেয়ে ঘোড়ার পাছাটা হঠাৎ খসে পড়লো এক সময়। —কই, শুনছো তো ঠাকুরদা ?'

এই বলে হাঁদারাম বুড়োর টাকে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক চাঁটি বসিয়ে দিলো।

'শুনছি দাদু, শুনছি ভাই !' টাকের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে জবাব দিলো মৌ-রক্ষী বুড়ো।

'হুঁ, তারপর হোল কি—' হাঁদারাম বলে চললো : 'বছর তিনেক ধরে ওই কাঠের ঘোড়াটার সামনের দিকটায় আমি চড়ে বেড়ালাম। এমন সময় দেখলাম ঘোড়াটার পিছনের অংশটা পড়ে আছে এক মাঠে। আর ঘাসের কচি কচি ডগাগুলি সে তুলে খাচ্ছে মাঠ থেকে। তাই দেখে আমি তো ওটাকে নিয়ে এলাম। তারপর তাকে সেলাই করে জুড়ে দিলাম সামনের ভাঙা অংশটার সাথে। এইভাবে আরো বছর তিনেক কেটে গেলো। ঘোড়াটার পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ালাম আমি। —কই, শুনছো তো ঠাকুরদা ?'

এই বলে হাঁদারাম মৌ-রক্ষী বুড়োর টাকে আবার একটা চড় কষালো তার দস্তানাপরা হাত দিয়ে।

'হ্যাঁ রে দাদু, শুনছি ভাই শুনছি।'

টাকের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে জবাব দিলো মৌ-রক্ষী বুড়ো।

'তারপর বুঝলে ঠাকুরদা,'—হাঁদারাম আবার শুরু করলো : 'চলছি তো চলছি। পথের যেন আর শেষ নেই। এক দিন এক গভীর বনে এসে ঘোড়াটা আমার থামলো। ওই বনেতে ছিলো প্রকাণ্ড এক তালগাছ। মাথাটা তার গিয়ে ঠেকেছে একেবারে আসমানে। তরতর করে সেই গাছ বেয়ে আমি উঠে গেলাম এক্কেবারে স্বগ্গে। স্বগ্গে গিয়ে দেখি কি, গরু, ছাগল আর ভেড়াগুলো বেজায় সস্তা সেখানে। আক্রা হোল খালি মাছি আর মশা। ওখানে তাদের পাত্তা নেই বললেই চলে একরকম। তাই আমি করলাম কি, মর্ত্যে আবার নেমে এলাম। মশা আর মাছিতে দুটো থলে নিলাম ভর্তি করে। তা পিঠে ঝুলিয়ে আমি আবার রওনা হলাম স্বগ্গের দিকে। স্বগ্গে পৌঁছে থলে থেকে ওই মাছি আর মশাগুলো লেলিয়ে দিতে লাগলাম ঘোর পাপীদের গায়ে। এক একটা মাছি আর মশার বদলে আমি তখন ওদের কাছ থেকে নিতে লাগলাম এক একটা করে গাই গরু আর বকনা বাছুর। অল্পক্ষণের মধ্যে আমি এতো গরু বাছুর পেয়ে গেলাম যে, বলবো কি ঠাকুরদা, আমি গুণেই শেষ করে উঠতে পারলাম না। গরু বাছুরগুলোকে নিয়ে আমি তখন রওনা দিলাম। উপস্থিত হলাম যেখান থেকে আমায় গাছ বেয়ে মর্ত্যে নামতে হবে সেখানে। কিন্তু ওখানে এসে তো আমার চক্ষুস্থির! কি সর্বনাশ! এখন আমি নামি কি করে? কে বা কারা যে ওই তালগাছটাকে কেটে ফেলেছে বেমালুম!'

'আমি তো ভীষণ দমে গেলাম। বসে বসে খালি ফন্দী আঁটতে লাগলাম, স্বগ্গো থেকে এখন নেমে পড়ি কি করে?' সে আবার বললে, 'শেষে এক বুদ্ধি এলো মাথায়। আচ্ছা, স্বগ্গো থেকে একগাছা দড়ি ঝুলিয়ে দিলে কেমন হয়? তরতর করে দিব্যি ওখন ঐ দড়ি বেয়ে নেমে পড়তে পারবো পৃথিবীতে! তাই আমি করলাম কি, ভেড়া আর ছাগল সবকটাকে করলাম জবাই। আর তাদের চামড়া দিয়ে তৈরি করে নিলাম লম্বা একগাছা দড়ি। ওই দড়ি বেয়েই আমি তখন নামতে লাগলাম স্বগ্গ থেকে। কিন্তু নামছি তো নামছি—নামছি তো নামছি, ঠাকুরদা, নামার যেন আর অন্ত নেই। এখান থেকে তোমার কুঠি পর্যন্ত

যতখানি পথ যখন আর বাকী, তখন কি সর্বনাশ, আমার সেই দড়িগাছাটা গেল হঠাৎ ফুরিয়ে। অতখানি পথ লাফই বা দিই কি করে বলো? আমার তখন ভয়ানক ভয় করতে লাগলো।—কই, তুমি শুনছো তো ঠাকুরদা?'

এই বলে হাঁদারাম জিপসী মো-রক্ষী বুড়োর টাকের ওপর আবার বিরাশী সিক্কা ওজনের এক চড় কশালো।

'শুনছি রে ভাই শুনছি!' টাকে হাত বুলোতে বুলোতে জবাব দিলো জিপসী মো-রক্ষী বুড়ো।

আবার শুরু করলো সে:

'ভাগ্যিস, এমন সময় দেখলাম এক কিষাণ উঠোনে খোসা ছাড়াচ্ছে তার মাড়ানো ধানের। ধানের উড়ন্ত খোসাগুলো আমি সব জড়ো করতে লাগলাম এক জায়গায়, আর তাই দিয়ে পাকিয়ে নিলাম একগাছা দড়ি। এমন সময় হঠাৎ উঠলো এক প্রচণ্ড ঝড়। ঝড়ের এক এক ঝাপটায় দুলতে লাগলাম আমি এদিক থেকে ওদিক—একবার এদিকে, একবার ওদিকে। ঝড়ের মুখে একবার এদিক, একবার ওদিক দোল খাওয়া, সে ভারী মজার। কিন্তু শেষে হোল কি, ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপটায় খোসার দড়িটাই গেলো একসময় ছিঁড়ে। আমি তখন গিয়ে ছিটকে পড়লাম এক জলাভূমির মধ্যে কুপোকাৎ হয়ে। আকণ্ঠ আমার ডুবে গেলো জলে আর কাদায়। বুকে হেঁটে কোনোরকমে আমি বেরিয়ে আসতে চাইলাম জলাভূমি থেকে। কিন্তু পারলাম না কিছুতেই। কেটে গেলো এইভাবে অনেক দিন। অনেক বছর। এক বুনো হাঁস তো আমার মাথার ওপর বাসা বেঁধে ডিমই পেড়ে গেলো কখন। একদিন এক নেকড়ে এলো জলাভূমিতে বুনো হাঁসের ডিম খেতে। নেকড়েটা যখন আমার পাশে এসে দাঁড়ালো, তখন আমি করলাম কি, নেকড়ে বাঘের ল্যাজটাই দু'হাতে আঁকড়ে ধরলাম। আর প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম: 'হাউ···লু···লুলু!'

'চিৎকার শুনে নেকড়ে মশাই তো আমাকে শুদ্ধু নিয়ে দিলো বিরাট এক লম্ফ।—কই, শুনছো তো ঠাকুর দা?'

এই বলে হাঁদারাম জিপসী মো-রক্ষী বুড়োর টাকে আবার একটা চাঁটি বসিয়ে দিলো জোরসে।

'শুনেছি রে দাদুভাই, সবই শুনেছি।' টাকে হাত বুলোতে বুলোতে জবাব দিলো মৌ-রক্ষী বুড়ো।

হাঁদারাম দেখলো, এতক্ষণ ধরে বকেও সে মৌ-রক্ষী বুড়োকে রাগে পেল না একবারটিও। গল্প তার এখন শেষ হয়ে এসেছে। কাঁহাতক আর বানিয়ে বানিয়ে বলা যায়, বুড়ো কিন্তু তার সব কথা মেনে নিয়েছে—একবারটিও প্রতিবাদ করেনি মুখ ফুটে তার আজগুবি সব কথার। বুড়োকে চটাবার উদ্দেশ্যে তাই হাঁদারাম শুরু করলো নতুন আর একটা কিস্সা। বললো :

'তারপর কি হলো জানো? একদিন আমার ঠাকুরদা পিঠে চেপে যাচ্ছিলেন তোমার ঠাকুরদার।'

'উহুঁ, হোল না। একদিন আমার ঠাকুরদাই বরং যাচ্ছিলেন তোমার ঠাকুরদার পিঠে চেপে।' জিপসী মৌ-রক্ষী বুড়ো ভুলে হঠাৎ এবার বাধা দিয়ে উঠলো ফস করে।—'আমার ঠাকুরদাই বরং যাচ্ছিলেন—।'

মৌ-রক্ষী বুড়ো আর যায় কোথায়? হাঁদারামের খুশি আর ধরে না তখন। এই তো চেয়েছিল সে। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মেরে মৌ-রক্ষী বুড়োকে সে ফেলে দিলো। ঘ্যাঁচ করে তারপর কেটে নিলো তিন তাল মাংস তার পাছা থেকে। তারপর আগুন নিয়ে ফিরে এলো দাদাদের কাছে। ইঁটের এক উনুন তৈরি করে ওরা তখন গরম করে নিলো জই-এর সেই মণ্ডটা।

রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হলে আমার গল্প আবার শুরু হবে। এখন শুধু একটুখানি ছুটি।

১৪

এক ছিলো রাজা।

সেই রাজার মনে সুখ নেই। শান্তিও না। কেননা রাজার পরে রাজা হবার মতো কেউ নেই তাঁর। মন্ত্রীদের কথামত রাজা তাই আবার বিয়ে করলেন। কিন্তু দশ দশটি বছর পার হয়ে গেল, নতুন রানীমারও সন্তান-সন্ততি কিছু হোল না। এমনি করে গেল অনেক দিন।

একদিন ঈশ্বর রাজার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। রানীমার কোল আলো করে এক ছেলে এলো। কিন্তু রানীমা প্রাণে বাঁচলেন না। ছেলে কোলে নিয়েই চোখ বুঁজলেন চিরদিনের মতো। তবে রাজপুত্র দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠলো। লেখাপড়া, ধনুর্বিদ্যায় রাজপুত্রের কেউ জুড়ি নেই। শক্তি-সামর্থ্যেও কেউ নেই তার সমকক্ষ।

এদিকে চোখের মণি রাজপুত্রকে রেখে ঐ বৃদ্ধ রাজাও ছোট রানীমার মতো একদিন চিরবিদায় নিলেন। রাজার মৃত্যুর পর রাজপুত্র সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু রাজসিংহাসনে চুপচাপ বসে রাজ্যের কাজ দেখাশুনো করা রাজপুত্রের ভালো লাগলো না। রাজপুত্র তাই একদিন রাজবাড়ির মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লো ডানপিটে দুঃসাহসিক কাজের উদ্দেশে।

ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে প্রথমেই পড়লো বিরাট এক বন। এই বনের মধ্যিখানে ছিল একটি বাড়ি। রাজপুত্র এসে তার সামনে থামলো। ঘরে ঢুকে রাজপুত্র লোকজন কাউকে দেখতে পেলো না। শুধু দেখলো দেয়ালে ঝুলানো রয়েছে একখানি প্রকাণ্ড খাঁড়া। রাজপুত্র খাঁড়াখানি দেয়াল থেকে তুলে নিলো। আর দাঁড়িয়ে রইলো দরজা আগলে। একটু পরেই জোরে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ভীষণ আকারের বারোটি ড্রাগন। ড্রাগন তো নয়, যেন জ্বলন্ত আগুনের হল্কা! ড্রাগনগুলি রাজপুত্রকে দেখেই ছুটে এলো তাকে গিলে খাবার জন্যে।

রাজপুত্র কিন্তু ভড়কে গেলো না। ভয় পেলো না একটুও। ড্রাগনগুলোও ঘর থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে এসে তাকে আক্রমণ করলো না। এক একটি করে ড্রাগন তাকে গিলতে এলো। আর রাজপুত্রও ধারালো

খাঁড়াখানি দিয়ে ওদের একে একে কাটতে লাগলো ঘর থেকে বেরুবার সময়। এমনি করে এগারোটি ড্রাগনের হলো মৃত্যু। রাজপুত্র শুধু বধ করলো না সব চাইতে ছোট ড্রাগনটিকে। রাজপুত্র তাকে ঘর থেকে বেরুতে দিলো। ঘর থেকে বেরিয়েই কিন্তু সেই ড্রাগনটি রুখে দাঁড়ালো। রাজপুত্রও প্রস্তুতই ছিল। দু' জনের মধ্যে আরম্ভ হোল জোর লড়াই কেউ কারুর চেয়ে কম নয়। লড়াই চলতে চলতে সূর্য মাথার ওপর এসে পড়লো। তবু কিন্তু দু' জনের লড়াই-এর শেষ নেই। অবশেষে ড্রাগন কাবু হয়ে পড়লো। আর এই সুযোগে রাজপুত্র একটা জালার মধ্যে তাকে পুরে মুখটা বেঁধে দিলো কষে।

রাজপুত্র তারপর পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। দেখলো প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে এক পালঙ্কে শুয়ে আছে ভিনদেশী এক রাজকন্যা। রাজকন্যার কাছে যেতেই ধড়ফড় করে সে উঠে বসলো। রাজপুত্রকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, কি করে সে এলো সেখানে।

রাজপুত্র তখন রাজকন্যাকে যা যা ঘটেছে সব বললো। রাজপুত্র আর রাজকন্যার মধ্যে খুব ভাব হলো। তবে রাজকন্যা যেই শুনলো রাজপুত্র সব ড্রাগনকে মেরে ফেলে একটা ড্রাগনকে ছেড়ে দিয়েছে, অমনি মনটা তার খারাপ হয়ে গেলো। সে বললো :

'কাজটা কিন্তু তুমি ভালো করোনি, রাজপুত্র! ওটাকে মেরে ফেললেই পারতে। দেখবে ওটা তোমাকে খুব বিপদে ফেলবে।'

রাজপুত্র কিন্তু তাতে কান দিলো না। বললো : 'ওই ড্রাগনটা আমার আবার কি ক্ষতি করবে? সে যাক, আমি এখন আমার সৎমাকে নিয়ে আসছি এখানে।'

রাজকন্যা খুশি হয়ে বললো : 'বেশ তো। নিয়ে এসো তোমার মাকে।'

রাজপুত্র তখন বেরিয়ে পড়লো তার সৎমাকে আনবার জন্যে। অনেকদিন পর সতীন-ছেলেকে দেখে রানীমা খুশিই হলেন। তারপর ছেলের সঙ্গে নতুন রাজবাড়িতে এসে উঠলেন।

রাজপুত্র রানীমাকে নিয়ে বন্ধ একটা ঘরের সামনে এসে বললো : 'তুমি আর সব ঘরে যাবে, কিন্তু এই ঘরে ভুলেও কখনো যেও না।'

'হ্যাঁ বাবা, তুমি যখন বারণ করছো, আমি আর কখনো ও ঘরে যাবো না।'

পরদিন রাজপুত্র যথাসময়ে শিকারে বেরিয়ে পড়লো। রানীমা কিন্তু চুপি চুপি বন্ধ ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর জানবার খুব ইচ্ছে হোল, ছেলে তাঁকে এ ঘরে ঢুকতে বারণ করেছে কেন? বন্ধ ঘরের শিকলটা খুলতেই ড্রাগনটা অমনি ফোঁস করে উঠলো। তবে রানীমাকে দেখে মাথাটা তার নুয়ে এলো। বললো: 'রানীমা, আমি আপনার কোনো ক্ষতি করবো না। আপনি আমায় একটু জল দিন।'

রানীমা ছুটে গিয়ে ড্রাগনের জন্যে জল নিয়ে এলেন। জল পান করে ড্রাগন বলে উঠলো: 'রানীমা, আমায় মারবেন না। আমি আপনার কোনো ক্ষতি করবো না। আজ থেকে আপনিও আমার রানীমা হলেন।'

'হ্যাঁ বাছা, আমি তোমার কোনো অনিষ্ট করবো না।' রানীমা বললেন।

ড্রাগন তখন রানীমাকে বললে: 'রাজবাড়িতে আপনি কতো সুখেই না ছিলেন। এই দেখুন, সৎমা কিনা, তাই রাজপুত্র আপনাকে এক ড্রাগনপুরীতে নিয়ে এসেছে। আপনি যদি আপনার সতীন-ছেলের হাত থেকে বাঁচতে চান তবে আমি যা বলি তাই করুন।'

ড্রাগন আবার বললো, আপনি অসুখের ভান করে থাকুন। আর রাজপুত্রকে বলুন, আপনি একটা স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নটা হলো, পাতালপুরীতে যে শুকরটি আছে তার ছানাটার মাংস যদি খান, তবে আপনার রোগ সারবে। তা'নইলে আপনি বাঁচবেন না। তাই রাজপুত্রকে আপনি বলবেন সে যেন শুকর ছানাটিকে মেরে তার খানিকটা মাংস আপনার জন্যে নিয়ে আসে।'

রানীমা তাই করলেন। নিজের ঘরে গিয়ে শয্যা নিলেন। মাথায় একটা গামছা বাঁধলেন শক্ত করে। তারপর উঃ, আঃ করে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলেন। তাই শুনে রাজপুত্র ছুটে এলো। সৎমাকে কাতরাতে দেখে সেও হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। আর বলতে লাগলো তার মা আর বাঁচবে না।

রানীমা তখন বললেন: 'আমার ভয়ানক অসুখ করেছে, বাছা! তবে স্বপ্ন দেখেছি, যদি আমি পাতালপুরীর সেই শুকর ছানার মাংস খেতে পারি তবে আবার সুস্থ হয়ে উঠবো।'

তাই শুনে রাজপুত্র আরও বেশি করে কাঁদতে শুরু করলো। কেন না পাতালপুরী থেকে শুকরের মাংস আনা যে-সে কাজ নয়। রীতিমতো অসাধ্য কাজ। সৎমাকে আর বোধ হয় বাঁচাতে পারবে না সে। কাঁদতে কাঁদতে সে তাই রাজকন্যার কাছে গিয়ে সব কথা বললো।

রাজপুত্রের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে রাজকন্যা বললো : 'তুমি কেঁদো না। আস্তাবলে গিয়ে তুমি আমার ডানাওয়ালা ঘোড়াটিতে চেপে বসো আর, তার পিঠে চেপে তুমি পাতালপুরীতে চলে যাও। পাতালপুরীর শুকরটি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নইলে তোমাকে সে খেয়ে ফেলবে।'

রাজপুত্র তাই করলো। রাজকন্যাব ডানাওয়ালা ঘোড়াটি বেছে নিলো আস্তাবলে গিয়ে। তারপর রওনা হলো পাতালপুরীর দিকে। সূর্য যখন আকাশের মধ্যিখানে এসে পড়েছে তখন সে গিয়ে পাতালপুরীর শুকরটির একটি ছানা তুলে নিলো। শুকর ছানাটি নিয়ে সে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা হলো বাড়ির দিকে।

এদিকে হয়েছে কি, শুকর ছানাটিকে তুলে নিতেই ছানাটি ডাকতে শুরু করলো। আর তাই শুনে ছুটে এলো তার মা। এসেই রাজপুত্র ও তার ঘোড়াটিকে সে তখন গিলতে গেল ড্রাগনের রূপ ধরে। কিন্তু তার আগেই রাজপুত্রের ডানাওয়ালা পক্ষিরাজ ঘোড়া উড়তে আরম্ভ করেছে। রাজপুত্র ঘোড়ার পিঠে চেপে যেই পাতালপুরী থেকে বেরিয়ে আসবে অমনি শুকরীটি ঘোড়ার ল্যাজের খানিকটা কামড়ে নিল।

রাজপুত্র বাড়ি ফিরে শুকরের বাচ্চাটি রাজকন্যাকে দিলো। রাজকন্যা তখন করলো কি, শুকরছানাকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখে অন্য একটা শুকরছানা রাজপুত্রের হাতে তুলে দিয়ে বললো : 'নাও, এটা তোমার মাকে দাও গিয়ে।'

রাজপুত্র তাই করলো। আর কচি শুকরছানার মাংস খেয়ে রানীমা বুঝি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

কয়েকদিন কেটে গেলো। রানীমা মাথায় পট্টি বেঁধে যন্ত্রণায় আবার কাতরাতে লাগলেন। সৎমায়ের কাতরানি শুনে আবার রাজপুত্র মায়ের কাছে ছুটে এলো।

ছেলেকে দেখেই রানীমা জোরে কান্না জুড়ে দিলেন। বললেন,

'আমার অসুখ আবার বেড়ে গেছে। আমি আর বাঁচবো না বাছা।'

রানীমা একটু থেমে আবার বললেন, 'তবে বাঁচতে পারি, তুমি যদি অচিনপুরে গিয়ে সেখানকার আপেল গাছ থেকে একটি সোনার আপেল নিয়ে আসতে পার।'

তাই শুনে রাজপুত্র রাজকন্যার কাছে গিয়ে সব বললো। রাজকন্যা বললো, 'তুমি মন খারাপ কোরো না। আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।'

রানীমার মতলবের কথা রাজকন্যার বুঝতে কিন্তু দেরি হোল না। পাতালপুরী থেকে শুকরছানা আনা, কিংবা অচিনপুরের আপেল নিয়ে আসার পিছনে যে রাজপুত্রকে মেরে ফেলার মতলব রয়েছে তা রাজকন্যা জানতে পারলো। বুঝতে পারলো, রাক্ষসী মা-ই সতীন ছেলের মাথা খেতে চাইছে। রাজকন্যা তখন রাজপুত্রকে ডেকে বললো:

'তুমি যাও। আস্তাবলে গিয়ে আমার পক্ষিরাজ ঘোড়াটি নিয়ে অচিনপুরের সোনার আপেল আনতে বেরিয়ে পড়ো। তাহলে তোমার কোনো আপদ-বিপদ ঘটবে না।'

পক্ষিরাজ ঘোড়ায় করে যেতে যেতে রাজপুত্র এক সময় এসে থামলো অচিনপুরের সীমান্তে। সীমান্তরেখা পেরিয়ে অচিনপুরে ঢুকতেই রাজপুত্র দেখতে পেলো এক সোনালী গাছে অনেকগুলি সোনালী আপেল ফল ঝুলছে। সূর্য তখন মাথার ওপর এসে পড়েছিলো। সূর্যের ঝাঁঝালো রোদে গাছপালা সব ঝিমোচ্ছিলো। সেই ফাঁকতালে রাজপুত্র গাছ থেকে একটি সোনালী আপেল ছিঁড়ে নিয়ে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় আবার চেপে বসলো। ঘোড়া ছোটাবার আগেই কিন্তু বাগানের গাছপালা সব ছুটে এলো তাকে পাকড়াও করার জন্যে। কিন্তু এলে কি হবে? রাজপুত্রের পক্ষিরাজ ঘোড়ার নাগাল পেলো না কেউ। আপেল ফলটি নিয়ে রাজপুত্র এসে রাজকন্যার হাতে তুলে দিলো। রাজকন্যা সেই সোনালী আপেলটি তুলে রেখে অন্য একটি সোনালী আপেল রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বললো:

'যাও, রানীমাকে দিয়ে এসো।'

রানীমা রাজপুত্রকে দেখে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ বাছা, ফলটি আনতে পেরেছো?'

'হ্যাঁ, মা! এই নাও তোমার ফল।'

রানীমা তখন ফলটি কামড়ে খেয়ে নিলেন। কিন্তু তাতেও রানীমার

অসুখ সারলো না। ড্রাগনের কথামত রানীমা আবার অসুখের ভাণ করলেন। সপ্তাহ খানেক যেতেই রানীমা আবার অসুখে পড়লেন। মাথায় পট্টি বেঁধে কাতরাতে কাতরাতে রাজপুত্রকে ডেকে বললেন: 'বাছা, এবার আমি আর বাঁচবো না রে!'

মা তার আর বাঁচবেন না শুনে রাজপুত্র কাঁদতে শুরু করলো। রানীমা তাকে বললেন:

'শোনো বাছা, আমি সেরে উঠতে পারি যদি তুমি পাহাড়ের চূড়া থেকে আমার জন্যে খানিকটা ঝরনার জল নিয়ে আসতে পারো। সেই জল পান করলে আমি সেরে উঠবো।'

সৎমা আর বাঁচবে না শুনে রাজপুত্র এবারও কাঁদতে শুরু করলো। কাঁদতে কাঁদতে রাজকন্যার কাছে গিয়ে সব জানালো। রাজকন্যা সব শুনে বললো, 'তুমি কেঁদো না। আস্তাবলে গিয়ে আমার ডানাওয়ালা পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের চূড়ায় ঝরনার জল আনতে চলে যাও। সংগে একটি জলের পাত্র নিয়ো। সূর্য যখন আকাশের মধ্যিখানে আসবে, তখনই তুমি পাহাড়ের চূড়ায় যেও। আর তাড়াতাড়ি জল নিয়ে পালিয়ে এসো। নইলে মেঘ তোমাকে ঘিরে ফেলবে, প্রাণ নিয়ে আর ফিরতে পারবে না।

রাজপুত্র তাই-ই করলো। জল আনবার একটি পাত্র নিয়ে সে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে উঁচু পাহাড়ে রওনা দিলো। আর সূর্যমামা যখন আকাশের মধ্যিখানে এলো তখন সে ঘোড়া থেকে নেমে পাহাড়ী ঝরনা থেকে জল নিয়ে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় আবার চেপে বসলো। আকাশের মেঘগুলি তাকে দেখতে পেয়ে অমনি ছুটে এলো কালো কালো যমদূতের মতো। কিন্তু রাজপুত্র তার আগেই পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে এলো।

পাত্র সুদ্ধু জল এনে রাজপুত্র দিলো রাজকন্যার হাতে। রাজকন্যা তখন করলো কি, পাহাড়ী ঝরনার জলটা পাত্রসুদ্ধু সরিয়ে রেখে তার জায়গায় সাধারণ জল ভর্তি আর একটি পাত্র নিয়ে এলো। আর তাই রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বললো, 'যাও, তোমার মাকে এই পাহাড়ী ঝরনার জল দিয়ে এসো।'

রাজপুত্র তাই করলো। রানীমার হাতে জলসুদ্ধ সেই পাত্রটা এনে দিলো। আর সেই পাহাড়ী ঝরনার জল খেয়ে রানীমা সেরে উঠলেন।

এদিকে হয়েছে কি, একদিন রাজপুত্র শিকারে বের হলে রানীমা ড্রাগনের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললেন :

'এখন কি করি বলতো। তোমার কথামত পাহাড়ী ঝরনার জল খেলাম তবুও তো কিছুতেই কিছু হলো না। সতীনের ছেলেটাকে নিয়ে এখন কি করি ?'

'এক কাজ করুন, রাজপুত্রের সঙ্গে বাজী রেখে আপনি তাস খেলতে বসুন। ছেলে যদি আপত্তি করে, বলবেন, 'কেন ? আমি তো রাজার সঙ্গে বাজী রেখে তাস খেলতাম।'

রানীমা তাই করলেন। রাজপুত্র শিকার থেকে ফিরে এলে রানীমা তাকে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, তোমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন আমরা দু'জনে বসে তাস খেলতাম বাজী রেখে। তাতে মনটা খুব তাজা থাকতো। ভালো ছিলাম, এখন আর কার সঙ্গে তাস খেলবো বলো ?' রানীমা গলা ছেড়ে কাঁদিতে শুরু করলেন।—'তুমি কোথায় গেলে গো ?'

রাজপুত্র তখন বললো, 'তুমি যদি বলো, আমি না হয় তোমার সঙ্গে তাস খেলবো, মা !'

রানীমা আর রাজপুত্র তখন দু'জনে তাস খেলতে বসলো বাজী রেখে। খেলায় রানীমারই জিত হলো। রাজপুত্র হেরে গেলো। রানীমা তখন সিল্কের দড়ি দিয়ে রাজপুত্রের হাতদুটি এমন জোরে বেঁধে দিলেন যে দড়িটা রাজপুত্রের হাত কেটে বসে গেলো মাংসের মধ্যে। রাজপুত্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো। বললো, 'মা. আমার বাঁধনটা খুলে দাও। নইলে আমি মরে যাবো !'

'হ্যাঁ. আমিও তাই চাই।'

এই বলে রানীমা ড্রাগনের ঘরে গিয়ে ড্রাগনকে বললেন, 'রাজপুত্রকে আমি বেঁধে রেখেছি। তুমি গিয়ে তাকে মেরে ফেল।'

ড্রাগন তাই করলো। সে এসে রাজপুত্রকে টুকরো টুকরো করে কেটে মাংসের টুকরোগুলো একটা ব্যাগে ভর্তি করে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিয়ে বললো, 'যা একে তুই যেখান থেকে জ্যান্ত নিয়ে এসেছিস, নিয়ে যা সেখানে।'

ঘোড়াটি তখন ব্যাগ ভর্তি রাজপুত্রের টুকরো টুকরো মাংসগুলি নিয়ে রাজকন্যার কাছে গেলো। রাজপুত্রের টুকরো টুকরো মাংস দেখে রাজকন্যা

কান্নাকাটি করতে লাগলো। তারপর কান্না থামিয়ে রাজপুত্রের কাটা মাংসগুলি পরপর সাজিয়ে নিলো। যেখানে দেখলো মাংসের টুকরো বাদ পড়েছে সেখানটায় পাতালপুরীর সেই শুকর ছানার মাংস দিয়ে সে অভাব পূরণ করলো। তারপর রাজকন্যা করলো কি, উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে আনা সেই ঝরনার জল রাজপুত্রের সর্বাঙ্গে ঢেলে দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রের কাটা মাংসগুলি জোড়া লেগে গেলো। রাজপুত্রের দিব্যি আগেকার চেহারা ফিরে এলো। কিন্তু ধড়ে তার তখনও প্রাণ আসে নি। তাই রাজকন্যা তখন অচিনপুর থেকে আনা সোনার আপেলটি কেটে তার মুখে পুরে দিতে লাগলো। আর সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্র প্রাণ ফিরে পেলো।

রাজপুত্র প্রাণ ফিরে পেতেই সব কথা জানালো তাকে রাজকন্যা। রাজপুত্র তখন গিয়ে রানীমা ও ড্রাগন দু'জনকেই ধরে এনে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধলো। আর রাজ্যের সব খড়কুটো জড়ো করে সেই খুঁটিতে দিলো আগুন ধরিয়ে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। আর সেই আগুনে রাক্ষসী রানীমা আর ড্রাগন পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

রাজপুত্র আর রাজকন্যা তখন পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে পবন বেগে নিজদেশে ফিরে গেলো। আর মহা ধুম-ধাম করে রাজপুত্র আর রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেলো। একদিন নয়, দু'দিন নয়, পুরো তিন মাস ধরে রাজবাড়িতে বিয়ের ভোজ চললো দিবারাত্রি। সেই ভোজে আমারও ছিল নিমন্ত্রণ। আর সেই ভোজ সেরেই তো এই গল্প।

১৫

আয়ারল্যান্ডের উত্তরে এক ছিলো রাজ্য। সে রাজ্যের রাজা ও রানীর ছিলো এক রাজপুত্র। রাজপুত্রটি ছিলো বাবা ও মায়ের চোখের মণি। এদিকে দিন দিন রাজপুত্র বড় হয়ে উঠতে লাগলো।

এখন হয়েছে কি, সে রাজ্যের নিয়ম ছিল রাজপুত্র বড় হলে তাকে গহীন বনের ভয়ংকর কালো কুকুরের কাছে পাঠানো হোত। কিন্তু রাজা ও রানী তাঁদের একমাত্র পুত্রকে কিছুতেই চোখের আড়াল করতে চাইলেন না। তাই রাজপুত্রকে গহীন বনের সেই কালো কুকুরের কাছে পাঠাবার দিন ঘনিয়ে আসতেই রাজা তখন করলেন কি, রাজপুত্রকে নিয়ে গেলেন আস্তাবলে। আর দিলেন তাঁর সবচাইতে ভালো তেজী ঘোড়াটি। আর সংগে দিলেন একরাশ টাকাকড়ি, ধনরত্ন, মণিমুক্তা, জহরৎ। রাজপুত্রকে তেজী ঘোড়াটির উপর চাপিয়ে দিয়ে রাজা বললেন:

'যাও, যেদিকে খুশি তুমি চলে যাও।'

রাজপুত্র তখন তেজী ঘোড়া হাঁকিয়ে টগবগ করে চললো তো চললো। এই চলার যেন শেষ নেই। চলতে চলতে মাথার উপরকার সূর্য কখন যে পাটে বসল, রাজপুত্রের তা খেয়াল নেই। হঠাৎ এক সময় রাজপুত্র দেখতে পেলো বনের মাঝখানে ছোট্ট একটা আলো জ্বলছে মিটমিট করে। রাজপুত্র সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

এখন হয়েছে কি, সে-বনে বাস করত এক ডাইনী বুড়ী। ডাইনী বুড়ী রাজপুত্রকে দেখে বলে উঠলো:

'এসো গো এসো, আয়ারল্যান্ডের রাজকুমার, এসো। আমি জানি এখন তোমার মহা বিপদ। ভয়ংকর এক কালো কুকুর তোমার পিছু নিয়েছে।'

এই বলে ডাইনী বুড়ী চুল্লীর পাশে ছাইগাদার আড়ালে রাজপুত্রকে তার জঞ্জাল ফেলার ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখলো।

মিনিট কুড়ি পর গহীন বনের ভয়ংকর সেই কালো কুত্তাটি এসে হাজির হল ডাইনী বুড়ীর বাড়ি। কালো কুকুরটিকে দেখেই ডাইনী বুড়ী

অমনি তার ছোট্ট কুকুরটিকে লেলিয়ে দিল কালো কুকুরের দিকে। ডাইনী বুড়ীর কুকুরটি ছোট্ট হলে কি হবে। গায়ে জোরে কিন্তু ছোট নয়। সে কালো কুকুটাকে দিলো তাড়িয়ে। ডাইনী বুড়ী তখন রাজপুত্রের কাছে এসে বললো :

'ছাইগাদার আড়াল থেকে এবার বেরিয়ে এসো রাজকুমার। আমার কুকুর তোমার কালো কুত্তাকে দিয়েছে ভাগিয়ে। এখন আর কোনো ভয় নেই।'

ডাইনীর কথা শুনে রাজপুত্র উনানের পাশে গুপ্ত স্থান থেকে বেরিয়ে এলো। ডাইনী বুড়ী তখন রাজপুত্রকে গরম চা আর খাবার খেতে দিলো। রাজপুত্র তাই পেটভরে খেলো। আর ডাইনী বুড়ীর হাতে গুঁজে দিলো একরাশ টাকা।

ডাইনী বুড়ী তখন বললো : 'এখান থেকে তিনশ' মাইল দূরে বাস করে আমার এক বোন। তার কাছে গিয়ে তুমি যদি চা খেতে পার তা হলে সে তোমাকে বলে দেবে তোমার কি করা উচিত।'

ডাইনী বুড়ী তখন তার মুখের খানিকটা এঁটো রুটি দিয়ে একটা কুকুর বানিয়ে দিলো রাজপুত্রের হাতে। বললো : 'এই নাও এ কুকুরটাকে। এ আমার 'হিয়ারঅল' কুকুর। এ তোমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবে। তুমি এটাকে সঙ্গে সঙ্গে রেখো।'

রাজপুত্র তখন ডাইনী বুড়ীর দেওয়া কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় আবার চেপে বসলো। আর দিলো ঘোড়া ছুটিয়ে। খটাখট্, খটাখট্ শব্দ করে বন কাঁপিয়ে রাজপুত্রের ঘোড়া ছুটলো তো ছুটলো। এ ছোটার আর যেন শেষ নেই। একসময় ঘোড়ার গতি একটু কমে আসতেই রাজপুত্র পেছন ফিরে দেখলো, ভয়ংকর সেই কালো কুকুরটা আবার তার পিছু নিয়েছে।

তাই দেখে রাজপুত্র আরো জোরে ছুটিয়ে দিলো ঘোড়া আর একটু পরেই এসে পৌঁছুল ডাইনী বুড়ীর বোনের বাড়ি।

রাজপুত্রকে দেখে ডাইনী বুড়ীর বোন অমনি বলে উঠলো : 'এসো, এসো আয়ারল্যান্ডের রাজকুমার। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি মহাবিপদে পড়েছ।'

ডাইনী বুড়ীর বোনও তখন রাজপুত্রকে ছাইয়ের গাদার পেছনে

লুকিয়ে রাখলো। আর ডাইনী বুড়ীর বোনেরও ছিলো ছোট আর এক কুকুর। গহীন বনের কালো কুত্তাটাকে সেও হটিয়ে দিলো ভয়ানক লড়াই করে।

ডাইনী বুড়ীর বোন এবার বললো: 'শোন রাজার ছেলে, আমার যতখানি সাধ্য আমি করব তোমার জন্যে। আমার এই ছোট্ট কুকুর 'স্প্রিং অল'টি তুমি সঙ্গে নাও। আর এই লাঠিখানিও নাও সঙ্গে। এই লাঠি দিয়ে আমি যা-যা বলবো তা করতে ভুলো না যেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সামনের পথ ধরে তুমি সিধে চলে যাও। কিছুদূর গেলে দেখতে পাবে পথের সামনে প্রকাণ্ড একটা নদী, এ নদী তোমায় পার হতে হবে। গহীন বনের ভয়ংকর কালো কুকুরটিও তোমায় তখন ত্যাগ করবে। তুমি তখন করবে কি',—ডাইনী বুড়ীর বোন একটু থেমে আবার বললো:

"তুমি তখন করবে কি, ছোট এই কাঠিটা দিয়ে নদীর জলের উপর তিন তিন বার আঘাত করবে। আর দেখবে সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর একটা সেতু গজিয়ে উঠেছে নদীর ওপর। সেই সেতু দিয়ে তরতর করে তুমি নদী পার হয়ে যেও। নদীর ওপারে গিয়ে জলের ওপর আবার তিন তিন বার আঘাত করবে। বনের কালো কুকুর তখন তোমার আর নাগাল পাবে না, রাজার ছেলে।'

রাজপুত্র তাই করলো। নদী পার হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ছুটিয়ে সে আবার চলতে শুরু করলো। আর কিছুদূর যেতে-না-যেতেই দেখতে পেলো প্রকাণ্ড এক দুর্গ। দুর্গের মধ্যে রয়েছে এক রাজপ্রাসাদ। রাজপুত্র দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লো। একটু পরেই তার চোখে পড়লো, একটা লোক তীর-ধনুক নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছে। রাজপুত্র তাকে দেখে বললো:

'আমায় একটা কাজ দেবে?'

'তুমি কি কাজ করবে? তুমি তীর ছুঁড়তে পার?'

'পারি। কাছ থেকে কিংবা দূর থেকে যেখান থেকে বলবে আমি তীর ছুঁড়তে পারবো।'

রাজপুত্র তখন দুর্গের সেই লোকটির সঙ্গে বনে গিয়ে বিস্তর পাখি শিকার করে আনলো। এই লোকটির নাম হলো জ্যাক। এ দুর্গের রাজা। রাজপুত্রকে তিনি তাঁর রাজাপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন

রাজকুমারীর সংগে। রাজপুত্রের সংগে ভাব হয়ে গেলো রাজকন্যার। গল্প করতে করতে একদিন রাজপুত্র রাজকন্যাকে নিয়ে গেলো নদীর ধারে। আর কথায় কথায় বললো, কি করে সে গহীন বনের কুকুরের তাড়া খেয়ে নদীর এপার ওপার একটা সেতু বানিয়ে নিয়েছিলো আর এক মিনিটের মধ্যে তারপর নদী পার হয়ে সেই সেতুটাকে কি করে অদৃশ্য করে দিলো যাতে কুকুরটা পার হতে না পারে।

রাজকন্যা রাজপুত্রের কথা সব শুনলো আর অবাক হয়ে বললো : 'তাই নাকি? কিন্তু তুমি এ সব কাজ কি করে করলে?'

'কেন এই যাদু কাঠি দিয়ে।' এই বলে রাজপুত্র তার হাতের যাদু কাঠিটা দিয়ে জলের উপর তিন তিন বার আঘাত করলো আর সংগে সংগে নদীর এপার থেকে ওপারে যাবার এক সুন্দর সেতু গড়ে উঠলো। তারপর দুর্গেশনন্দিনীর সংগে গল্প করতে করতে রাজকুমার ফিরে এলো রাজপ্রাসাদে। সেতুটিকে অদৃশ্য কোরবার কথা গেলো একেবারে ভুলে।

এখন হয়েছে কি, পরদিন রাজকুমার যখন দুর্গের রাজার সংগে বনে শিকার করতে গেলো তখন গহীন বনের ভয়ংকর সেই কালো কুকুরটা তার পিছু নিলো। যাবার সময় কুকুরটা রাজকন্যাকে ডেকে বললো : 'কাল রাজপুত্র আবার শিকারে যাবে। রাজপুত্র যদি আমায় মেরে ফেলে তা হলে সে আমার মরা দেহটা ঘোড়ায় চাপিয়ে বাড়ি ফিরবে। তুমি তখন তার কাছে গিয়ে বলবে : 'মরা কুকুরটা নিয়ে তুমি কি করবে রাজপুত্র?'

'রাজপুত্র তখন বলবে, আমায় বাড়ি নিয়ে গিয়ে সে পোড়াবে। তুমি তখন করবে কি আমায় পুড়িয়ে চলে গেলে আমার পোড়া ছাই থেকে খানিকটা ছাই তুলে নিয়ো। ছাইয়ের মধ্যে ছোট একটা হাড় দেখতে পাবে। হাড়টি নিয়ে তুমি রাজপুত্র যখন ঘুমোতে যাবে তখন তার কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ো গোপনে। তাহলে রাজপুত্রকে আর জাগতে হবে না। মরে পড়ে থাকবে। তুমি তখন রাজপুত্রকে নিয়ে পুতে রেখো মাটির নিচে।'

এই বলে গহীন বনের কালো কুকুরটা রাজপুত্রের পিছু নিলো। কালো কুকুরটাকে দেখতে পেয়ে রাজপুত্র চিৎকার করে উঠলো : 'আরে আমার 'হিয়ারঅল' আর 'স্প্রিংঅল' বাচ্চু কুকুর দুটো গেলো কোথায়?'

রাজপুত্র চিৎকার করার সংগে সংগে তার মুখ দিয়ে আগুনের ফুলকি

বেরিয়ে এল ঝিলিক মেরে। আর দেখতে না দেখতে এসে হাজির হল 'হিয়ারঅল' আর 'স্প্রিংঅল'। ডাইনীবুড়ীর কুকুর দুটি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কুকুর দুটি এসে গহীন বনের কালো কুকুরের সঙ্গে লেগে গেল লড়াই করতে। রাজপুত্র এগিয়ে এসে কালো কুকুরটাকে তীর ছুড়ে মেরে ফেললো। তারপর মরা কুকুরটাকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরলো।

রাজবাড়িতে ঢুকতেই রাজা বলে উঠলেন : 'মরা কুকুরটাকে নিয়ে কি করবে রাজপুত্র ?'

'ওটাকে আমি পোড়াবো।'

গহীন বনের কালো কুকুরটাকে পুড়িয়ে ছাই করলো রাজপুত্র। এখন হয়েছে কি, রাজকন্যা গহীন বনের কালো কুকুরের ছাই থেকে একখানি হাড় কুড়িয়ে নিলো। আর সেই হাড় রাজপুত্রের কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। আর রাজপুত্র মরে গেল সঙ্গে সঙ্গে। রাজপুত্রকে তখন সবাই নিয়ে গিয়ে পুতে রাখল মাটির নিচে।

এদিকে 'রাজপুত্রকে' কোথাও দেখতে না পেয়ে তার সঙ্গী বাচ্চু কুকুরদুটি—'হিয়ারঅল' আর 'স্প্রিংঅল' 'মাটি শুঁকতে লাগলো। আর মাটি শুঁকতে শুঁকতে রাজপুত্রকে যেখানে কবর দিয়েছিল সেখানে এসে উপস্থিত হলো। আর আঁচড়ে-আঁচড়ে কবরের মাটি তুলে রাজপুত্রকে বার করলো কবর থেকে।

'হিয়ারঅল' একসময় দেখতে পেল রাজপুত্রের কানের মধ্যে ছোট্ট একটা হাড় গোঁজা রয়েছে। সে তখন ছুটে গিয়ে রাজপুত্রের কান থেকে হাড়টা কামড়ে বার করে নিলো। আর হাড়টা বার করতেই রাজপুত্র অমনি বেঁচে উঠলো।

জীবন ফিরে পেয়ে রাজপুত্র জিজ্ঞেস করলো :

'আমার এই দশা করলো কে ?'

'হিয়ারঅল' তখন বললো : 'করলো তোমার দুর্গের রাজকন্যা।'

রাজপুত্র তখন ঘোড়ায় চেপে দুর্গ ছেড়ে নিজের দেশে রওনা হোল।

'হিয়ারঅল' তখন বলে উঠলো : 'ঘোড়া থেকে তুমি নামো। নেমে আমার মাথাটা তোমার তরবারি দিয়ে কেটে ফেল।'

রাজপুত্র তখন বললো :

'সে কি কথা। তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে আর আমি কিনা তোমার মাথা কাটবো।'

'হ্যাঁ, তোমায় কাটতে হবে।' 'হিয়ারঅল' জবাব দিলো : 'নইলে আমি তোমায় খেয়ে ফেলব।'

রাজপুত্র তখন করে কি? 'হিয়ারঅলের' মাথাটা কেটে নিল। কাটা মাথা দেখে রাজপুত্র তখন গলা ছেড়ে কাঁদিতে শুরু করলো : 'হায় হায়, আমি একি করলাম। আমি আমার উপকারী কুকুরটিকে কেটে ফেললাম।'

রাজপুত্রের কান্না শুনে 'স্প্রংঅল'ও ছুটে এলো। বললো :

'হিয়ারঅলের' মতো আমার গলাও কেটে ফেলো। না হলে আমি তোমায় খেয়ে ফেলবো।'

রাজপুত্র তখন ঘোড়া থেকে নেমে 'স্প্রংঅলের' মাথাটিও কেটে ফেললো আর কাঁদিতে কাঁদিতে কুকুরের মাথা দুটি ঘোড়ার উপর চাপিয়ে আবার ঘোড়া ছুটাল। কুকুরের মাথা দুটি কিন্তু দেখতে না দেখতে সুন্দরী দু'টি রাজকন্যা হয়ে গেল। রাজকন্যা দু'জন রাজপুত্রকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি অত কাঁদছো কেন?'

রাজপুত্র তখন বললো : 'আমি কাঁদছি আমার অতি বিশ্বাসী কুকুর দুটির জন্যে।'

'আচ্ছা, তুমি তাদের দেখলে আবার চিনতে পারবে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় পারবো।'

তখন সুন্দরী মেয়ে দুটি নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললো : 'আমি হলাম তোমার সেই 'হিয়ারঅল'। আর ওর নাম 'স্প্রংঅল'। রাজপুত্র তখন অপরূপা দুই রাজকন্যাকে নিয়ে আপন রাজ্যে ফিরে এলো আর দু'জনকে বিয়ে করে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলো।

১৬

সে অনেক যুগ আগের কথা।

একবার এক জিপসী একখানি জাহাজ তৈরি করে। জাহাজখানি সে নিজেই পরিচালনা করতো। পাড়ি জমাত শ্বেত সাগর থেকে কৃষ্ণসাগরে। কৃষ্ণসাগর থেকে শ্বেত সাগরে।

একবার হয়েছে কি, জল নেবার জন্য সে তার জাহাজখানা ভিড়াল সাগরপারের এক গাঁয়ে এসে। গাঁয়ে নেমে সে দেখে চার পাঁচটি ছেলে সমুদ্রের ধারে বালির উপর খেলা করছে। আর এ ছেলেদের মধ্যে একজন হোল টেকো। জাহাজওয়ালা ছেলেটাকে কাছে ডাকলো। বললো :

'কোথায় একটু জল পাবো বলতে পারো?'

সে তখন জাহাজওয়ালাকে ঝরনার কাছে নিয়ে গেল। আর জাহাজওয়ালা আশ মিটিয়ে জল পান করলো। এক সময় বললো :

'আমার সংগে যাবে তুমি জাহাজে করে?'

'হ্যাঁ যাবো। কিন্তু মাকে—।'

'বেশ তো, মাকে বলবে বই কি?' জাহাজওয়ালা জবাব দিলো। বললো : 'চল, তোমার মার কাছে যাই।'

টেকো ছেলেটির হাত ধরে জাহাজওয়ালা তখন ওর মার কাছে গেল। বললো :

'আপনার ছেলেটিকে আমার সংগে দেবেন?'

'হ্যাঁ, দেবো।'

জাহাজওয়ালা ক্যাপটেন তখন ছেলেটির মার হাতে তার মাইনে বাবদ একগাদা টাকাকড়ি গুঁজে দিলো। তারপর টেকো-মাথা ছেলেটিকে নিয়ে যেখানে জাহাজখানা নোঙর ফেলেছিলো সেখানে এসে হাজির হোল। নোঙর তুলে সে তখন সাগর জলে পাড়ি দিলো। তারপর ভাসতে ভাসতে তাদের জাহাজ এসে ভিড়লো বড়ো এক গাঁয়ে।

এদিকে রাজার ছেলে বেরিয়েছিল দেশভ্রমণে। ঘুরতে ঘুরতে

রাজপুত্র এসে হাজির হোল ওই গাঁয়ে। এসে দেখে ঝরনার ধারে এক দরবেশের সংগে একটি মেয়ের তসবির রয়েছে বিক্রির জন্যে।

রাজপুত্র তসবিরখানি কিনলো।

সত্যি ভারী সুন্দর ছবি। গত সাত বছর ধরে ছবিখানি আঁকছিল মেয়েটির বাবা। রাজপুত্র ছবিখানা কিনে করলো কি, ঝুলিয়ে রাখলো তা ঝরনার জলের সামনে। কেননা রাজপুত্র ভাবলো যারা ঝরনার জল খেতে আসবে তাদের চোখ নিশ্চয় মেয়েটির তসবিরের উপর পড়বে। হয়তো তখন কেউ-না-কেউ মেয়েটিকে চিনতে পারবে।

জাহাজের ক্যাপটেন জল পান করতে এসে ঝরনার ধারে তসবির-খানা দেখলো। আর ভাবলো 'আহা, কী সুন্দর!'

জাহাজে ফিরে গিয়ে ক্যাপটেন বলে বেড়াতে লাগলো: ঝরনার ধারে জল পান করতে গিয়ে সে পরমা সুন্দরী এক মেয়ের তসবির দেখে এসেছে। তাই শুনে টেকোমাথা তার টাক চুলকিয়ে বলে উঠলো:

'তাই নাকি, আমি নিজে গিয়ে একবার দেখে আসি তো?'

এ বলে সে ছুটে গেল ঝরনার ধারে। আর তসবিরখানি দেখে সে তো হেসে খুন। বললো:

'এ তো আমাদের দরবেশের মেয়ে! তা এখানে ওটা এলো কি করে?'

রাজপুত্রের লোকজন, সৈন্য-সামন্ত, সব আশেপাশেই ছিলো। টেকোর কথা শুনে ওকে সবাই ঘিরে ধরলো। তারপর টানতে টানতে নিয়ে চললো রাজদরবারে।

কাণ্ড-কারখানা দেখে টেকো তো ভীষণ ভড়কে গেল। দু'দিন দু'রাত্রি তার মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুলো না। কিছুটা খাতস্থ হলে সবাই তাকে আবার ঘিরে ধরলো। বললো:

'মেয়েটিকে তুমি চেনো?'

'আরে, চিনবো না কেন?' টেকো তার মাথার টাকের উপর একবার হাত বুলিয়ে বলে উঠলো: 'আরে চিনবো না কেন? ছেলেবেলা থেকে আমরা দু'জন যে একসংগে বড়ো হয়েছি। মেয়েটির মা আঁতুড়েই মারা যান। আমার মা-ই তো ওকে বুকে করে বড়ো করে তোলেন। আমরা যে একসংগে মাই খেয়েছি গো!'

'বেশ, তোমাকে আমরা রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। ভয় পেয়ো না।'

এই বলে ওরা সবাই তাকে চ্যাঙদোলা করে নিয়ে গেলো রাজার কাছে।

রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন :

'তুমি বাছা, ও মেয়েটিকে চেনো ?'

'হ্যাঁ, মহারাজ!' ঘাড় নাড়লো ছেলেটি—'আমরা একসঙ্গে বড়ো হয়েছি।'

'তুমি ওকে এখানে নিয়ে আসতে পারবে ?'

'পারবো মহারাজ!' টেকো জবাব দিলো।—'তবে আমাকে একখানি সোনালী পাতবসানো জাহাজ বানিয়ে দিতে হবে। আর সঙ্গে দিতে হবে বিশজন গাইয়ে বাজিয়ে লোক। রাজপুত্রকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে। আমি যা করবো তা কিন্তু কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমার সব কাজ মেনে নিতে হবে তাকে। আপনি যদি রাজি হন, তবে আমি যাবো। যেতে আসতে আমার বছর সাতেক সময় লাগবে।'

রাজা তাতে রাজি হলেন।

সোনালী পাতবসানো •কখানি জাহাজও বানিয়ে দিলেন। টেকো আর রাজপুত্র সেই জাহাজে চেপে বসলেন। আর সঙ্গে নিলেন বিস্তর খাবার-দাবার। সাত বছরের মতো পানীয় জল। তারপর দিন ক্ষণ দেখে একদিন সে জাহাজের নোঙর তুললো। পাড়ি দিলো নীল সাগরের বুকে।

তাদের জাহাজখানি একদিন ভাসতে ভাসতে এসে ভিড়লো তসবির কন্যার দেশে। শেষ রাত্রের দিকে টেকো তার জাহাজখানি তসবির কন্যার বাড়ির ঠিক সামনা-সামনি এনে নোঙর ফেললো। টেকো তখন করলো কি, জাহাজের মাঝি-মাল্লা লোকজন সবাইকে পাঠিয়ে দিলো নিচের পাটাতনে। বললো :

'খবরদার, কেউ এখন বেরুবে না। যাও, সবাই নিচে গিয়ে লুকিয়ে থাকো গে। আমি না বললে কেউ ওপরে আসবে না।'

এ বলে নিজে কিন্তু ডেকের উপর পায়চারি করতে লাগলো এদিক ওদিক।

এদিকে দরবেশ-কন্যা ঘুম থেকে উঠে দেখে একখানি সোনালী জাহাজ কোত্থেকে এসে ভিড়েছে তাদের ঘাটে। সূর্যের সোনালী রোদে

ঝলমল ঝিকমিক করছে জাহাজের মাস্তুলটি।

দু'হাতে চোখ কচলে দরবেশ-কন্যা দেখে কি, একজন লোক খোলা পাটাতনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। দরবেশ-কন্যা এগিয়ে গিয়ে তাকে নমস্কার করলো। টেকোকে দেখেই কিন্তু সে চিনে ফেললো। বলে উঠলো :

'আরে, তুমি এখানে কেন ? এখানে কী করছো ?'

'এলাম তোমাকে দেখতে। কতদিন দেখিনি। কেমন আছো ?' টেকো জবাব দিলো। বললো : 'উঠে এসো এখানে। তোমার বাবা কোথায় ?'

'বাবা কোথায় জানি না। তিনি তো আমার তসবির তৈরি করে তা বিক্রি করতে গেছেন। অনেকদিন হোল। এখনও কিন্তু ফেরেন নি।'

'তা এখানে এসো না। একটু গল্প-গুজব করি।'

টেকো ডাকলো তসবির-কন্যাকে। তসবির-কন্যাও রাজি হোল। এবং সাজ-গোজ করবার জন্য বাড়ি গেল।

টেকো তখন করলো কি, সে জাহাজের নিচে পাটাতনে গিয়ে লোকজনদের ডেকে চুপি-চুপি বললো : 'তোমরা খবর্দার, কেউ বেরুবে না। যে যেখানে আছো সেখানেই লুকিয়ে থেকো। যেই দেখবে দরবেশ-কন্যা জাহাজে উঠেছে আর আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে কেবিনে গিয়ে ঢুকেছে, অমনি নোঙর তুলে জাহাজখানি দেবে ভাসিয়ে।'

জাহাজে উঠে গল্প করতে করতে দরবেশ-কন্যা এক সময় কেবিনে গিয়ে ঢুকলো। আর ঢুকতে না ঢুকতেই জাহাজখানি আবার ভেসে চললো সাগর জলে।

টেকো রাজপুত্রকেও কেবিনে ডেকে আনলো। রাজপুত্রকে দেখে দরবেশ-কন্যা বলে উঠলো :

'উনি কে ? আমি কিন্তু এবার যাই।'

দরবেশ-কন্যা কিন্তু তখনও জানতে পারেনি যে জাহাজ তাদের এখন মাঝ-সাগরে। ছেড়ে দিয়েছে কখন।

টেকো বললো : 'সে কি বোন। একটুখানি মিষ্টি মুখ করবে না ?'

সে তখন দরবেশ-কন্যাকে অনেকটা মিষ্টি খেতে দিলো। মিষ্টি খাওয়া শেষ হতে না হতেই টেকো বলে উঠলো : 'এবার একটু গান-বাজনা

হোক। তোমাকে একটু বাজনা শুনিয়ে দিই।'

এই বলে সে তখন গাইয়ে-বাজিয়েদের গান শুরু করতে নির্দেশ দিলো। তাই দেখে দরবেশ-কন্যা বলে উঠলো :

'না-না, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাবা বুঝি এসে গেছেন। আমি এবার যাই।'

'আরে, যাবে বই কি, একটু বসো বসো। গান-বাজনাটা এদের শেষ হতে দাও।' টেকো বলে উঠলো একসময়—'বসো, গান শোন।'

দরবেশ-কন্যা বসে গান শুনতে লাগলো। জাহাজখানি কখন পাল খাটিয়ে শাঁ-শাঁ করে উড়ে চললো ঢেউ ভেঙে, টেরই পেল না সে। তবু একসময় সে বলে উঠলো :

'আমাকে এবার নামিয়ে দাও। বাড়ি যাবো, বাবা বুঝি এসে গেছেন।'

সে ছুটে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো। দেখে কোথায় তাদের বাড়ি? জাহাজ এখন মাঝ দরিয়ায়। সে তাই বলে উঠলো :

'এ কি, এ কী করলে টেকো ভাই? আমি এখন বাড়ি ফিরবো কী করে?'

'কি করলাম?' টেকো একটু হাসলো। বললো : 'তোমার পাশে এতক্ষণ কে বসেছিলেন জানো? উনি আমাদের রাজকুমার। ওঁর জন্যই তো তোমায় এখানে আনলাম।'

তাই শুনে দরবেশ-কন্যা কান্না-কাটি জুড়ে দিলো। সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিতে চাইলো।

টেকো বহু কষ্টে তাকে নিবৃত্ত করলো। বুঝিয়ে সুজিয়ে একসময় পাঠিয়ে দিলো রাজপুত্রের কাছে কেবিনের মধ্যে। বললো :

'যাও, দুঃখ করো না। রাজপুত্র একা বসে আছেন। তার সঙ্গে বসে গল্পগুজব করো গে। খানা-পিনা করো গে, যাও।'

ওকে রাজপুত্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে টেকো একা একা পাহারায় রইল বাইরে। কেবিনের পাশে উপরের পাটাতনের উপর একা একা সে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো। জাহাজের সে ক্যাপটেন-অধ্যক্ষ। দায়িত্ব তার অনেক। সবাই খানা-পিনা হৈ-চৈ করলেও সে কিন্তু তার জায়গা ছেড়ে কোথাও গেলো না।

প্রথম দিন কেটে গেলো।

দ্বিতীয় দিনও কাটলো।

তৃতীয় দিন শেষ রাত্রে জাহাজ এসে ভিড়লো এক গঞ্জে। আর কোত্থেকে তিনটি পাখি উড়তে উড়তে এসে বসলো জাহাজের মাস্তুলের উপর। আশে-পাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে পাখি তিনটি তখন আপন মনে কথা বলতে লাগলো। এক পাখি আর এক পাখিকে ডেকে বললো :

'ও পাখি, ও পাখি, শুনছো পাখি ?

দরবেশ-কন্যা তো এখন দিব্যি খানা-পিনা করছে। তার বরাতে কী লেখা আছে, জানো কি ?'

'কী আছে গো, কী আছে ?' শুধালো আর এক পাখি।

'কাল সকালে রাজপুত্রের জাহাজ যেই কূলে ভিড়বে তখন ছোট একখানা ডিঙিনৌকো রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যাকে বরণ করে নিতে আসবে। রাজপুত্র আর দরবেশ কন্যা যেই ডিঙিতে পা দেবে, ডিঙিখানা অমনি যাবে ডুবে। আর দু'জনেই যাবে তখন জলের নিচে তলিয়ে। যদি কেউ আমাদের এইসব কথা শুনে বলতে যায় কাউকে, হাঁটু পর্যন্ত তার পাষাণ হয়ে যাবে।'

টেকোই একমাত্র সব শুনলো। কেননা, সে ছাড়া কেউ ছিল না আশে-পাশে কোথাও।

পরদিন সকাল বেলা পাখি তিনটি আবার উড়ে এসে বসলো জাহাজের মাস্তুলের উপর। নিজেদের মধ্যে ওরা তখন কথা বলতে লাগলো আপন মনে।

'ও পাখি, ও পাখি, শুনছো পাখি,
রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যার খানা-পিনার
তো আর নেই বাকি। কিন্তু বরাতে তাদের
কী লেখা আছে জানো কী ?'

'কী আছে গো, কী আছে ?' শুধালো আর এক পাখি।

'কাল সকালে জাহাজ থেকে নেমে যেই ওরা যাবে তোরণ
দিয়ে রাজবাড়ির দিকে, অমনি তোরণটি

হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে দু'জনের মাথায়।
যে একথা শুনবে আর বলতে যাবে কাউকে
কোমর পর্যন্ত তার পাষাণ হয়ে যাবে।'

টেকোই একমাত্র শুনল সব। কেননা, সে ছাড়া আশপাশে কেউ আর ছিল না।

পরদিন রাত্রি শেষে পাখি তিনটি আবার উড়ে এসে বসলো জাহাজের মাস্তুলের উপর, আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো :

'ও পাখি, ও পাখি, শুনছো পাখি,
রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যা খুব তো
এখন খানা-পিনা, গান-বাজনা করছে।
বরাতে তাদের কী লেখা আছে, জানে কী
পাখি, জানো কী?'
'কী লেখা আছে গো, কী লেখা আছে?'
আরেক পাখি শুধালো।

'দরবেশ-কন্যাকে বিয়ে করে রাজপুত্র যখন বাসর ঘরে সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়বে রাতদুপুরে তখন সাত-মাথাওয়ালা প্রকাণ্ড এক ড্র্যাগন এসে খেয়ে ফেলবে দু'জনকে। যদি কেউ আমার কথা আড়ি পেতে শোনে আর বলতে যায় কাউকে, মাথা পর্যন্ত তার পাষাণ হয়ে যাবে!'

হয় হোক! সর্বাংগ তার পাষাণ হয়ে যাবে তো যাক। তবু সে রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যার প্রাণ রক্ষা করবে।—টেকো পাটাতনের উপর পায়চারি করতে করতে ভাবলো।—কিছুতেই সে ডিঙি নৌকোকে ভিড়তে দেবে না জাহাজের গায়ে রাজপুত্রদের নামাবার জন্য।

তাই টেকো করলো কি, জাহাজের গায়ে কোনো ডিঙ্গি নৌকোকে ভিড়তে দিল না। নির্দেশ দিলো নতুন করে জাহাজের পাল খাটাতে। আর পালের হাওয়ায় জাহাজখানি তরতর করে অনেকখানি উঠে এলো ডাঙার উপর। আর তখন ডাঙায় নেমে এলো জাহাজ থেকে রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যা।

অমন সুন্দর জাহাজখানি ডাংগায় তুলে মকেজো করলো বলে সবাই তখন টেকোর উপর চটে গেলো। রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করলো ওর নামে। রাজা তাই টেকোকে তলব করলেন দরবারে। বললেন :

'অমন সুন্দর জাহাজখানির অমন দশা করলে কেন?'

'সে কি মহারাজ। আপনি কি আপনার প্রতিশ্রুতির কথা বিলকুল ভুলে গেলেন? দরবেশ-কন্যার খোঁজে যখন আমি যাচ্ছিলাম তখনই তো আপনাকে জানিয়েছিলাম আমার কোন কথায়, আমার কোন কাজে বাধা দেবেন না আপনারা কেউ। আপনি তখন মেনে নিয়েছিলেন।'

রাজা মাথা নেড়ে সায় দিলেন। বললেন: 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে। হ্যাঁ, কেউ তোমার কাজে বাধা দেবে না।'

টেকো তখন রাজকুমার আর দরবেশ-কন্যাকে নিয়ে তোরণ-পথের দিকে পা বাড়ালো। কিছুদূর গিয়েই সে লোকজনদের দেখে নির্দেশ দিলো তোরণটাকে যেন ভেঙে ফেলা হয় এখনই।

রাজ্যের সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলো। সে কী কথা! সাতবছর পর রাজপুত্র দেশে ফিরলেন। তাঁর সম্মানে তোরণ তৈরি করা হোল, আর তা কিনা ভেঙে ফেলতে হবে!

সবাই গিয়ে রাজার কাছে আবার ধর্না দিলো।

সব শুনে মহারাজ কিন্তু না করলেন না। বললেন:

'ও যা করে করুক। তোমরা কেউ বাধা দিও না।'

তোরণ ভাঙা হলে সবাই রাজপ্রাসাদে গিয়ে ঢুকলো। তারপর খানা-পিনা, নাচ-গান, হৈ-হুল্লোড়ে মেতে গেলো। রাত্রে রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যাকে সাজিয়েগুছিয়ে বাসরঘরে পাঠানো হোল। সবাই বাসরঘর থেকে চলে গেলেও টেকো কিন্তু থেকে গেল ঘরের মধ্যে। বললো:

'আমিও থাকবো ঘরের মধ্যে।'

রাজকুমার আর দরবেশ-কন্যা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। বললো: 'সে কী কথা, বাসর ঘরে তুমি আবার থাকবে কি করে?'

টেকোর কিন্তু এক কথা. 'দেখো ভাই! আমার কাজে কেউ বাধা দিয়ো না।' এই বলে পালঙ্কের নিচে এক জায়গায় সে লুকিয়ে রইল চুপটি করে।

এদিকে রাত্রি গভীর হোল। রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যা দুজনে ঘুমিয়ে পড়লো একসময়। টেকোর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। রাজপুত্রের তরবারিখানা নিয়ে সে কিন্তু ঠায় বসে রইল এক জায়গায়।

রাত যখন ঠিক দুপুর তখন সে হঠাৎ দেখতে পেল ফোঁস ফোঁস

শব্দ করতে করতে সাতমাথা প্রকাণ্ড এক ড্র্যাগন এসে গিলতে গেল রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যাকে। টেকোও ওত পেতে ছিল। পালংকের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে সে অমনি ঘ্যাচ করে ড্র্যাগনের সাত সাতটি মাথাই কেটে ফেললো চক্ষের নিমেষে। ড্র্যাগনের মাথাগুলি সে বালিশের নিচে রাখলো লুকিয়ে। আর মরা ড্যাগনটাকে রাখলো পালংকের নিচে এক স্থানে।

এদিকে হয়েছে কি, টেকো যখন ড্র্যাগনটাকে নিয়ে মহাব্যস্ত রাজপুত্রের ঘুম গেল কখন ভেংগে। ঘরের আবছা অন্ধকারে টেকোকে তরবারি হাতে দেখতে পেয়ে সে চীৎকার করে উঠলো:

'মহারাজ, মহারাজ, টেকো আমাদের খুন করতে এসেছে।'

তাই শুনে রাজবাড়ির সবাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। আর হাতে-নাতে ধরে ফেললো টেকোকে তরবারি সুদ্ধু।

রাজাও ছুটে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন:

'কি হয়েছে, বাছা?'

রাজপুত্র বললো: 'টেকো আমাদের খুন করতে এসেছিল, বাবা। ঘুম না ভাঙলে মেরেই ফেলতো।'

প্রহরীরা তখন টেকোকে হাত-পা বেঁধে নিয়ে গেলো বাইরে। আর আটকে রাখল কয়েদখানায়। পরদিন সকালে রাজা দরবারে বসে তলব করে পাঠালেন টেকোকে। বললেন:

'সাত বছর আগে তুমি এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে দরবেশ-কন্যাকে নিয়ে আসবে এ রাজ্যে। বিয়ে দেবে রাজপুত্রের সংগে। সে প্রতিশ্রুতি তুমি পালন করেছ। বিয়ে-থাও তাদের হয়ে গেছে ভালয় ভালয়। তবে রাত দুপুরে তুমি তাদের তরবারি দিয়ে কাটতে গেল কেন?'

'কেন গেলাম সে আমি জানি না, মহারাজ! বলতে পারব না।'

'তুমি জানো আর না জানো, তুমি আমার ছেলেকে খুন করতে এসেছিলে। আমি তোমায় খুন করব।'

'সে আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।' জবাব দিলো টেকো।

রাজবাড়ির জল্লাদরা তখন টেকোর হাত-পা বেঁধে তাকে নিয়ে চললো বধ্যভূমিতে। যেতে যেতে টেকো ভাবলো এমনিতেই প্রাণ যাবে। তার চাইতে ধীরে ধীরে পাষাণ হয়ে যাওয়া মন্দ কি। আমি যদি ব্যাপারটা

সব রাজাকে জানাতে চাই তাহলে আমি পাষাণ হয়ে যাব ঠিকই। কিন্তু কারণটা তো মহারাজ জানতে পারবেন। তাই সে জল্লাদদের বললো :

'আমাকে একবার মহারাজের কাছে নিয়ে চলো। তাঁর সাথে আমার গোপন কথা আছে।'

ওরা তখন টেকোকে আবার মহারাজের কাছে নিয়ে এলো। মহারাজ টেকোকে দেখে বললেন :

'ওকে আবার আনলে কেন এখানে ?'

'গোপনে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায় আসামী।'

'কি কথা ? বলে বাছা !' মহারাজ অনুমতি দিলেন টেকোকে।

টেকো তখন বললো : 'দরবেশের মেয়েকে নিয়ে আসবার সময় আমি জাহাজের পাটতনে বসেছিলাম একলা। শেষরাত্রে তখন জাহাজের মাস্তুলে উড়ে এসে বসলো তিনটি পাখি। পাখিগুলি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলো :

'এই যে দরবেশ-কন্যা আর রাজপুত্র এত খানা-পিনা আর নাচ-গান করছে, তারা কি জানে তাদের বরাতে কি আছে ? জাহাজ থেকে নামবার সময় রাজপুত্র যদি ডিঙিতে উঠতে যান তাহলে রাজপুত্র ও দরবেশ-কন্যা যাবেন জলের নিচে তলিয়ে আর আমাদের একথা যে শুনবে এবং বলবে অন্য কাউকে হাঁটু পর্যন্ত তার পাষাণ হয়ে যাবে। তাই তো আমি জাহাজটাকে ডাঙায় তুলতে হুকুম দিয়েছিলাম।

'দ্বিতীয় দিনও ঐ পাখি তিনটি উড়ে এসে মাস্তুলে বসলো আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো :

'ঐ দরবেশ কন্যা আর রাজপুত্র এত খানা-পিনা গান-বাজনা, হৈ-হুল্লোড় করছে, তারা কি জানে তাদের বরাতে কি লেখা আছে ? তোরণ ভেঙ্গে পড়ে মারা যাবে তারা জানে কি ? আমাদের কথা যে শুনবে আর বলবে কাউকে, কোমর পর্যন্ত তার পাষাণ হয়ে যাবে।

'তাই তো আমি তোরণ ভাঙার হুকুম দিয়েছিলাম, মহারাজ !'

এবং হোলও তাই। বলতে বলতে টেকোর কোমর পর্যন্ত পাষাণ হয়ে গেলো। তাই দেখে রাজা বলে উঠলেন :

'না, না। থামো, থামো ! তোমাকে আর বলতে হবে না। তুমি দেখছি কোমর পর্যন্ত পাষাণ হয়ে গেলে !'

'না মহারাজ, আমাকে বলতে দিন।' টেকো অনুনয় করলো। —'বলতে দিন মহারাজ।'

'তৃতীয় দিনের শেষরাত্রে আবার সেই পাখি তিনটি উড়ে এসে বসলো মাস্তুলে। আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো :

'ঐ রাজপুত্র আর দরবেশ-কন্যা এত যে গান বাজনা, খানা-পিনা, হৈ-হুল্লোড় করছে, তারা কি জানে তাদের বরাতে কি লেখা আছে? বাসরঘরে ড্র্যাগন এসে যে তাদের খেয়ে ফেলবে তারা কি তা জানে? আমাদের কথা যে শুনবে আর বলবে কাউকে, আপাদমস্তক তার পাষাণ হয়ে যাবে।'

টেকো আবার বলতে শুরু করলো :

'বাসরঘরে সাতমাথা ড্র্যাগন রাজপুত্রদের খেতে এলো। আমি ড্র্যাগনটাকে মেরে মাথা সাতটি তার বালিশের নিচে লুকিয়ে রেখেছি। কাউকে বলুন মাথাগুলি বালিশের নিচে থেকে নিয়ে আসতে। আমি ঠিক বলছি কিনা যাচাই করে নিন। তাই তো আমি রাজপুত্রের সংগে বাসর ঘর করতে গিয়েছিলাম।'

টেকো একটু থামলো। আবার বললো : 'রাত্রে বাসরঘরে আমার হাতে খোলা তরবারি দেখে রাজপুত্র ভাবলেন, আমি বুঝি তাঁদের হত্যা করতে এসেছি। তাই রাজপুত্র চীৎকার করে উঠেছিলেন। ডেকে এনেছিলেন আপনাদের। আমিও তখন পুরো ঘটনাটি খুলে বলি নি। বলি নি পাছে পাষাণ হয়ে যাই এই ভয়ে।'

টেকো এবার থামলো। আর দেখতে দেখতে মাথা পর্যন্ত তার পাষাণ হয়ে গেল। সবাই তখন ওর পাষাণ দেহটি ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে রেখে দিল রাজদরবারে।

রাজপুত্র কিন্তু এবার কান্নায় ফেটে পড়লো। বন্ধুর জন্য হা-হুতাশ, দুঃখ প্রকাশ করলো বিস্তর। বললো : 'যে বন্ধু নিজের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করলো তাকে আমি অমন জড় পাষাণ-প্রতিমা হয়ে থাকতে দেবো না। তাকে আমি বাঁচিয়ে তুলবোই।'

এ বলে রাজপুত্র যে দিকে চোখ যায় সে পথ ধরে চলতে শুরু করলো। বন্ধু যদি তার জন্য সাত বছর দেশ-বিদেশে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে পারে, এত কষ্ট সহ্য করতে পারে, সেও বা পারবে না

কেন ?' যেখান থেকে পারি, যতো কষ্টই হোক, আমি মন্ত্রপড়া জল এনে তার পাষাণদেহে প্রাণ সঞ্চার করবো। উপকারী বন্ধুকে আবার বাঁচিয়ে তুলবো।'

রাজপুত্র সংকল্প করলো।

সাহসে বুক বেঁধে রাজপুত্র পথ চলতে লাগলো। কিন্তু পথের যেন আর শেষ নেই। কত দেশ-দেশান্তর, মাঠ-ঘাট, বন-বনান্তর পার হয়ে এলো, কোথাও কিন্তু বন্ধুর জীয়ন-কাঠির হদিশ পেলো না।

পথ চলতে চলতে একদিন সে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে এক ঝরনার ধারে এসে থামলো। তারপর ঝরনার জলে নেমে আকণ্ঠ জল পান করলো। ঝরনার ধারে গাছ-তলায় হাত-পা ছড়িয়ে একটু সে জিরিয়ে নিলো।

এক সময় তার একটু ঘুমও এলো। ঘুমের ঘোরে রাজপুত্র স্বপ্ন দেখলো : তার প্রিয় বন্ধু কখন এসে তার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়েছে। সে তাঁকে যেন বলছে : সাত সাত বছর আমার জন্য তো কতো ঘোরাই ঘুরলে। আর না। এ ঝরনা থেকে খানিকটা জল আর মাটি নিয়ে আমার পাষাণ হয়ে যাওয়া দেহের উপর ছিটিয়ে দাও গিয়ে। দেখবে আমি আবার প্রাণ পাবো। আবার বেঁচে উঠবো।

রাজপুত্রের তন্দ্রাব ঘোব কেটে গেল। ধড়ফড় করে সে উঠে বসলো। আশে-পাশে তাকালো, না, কোথাও টেকোর ছায়াটিও দেখতে পেলো না। তবু সে স্বপ্নের নির্দেশ মত খানিকটা ঝরনার জল আর মাটি নিয়ে ছুটলো দেশে। তারপর সেই জল আর মাটি টেকোর পাষাণ মূর্তির উপর ছিটিয়ে দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত হয়ে উঠল টেকোর প্রাণহীন পাষাণ দেহ।

ধড়ফড় করে টেকো উঠে বসলো। তারপর দু'হাতে চোখ রগড়ে বলে উঠলো : 'একি, আমি এতক্ষণ কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ? তা, বিয়ে বাড়ির খানা-পিনা কী সব শেষ হয়ে গেছে ?'

'না না, শুরুই হয়নি এখনো।' রাজপুত্র পাশেই ছিলো। হেসে জবাব দিলো।

খানা-পিনার পর্ব শুরু হোল আবার নতুন করে। আর রাজপুরী মুখর হয়ে উঠলো আনন্দে।

১৭

এক ছিল সওদাগর। তার ছিল বিস্তর ধন-দৌলত। অনেক টাকা-কড়ি। তার স্ত্রীও ছিল খুবই সুন্দরী। তাই বুঝি সে স্ত্রীকে কোথাও যাওয়া-আসা করতে দিতো না। সে বেচারী ঘরের কোণে পড়ে থাকতো।

এখন হয়েছে কি, সওদাগরকে একদিন বিশেষ কাজে বেরুতে হোল। নানা পণ্যদ্রব্যে ডিঙা সাজিয়ে সওদাগরী করতে চললো সে দানিয়ুব নদী বেয়ে। সংগে রইল আর এক সওদাগর। সওদা সেরে ওরা যখন বাড়ি ফিরছিল তখন রাত হয়ে গেল মাঝ-পথে। খাওয়া-দাওয়া সেরে নেবার জন্য ওরা তখন ডিঙা ভিড়ালো কূলে। খেতে খেতে একসময় দু' সওদাগর গল্প শুরু করলো নিজেদের মধ্যে। একজন বললো :

'বাড়ি তো ফিরছো, কিন্তু গিয়ে হয়তো দেখবে তোমার স্ত্রী তার নতুন প্রেমিকের সংগে মেতে আছে নব রংগে।'

'না-না, আমার পরিবার অমনটি নয়। তার কোনো প্রেমিক-টেমিক নেই ভাই।'

'আরে, রাখো রাখো!' সওদাগর বন্ধু বাধা দিয়ে উঠলো।—'আমি যদি তোমার পরিবারের নাগর হই, তুমি আমায় কি দেবে?'

'যদি তুমি তাই হতে পারো আমি আমার সর্বস্ব—এ সওদাগরি জাহাজ, পণ্য-দ্রব্য, জায়গা-জমি সব তোমায় দিয়ে দেবো।'

অপর সওদাগর জবাব দিলো : 'আমি যে তোমার পরিবারের প্রেমিক তার প্রমাণ দেবো কী করে?'

'তুমি যদি আমাকে তার কোন জন্ম-চিহ্ন কিংবা তুমি যদি তার আঙুল থেকে আংটিটা খুলে এনে আমায় দেখাতে পারো, তবে বুঝবো হ্যাঁ, তুমি তার প্রেমিক বটে।'

সওদাগর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে মুচকি একটু হাসলো। বললো :

'যাওনা, আমার গিন্নী যদি জানতে পারে তোমার বদ মতলবের কথা, তাহ'লে তোমায় কী দশা করে দেখো? রীতিমত ঝাটাপেটা করে ছাড়বে তোমায়।'

একটু থেমে সওদাগর আবার বললো : 'স্ত্রীর উপর নজর রাখবার জন্য আমি একটা ঝিও রেখেছি। সেও আমায় বলেছে, গিন্নী কোথাও বাইরে যায়-টায় না।'

'বেশ, আমি গিয়ে একবার পরখ করে দেখছি।'

'হ্যাঁ যাও, গিয়ে চেষ্টা-চরিত্তির করে দেখো। আমি তোমার জাহাজ নিয়ে যাচ্ছি।'

সওদাগর বন্ধুর বাড়িতে তো এলো। কিন্তু এখন সে করে কী? সওদাগর-গিন্নীর কাছ ঘেঁষতে তার সাহসে কুলোলো না। তাই সে বৃদ্ধা এক স্ত্রীলোকের কাছে গিয়ে বললো :

"আচ্ছা দিদি, গিন্নীমার হাত থেকে আংটিটা কী করে বাগাই বলো তো দেখি?'

'সে আমি বাতলাতে পারি। কিন্তু আমায় তুমি কী দেবে?' বৃদ্ধা জবাব দিলে।

'যদি বাতলিয়ে দিতে পারো, আমি তোমায় একশ' 'ফ্লোরিন' গুণে দেবো।'

'বেশ, তাই দিয়ো। তা এখন বড়ো-সড়ো গোছের একটা সিন্দুক তৈরি করে আনো। সিন্দুকটার যেন একটা জানলা থাকে। সিন্দুকটায় ঢুকে তুমি লুকিয়ে থেকো। ভেতর থেকে দিও কুলুপ এঁটে। আমি তোমায় নিয়ে যাবো গিন্নীমার কাছে।"

সওদাগর সিন্দুক আনলে বুড়ী সওদাগর শুদ্ধু সিন্দুকটা টানতে টানতে নিয়ে গেল গিন্নীমার কাছে। গিয়ে বললো :

'আমি মা এখন একটু বাইরে যাচ্ছি। এ তোরঙ্গটার মধ্যে আমার দামী দামী জামা-কাপড় সব রয়েছে। তোরঙ্গটা তাই তোমার কাছে রেখে গেলাম। পাছে চুরি না যায়, তুমি একটু দেখো।'

'সে আমি দেখবো'খন।'

গিন্নীমা উত্তর দিলো। আর তোরঙ্গটা নিয়ে গিয়ে হল ঘরের এক-পাশে রেখে দিতে বললো ঝিকে।

'হল ঘরে নয় মা, তোমার শোবার ঘরেই নিয়ে গিয়ে রাখো। দামী সব জামা-কাপড়। কাল সকাল বেলা এসেই আমি নিয়ে যাবো।'

'বেশ তাই রাখবো।' গিন্নীমা আশ্বাস দিলো। এবং নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে সিন্ধুকটা রেখে দিলো এক কোণে।

বুড়ীও খুশি হয়ে বাড়ি গেল।

এ দিকে রাত্রে গিন্নীমা তার জামা-কাপড় সব ছেড়ে গেল গা ধুতে। আঙুল থেকে আংটিটাও রাখলো খুলে টেবিলের উপর। টবে নেমে গিন্নিমা তারপর গা ধুলো অনেকক্ষণ। তোরংগ থেকে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে সওদাগর কিন্তু দেখলো সব কিছু। দেখলো সওদাগর-গিন্নীর ডান বুকের ঠিক নিচে রয়েছে কালো একটা তিল।

স্নানটান সেরে সওদাগর-গিন্নী তারপর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। টেবিলের উপর থেকে আংটিটা নিয়ে আবার আঙুলে পরতে ভুলেই গেল সে। মোমবাতিটা নিবুতে পর্যন্ত গেল ভুলে।

এদিকে সওদাগর-গিন্নী ঘুমিয়ে পড়লে বন্ধু-সওদাগর ধীরে ধীরে সিন্ধুক থেকে বেরিয়ে এলো। আর টেবিলের ওপর থেকে আংটিটা নিয়ে আবার সিন্ধুকের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

পরদিন সকাল বেলা যথারীতি বুড়ী এসে তার সিন্ধুক নিয়ে গেল টানতে টানতে। সওদাগর-গিন্নী জানতেই পারল না যে তার হাতের আংটিটা খোয়া গেল সিন্ধুকের সংগে।

সে যাই হোক, বুড়ী বাড়ি এসে তার সিন্ধুকটা খুলতেই সওদাগর বেরিয়ে এলো হাসতে হাসতে। বুড়ীর হাতে কড়কড়ে অনেকগুলি ফ্লোরিন গুণে দিয়ে সে তার সিন্ধুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। আর সটান গিয়ে হাজির হোল দোস্ত সওদাগরের কাছে। তাকে দেখে দোস্ত বলে উঠলো :

'কী গো, আমার স্ত্রীর সংগে রাত কাটালে কেমন ?'

'তোফা !'

'বলো কি, রাত কাটিয়েছো যে তার প্রমাণ কী কোনো চিহ্ন দেখাতে পারো ?'

'হ্যাঁ, পারি।'

সওদাগর-গিন্নীর ডান বুকের নিচে কালো তিলের কথা তখন দোস্ত বললো বন্ধুকে। গিন্নীর হাতের আংটিটাও দিলো খুলো। বললো : 'এই দ্যাখো, নিজের আংটিটাও আমায় পরিয়ে দিলো।'

'বেশ তাই হবে। আমি আমার কথা রাখবো। তুমি আমার এ জাহাজ

নাও। জাহাজ-বোঝাই জিনিসপত্রও সব তোমার।'

সওদাগর-বন্ধু তার কথা রাখলো। আরও বললো: 'বাড়ি এসো, আমি আমার বিষয়-সম্পত্তিও সব তোমায় দিয়ে দেবো।'

সওদাগর বাড়ি ফিরলো। বাড়ি ফিরে গিন্নীকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করলো না। শুধু ছোট্ট একটা ডিঙি তৈরি করে তার উপর গিন্নীকে চাপিয়ে ভাসিয়ে দিলো দানিয়ুব নদীতে। বললো:

'আমি যখন বাড়ি ছিলাম না, আমার অনুপস্থিতিতে যদি তুমি পরপুরুষের সংগে একঘরে রাত্রি কাটাতে পারো, নিজের আংটিটা পর্যন্তও যদি প্রেমিকের হাতে পরিয়ে দিতে পারো তাহলে তোমার প্রতি আমার এছাড়া আর কিছুই করার নেই।

এ বলে সে স্ত্রীর ডিঙিখানা দানিয়ুবের মাঝ দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলো। নিজেও বিষয়-আষয় সব বিলিয়ে দিয়ে ইহুদীদের বাড়িতে জল তোলার কাজ নিলো।

এদিকে দানিয়ুবের বুকে ভাসতে ভাসতে এক বছর কেটে গেল সওদাগর-গিন্নীর। একদিন এক বুড়ো স্নান করছিল নদীতে। জলে গিন্নীর ডিঙিখানি দেখতে পেয়ে সে সেটা কূলে নিয়ে এলো। সওদাগর-গিন্নীকেও বুড়ো নিয়ে এলো বাড়িতে। সুখে-শান্তিতে ওরা দু'জন ঘর-সংসার করলো তিন বছর। সেলাই-এর টুকটাক কাজকর্ম করে দুটি পয়সা সঞ্চয়ও করল সওদাগর-গিন্নী। জমানো সেই টাকা দিয়ে একদিন সে নতুন এক প্রস্ত পুরুষদের পোশাক তৈরি করে নিল দর্জীর দোকানে গিয়ে। মাথার চুলটাও সে ছেঁটে নিলো ব্যাটা ছেলেদের মতো করে। তারপর নতুন পোশাক পরে সে তার আগেকার স্বামীর বাড়ি চললো।

যেতে যেতে পথে রাত হয়ে এলো। এক গাছতলায় তাই শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবে ঠিক করলো। গাছতলায় সে শুয়ে পড়লো। শুয়ে স্বপ্ন দেখলো: কোনো অন্ধজন যদি গাছতলায় গর্তের মধ্যে যে চুনজল আছে তা দিয়ে চোখ ধোয় তবে চোখের দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে পাবে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সে খুঁজে দেখলো কোথায় রয়েছে গর্তটি। গর্তের চুনজলও সে দেখতে পেলো। সে তখন তার থলে থেকে ছোট্ট একটা শিশি বার করে তা ভর্তি করে নিলো গর্তের জলে। তারপর

শহরে এসে এক সরাইখানায় গিয়ে ঢুকে পড়লো। খানা-পিনা সেরে নিলো।

সরাইখানার মালিক হোল এক ইহুদী। সে তাকে জিজ্ঞেস করলো :

'আচ্ছা, খাওয়া-দাওয়া তো বেশ হোল, আপনাদের আর খবর কি ?'

'খবর তো ভালো। তবে দেশের রাজা চোখে দেখতে পান না অনেক দিন থেকে। উনি তো তাই ঘোষণা করেছেন : যদি কেউ দৃষ্টি-শক্তি তাঁর ফিরিয়ে দিয়ে পারে তিনি তাকে তাঁর রাজত্ব দিতে দেবেন।'

'তাই নাকি ? আমি কিন্তু ফিরিয়ে দিতে পারি।'

'পারবে ? দাঁড়াও, আমি গিয়ে রাজাকে বলে আসি।'

রাজা শুনে লাফিয়ে উঠলেন। —'বলো কি ! পারবে ! যাও, চট করে তাকে নিয়ে এসো এখানে।'

রাজার লোকজন সবাই ছুটে এসে পুরুষের পোশাক-পরা সওদাগর-গিন্নীকে ধরে নিয়ে গেল রাজার কাছে। রাজা তখন বলে উঠলেন :

'তুমি যদি আমার দৃষ্টি-শক্তি ফিরিয়ে দিতে পারো, আমি আমার কন্যার সংগে তোমার বিয়ে দেবো। রাজ্যও দেবো।'

ছদ্মবেশী সওদাগর-গিন্নী তখন তার শিশি থেকে গাছতলার জল বার করে তা দিয়ে রাজার চোখ দুটি ধুইয়ে দিলো। আর সংগে সংগে রাজা তাঁর হৃতদৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে পেলেন। দেখতে পেলেন পূর্বের মতো।

রাজা তখন ওকে জড়িয়ে ধরলেন। মাথার রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন ওকে। বললেন : 'আজ থেকে তুমিই রাজা হলে। আমি শুধু তোমার পাশে থাকবো।'

এ বলে রাজা ওকে রাজপোশাকে সাজিয়ে দিলেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত। বাজনাওয়ালাদের ডেকে গান-বাজনা করতে বললেন। ঘোষণা করলেন :

'নতুন রাজার হবে আজ অভিষেক !'

ছদ্মবেশী সওদাগর-গিন্নী হলো দেশের নতুন রাজা।

নতুন মহারাজ একদিন বেরুলো দেশ ভ্রমণে। ঘুরতে ঘুরতে সে এসে থামল ইহুদী বাড়ির সামনে। দেখে, তার আগেকার স্বামী জালা ভর্তি জল নিয়ে চলেছে ইহুদী বাড়ির জন্য।

নতুন মহারাজ ওকে দেখে চিনে ফেললো। সে তাকে ডেকে থামালো।

জিজ্ঞেস করলো :

'আচ্ছা, তুমি কি আগে জল তোলার কাজ করতে ?'

'না মহারাজ, আগে করতাম না।' সে জবাব দিলো। —'আগে আমার অবস্থা এমন ছিলো না। ভালোই ছিলো। আমারও জমিদারী ছিলো। আমি নামী সওদাগর ছিলাম। ধন-দৌলত সব ছিলো আমার।'

'তা হারালো কি করে ?'

'বাজি খেলে।'

'কি বাজি ছিলো ?'

'বাজি ছিলো : আমার পরিবার যদি পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটায় আমি তাকে আমার টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পত্তি সব দিয়ে দেবো। প্রতিপক্ষের কথা শুনে আমি আমার বিষয়-সম্পত্তি সবই দিয়ে দিই।'

'স্ত্রীকে কী করলে ?'

'তাকে দানিয়ুবের জলে ডিঙায় করে ভাসিয়ে দিই।'

'তাই নাকি ?'

দেশের নতুন রাজা তখন তার প্রতিপক্ষ সেই সওদাগরকে ডেকে পাঠালো।

বন্ধু-সওদাগর এসে হাজির হলো। তাকে প্রশ্ন করলো : 'আচ্ছা, তুমি তোমার সম্পত্তি লাভ করলে কী করে ?'

'বাজিতে লাভ করেছি।'

'কি বাজি ছিল ?'

'বাজি ছিল আমি আমার বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেছি।'

'তুমি কি তাই সত্যিই করেছিলে ?'

'হ্যাঁ, করেছিলাম।'

'আচ্ছা, ওর কোন জন্মচিহ্ন ছিল কি ?'

'ডান পাশের বুকের নিচে ছিল তার কালো একটা তিল।'

'ওই তিলটা আবার দেখলে চিনতে পারবে ?'

'হ্যাঁ, পারবো।'

'কই, দেখো তো দেখি চিনতে পারো কিনা।'

এ বলে সে তার বুকের আবরণ খুলে ফেললো একটানে। বললো : 'আমিই তোমার সেই বন্ধুর স্ত্রী। তুমি কি আমার সঙ্গে সহবাস

ধরেছিলে ?'

'না।'

'তাহলে এ মিথ্যের বেসাতি কেন ?'

নতুন রাজা বন্ধু-সওদাগরকে নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে হুকুম করলো। সে তারপর তার স্বামীর দিকে মুখ তুলে তাকালো। বললো : 'তুমি আমায় তখন জিজ্ঞেস করলে না কেন কথাটা সত্যি কি মিথ্যে ?'

'বোকা কিনা তাই। রেগেও গিয়েছিলাম।'—বোকা স্বামী জবাব দিল।

'একেও নিয়ে যাও বাইরে। নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাত করো পঁচিশটা। কিছুটা বুদ্ধি গজাক।'

এ বলে সে তার রাজার পোশাক-আষাক সব পরিয়ে দিলো স্বামী সওদাগরকে। বললো : 'এই নাও, এসব পরো। আজ থেকে তুমিই হলে দেশের নতুন রাজা। আমি হলাম রাজরানী।'

১৮

এক ছিলো বুড়ো আর এক ছিল বুড়ী।

তাদের ছিলো এক ছেলে। চোখের মাণিক। নাম জ্যাক।

গভীর জংগলে ছিলো তাদের বাস। জংগলের আশ-পাশে কোথাও কোনো লোকের বসবাস ছিলো না। তাই জ্যাকের কোনো যোগাযোগ ছিলো না মানুষজনের সংগে। যোগাযোগ না থাকলেও, ছেলেটা কিন্তু পড়াশুনা করতো খুব। বাড়িতে ছিলো বিস্তর বই-পত্র। তাই পড়ে সে জেনেছিলো, তার মা-বাবার মতো আরও বহুলোক আছে বাইরে। সে গিয়ে তাদের সংগে যোগাযোগ করবে। নইলে বুঝি সে পাগল হয়ে যাবে।

তাই একদিন সে করলো কি, তার বাবা কাঠ কাটতে যখন গভীর জংগলে গেল, সে তার মার কাছে গিয়ে বললো: 'মা, আমি তো এতকাল বন-জংগলের মধ্যেই বড়ো হলাম। শুধু গাছ-গাছড়াই দেখলাম। পাখি-পক্ষীর ডাকই শুনলাম। কিছুদিনের জন্যে আমি এবার বাইরে যেতে চাই। দুনিয়াটাকে একটু দেখতে চাই?'

'বেশ তো, তুমি যদি যেতে চাও বাছা, যাও। আমি বাদ সাধবো না। ভগবান তোমার মংগল করুন।'

মা ছেলেকে আশীর্বাদ করলো। তারপর যাবার সময় বললো: 'একটু দাঁড়াও বাছা, একটা পিঠে সংগে দিই। তা, বড়ো পিঠে দেবো, না, ছোট পিঠে দেবো? বড়ো পিঠে হলে আমার আত্মা তোমায় অভিশাপ দেবে আর ছোট পিঠে হলে আশীর্বাদ।'

'না মা, আমায় বড়ো পিঠেই দাও। পেট ভরে তো খেতে পারবো।'

ছেলে বড়ো পিঠে নিয়ে রওনা হোল আর বুড়ী মাও ঘরে ঢুকে ছেলেকে শাপ-শাপান্ত করলো অনেকক্ষণ।'

এদিকে পথে দেখা বাপের সংগে ছেলের। বাবা তখন কাঠ নিয়ে বাড়ি ফিরছিলো। ছেলেকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো: 'কোথায় চলেছো, বাবা?'

ছেলে তখন বাবাকেও জবাব দিলো মার মতো। তাই শুনে বাবা বললো :

'বেশ, তুমি যদি যেতে চাও বাছা, আমি বাধ সাধবো না। নতুন দেশে যাবে, নতুন নতুন কত লোকের সংগে তোমার দেখা হবে, মোলাকাত হবে, ভালোই হবে। আমাদের কষ্ট হবে বটে, তা হোক, আমি বাধা দেবো না।'

বুড়ো বাবা ছেলেকে খুশি মনে বিদায় দিলো। ছেলে কিছু দূর এগিয়ে যেতেই বুড়ো বাবা কিন্তু তাকে আবার পেছন থেকে ডাকলো। বললো :

'নতুন দেশে যাচ্ছো, পথে-ঘাটে কোনো বিপদে পড়লে তখন এই কৌটোটির স্মরণ নিয়ো। বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে।'

এ বলে বৃদ্ধ তার বুক পকেট থেকে সোনামোড়া একটা নস্যির ছোটো কৌটো বার করে ছেলের হাতে দিলো। বললো : 'এটা রেখে দাও। যখন খুব বিপদে পড়লে তখন একটা বার করো। বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে।'

বাপের দেওয়া নস্যির কৌটোটা পকেটে পুরে জ্যাক আবার পথ ধরে চলতে শুরু করলো। সে চলেছে তো চলেছে। এ চলার যেন শেষ নেই। এ দিকে সূর্য কখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লো সে জানতেও পারলো না। দেখতে দেখতে রাতও ঘনিয়ে এলো।

হঠাৎ একসময় তার নজরে পড়লো, কিছুদূরে একটা আলো বুঝি জ্বলছে পথের ধারে। আলোর শিখা ধরে জ্যাক এগিয়ে গেল অন্ধকারে। গিয়ে দেখে প্রকাণ্ড একটা বাড়ির পেছন দিককার একটা জানলা দিয়ে আলোর রেখা ঠিকরে আসছে। সে দরজায় আঘাত করতে দরজাটা খুলে গেলো। আর তা দিয়ে বেরিয়ে এলো বাড়ির একটি ঝি। সে এসে জানতে চাইলো, জ্যাক কি চায়? কেন এসেছে?

জ্যাক তখন তাকে জানালো, রাত কাটাবার জন্য সে একটুখানি আশ্রয় চায়। কিছুটা খাবারও। খিদে পেয়েছে।

তাই শুনে ঝিটি জ্যাককে রান্নাঘরে গিয়ে নিয়ে পেটভরে নানান খাবার খেতে দিলো ; মদও এনে দিলো পান করতে। আগুনের সামনে বসে জ্যাক যখন খাচ্ছিলো, ঝিটি তখন ছুটে গিয়ে তার দিদিমণিকে ডেকে

আনলো। বললো :

'দেখে যাও, দিদিমণি, ভিন-দেশী এক যুবক এসেছে আমাদের বাড়িতে।'

'কোথায় ?'

'রান্নাঘরে বসে এখন খাওয়া-দাওয়া করছে। কতদিন বুঝি খায়নি।'

'তাই নাকি ? চলতো দেখে আসি।'

দিদিমণি ঝির সংগে নিচে নেমে এলো। জ্যাক রান্নাঘরে বসে তখনও খাচ্ছিলো। জ্যাকের সংগে তার আলাপ হোল। ভাবও হয়ে গেলো দু'জনের। দিদিমণি জ্যাককে দেখে ভালবেসে ফেললো। জ্যাকও।

মেয়ে তখন একসময় উপরে গিয়ে বাবাকে ডেকে আনলো। কর্তাবাবুও জ্যাককে দেকে খুশি হলেন। একসময় প্রশ্ন করলেন : 'তা, তোমার জন্য আমি কী করতে পারি ?'

জ্যাক অতশত বোঝে নি। ভাবলে, কর্তাবাবু বুঝি তাকে জিজ্ঞেস করছেন : সে কি কি কাজ করতে পারে ? তাই সে বলে বসলো :

'সবই পারি কর্তা। যা বলবেন তাই করে দিতে পারি।'

'যা বলবো তাই করতে পারো ? কর্তা-বাবু জ্যাককে আবার শুধালেন।—'বেশ, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে যেন দেখতে পাই আমাদের বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড একটা লেক আর তাতে আনা-গোনা করছে বড়ো-বড়ো সব যুদ্ধজাহাজ। যে জাহাজটি সব চাইতে বড়ো তা থেকেই যেন প্রভাতী তোপ দাগানো হয়। আর যে তোপটি সর্ব শেষ দাগানো হবে তার আওয়াজে যেন আমার মেয়ের পালঙ্কের শেষ পায়াটা ভেঙে যায়। এ যদি করতে না পারো তোমার কিন্তু গর্দান যাবে, বলে রাখলাম।'

'ঠিক আছে, কর্তা। আমি তাই করবো।'

জ্যাক জবাব দিলো। তাই শুনে কর্তাবাবু ঘুমুতে গেলেন আশ্বস্ত হয়ে।

এদিকে জ্যাক তো খুব আশ্বাস দিলো কর্তাবাবুকে। কিন্তু মাঠের মাঝখানে রাতারাতি সে প্রকাণ্ড লেক বানায় কী করে ? শুধু প্রকাণ্ড লেক নয়, তাতে আবার যুদ্ধজাহাজও থাকা চাই। এবং যুদ্ধজাহাজ থেকে কামান দাগিয়ে দিদিমণির পালঙ্কের একটা পায়াও উড়িয়ে দেওয়া চাই।

অসাধ্য এ-কাজ সে এখন সাধন করে কী করে? বুক ফেটে তার কান্না এলো। আর হুকুম মতো কাজ করতে না পারলে গর্দান দিতে হবে। মৃত্যু অনিবার্য। সে তবু বিছানায় গিয়ে ঠাকুরের নাম করতে লাগলো। এক সময় তার মনে পড়লো বাবার দেওয়া ছোট সেই নস্যির কৌটোটার কথা। 'যখনই মহা বিপদে পড়বে—মৃত্যুর কাছাকাছি এসে দাড়াবে, তখন কৌটোটার স্মরণ নিও।' বাবার শেষ কথাগুলি তার মনে পড়লো। সে তাই বাবার দেওয়া সোনা-মোড়া নস্যির কৌটোটা পকেট থেকে বার করলো। কৌটোটা খুলতেই নস্যির-তিনটা কণা গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। আর তা থেকে সংগে সংগে গজিয়ে উঠলো ক্ষুদে ক্ষুদে তিনটা দানব।

ক্ষুদে দৈত্য তিনটি জ্যাককে অভিবাদন জানিয়ে বলে উঠলো:

'বলুন, আমাদের কী করতে হবে?'

জ্যাক তখন কর্তাবাবুর মর্জিমতো বাড়ির সামনে মাঠের মাঝখানে বানাতে হবে লেক আর তাতে আনা-গোনা করবে যুদ্ধজাহাজ। সব চাইতে বড়ো জাহাজটি থেকে প্রভাতী তোপ দাগতে হবে আর শেষের তোপটি এমন প্রচণ্ড আওয়াজ তুলবে যাতে দিদিমণির পালঙ্কের পেছনের পায়াটি ভেঙে যাবে। —ইত্যাদি সব বললো।

'যে আজ্ঞে, হুজুর। তাই হবে। আপনি এখন ঘুমাতে যান।'

জ্যাক নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে গেল। সকাল আটটা বাজতে-না-বাজতে ঘুম তার ভেঙে গেলো তোপের ধ্বনিতে। ধড়ফড় করে সে উঠে বসলো বিছানায়। জানলা দিয়ে দেখে বাড়ির সামনেই সৃষ্টি হয়েছে প্রকাণ্ড একটা লেক আর তাতে আনাগোনা করছে হরেক রকমের যুদ্ধ-জাহাজ।

তাই দেখে জ্যাকের খুব আনন্দ হোল। কেন না, সে তো এতদিন কেবল বন জংগলের গাছপালাই দেখে আসছে। এমন দৃশ্য কোনোদিন সে দেখে নি।

সে তাই তাড়াতাড়ি তার পোশাক পরে নিলো। তারপর আর আর দিনের মত ঠাকুরের নামও করলো। প্রার্থনা সেরে সে তখন কর্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলো। কর্তাবাবুও তার খোঁজে আসছিলেন। জ্যাককে দেখে খুশি হয়ে বললেন:

'তুমি তো বেশ চালাক-চতুর সাবাস ছেলে দেখছি। কী সুন্দর লেক আর যুদ্ধজাহাজ বানালে রাতারাতি। তোমার সংগে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো, এখন চলো, চা খেয়ে আসি!'

কর্তাবাবু জ্যাককে নিয়ে চায়ের টেবিলে চললেন। যেতে যেতে আরও বললেন: 'বিয়েব আগে তোমাকে কিন্তু আরও দুটি কাজ করতে হবে, বাহাদুর ছোকরা!'

'হ্যাঁ, করবো': জ্যাক জবাব দিলো। সামনা-সামনি খেতে বসে সে দিদিমণির দিকে একসময় তাকালো। একটা চোখ বুঁজে মেয়েটিও তার জবাব দিলো জ্যাকের দিকে তাকিয়ে তেরচা ভাবে।

সে যাক, কিশোব-কিশোরীর মন দেয়া-নেয়ার কথা আমি এখানে আর লিপিবদ্ধ করছি না। কর্তাবাবুর কথারই জের টেনে চলছি। তিনি জ্যাককে ডেকে আবার হুকুম করলেন:

'সামনে এক মাইলের মধ্যে যেখানে যত গাছ-পালা আছে সবই কেটে ফেলতে হবে কাল সকাল আট-টার মধ্যে। আর সে জায়গায়—মস্ত বড়ো এক দুর্গ বানিয়ে দিতে হবে। দুর্গটিব ১২টি খিলান হবে সোনা দিযে মোড়া। শুধু দুর্গ তৈরি করলেই হবে না। তাতে দলে দলে সৈন্য-সামন্তও চাই। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা রোজ কুচ-কাওয়াজ করবে! ঘোড়-সওয়াররা সব যাবে মার্চ করে।'

'বেশ তাই হবে।'

জ্যাক তার বাবার নস্যির কৌটোর দৌলতে কর্তাবাবুর শেষ দুই ইচ্ছাও পূরণ করলো। কর্তাবাবুও তাঁর কথা মতো চতুর্থ দিনের দিন জ্যাকের সংগে মেয়ের যথারীতি বিয়ে দিয়ে দিলেন মহা ধুম-ধাম করে।

কিন্তু হায়, জ্যাকের কপালে বুঝি সুখ নেই।

বিয়ের হৈ-চৈ ধুম-ধাম কেটে উঠতে না উঠতেই কর্তাবাবুর খেয়াল হোল, তিনি শিকারে যাবেন বন্ধু-বান্ধব পাত্র-মিত্র সবাইকে নিয়ে। এ উদ্দেশ্যে দেশবিদেশের কর্তাব্যক্তিদেরও শিকারে যাবার নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন।

নতুন জামাইকেও সংগে যেতে হোল।

তাই জ্যাক শিকারে যাবার নতুন পোশাক নিলো তৈরি করে।

তেজী এটা নতুন ঘোড়াও। শিকারে যাবার নতুন পোশাক পরে, নতুন ঘোড়ায় চেপে টগ-বগিয়ে সেও চললো শিকারে।

এদিকে হয়েছে কি, নতুন পোশাক পরে শিকারে যাবার আনন্দে জ্যাক তার বাবার দেওয়া নস্যির কৌটোটার কথা বিলকুল ভুলে গেল। কৌটোটা যে তার পুরোন জামার পকেটে রয়ে গেছে সে খেয়াল নেই তার। এদিকে জ্যাকের ছোকরা চাকরটা মুনিবের ছাড়া পোশাক গুছিয়ে রাখতে গিয়ে নস্যির কৌটোটা দেখতে পেলো পকেটের মধ্যে। জামার পকেট থেকে কৌটোটা বার করে তা খুলতেই তা থেকে টুক করে বেরিয়ে পড়লো তিন তিনটে সেই ক্ষুদে দৈত্য।

দৈত্য দেখে ছোকরা চাকর কিন্তু ভড়কে গেলো।

দৈত্য তিনটি তবু তাকে কুর্নিশ করে বলে উঠলো: 'ভয় নেই। আমরা অনিষ্ট করবো না। আমাদের উপর কী নির্দেশ?'

ছোকরা চাকরটা বুঝি কিছুটা ধাতস্থ হোল। তবু ভয়ে ভয়ে বললো: 'আচ্ছা, তোমরা এ দুর্গটা হটিয়ে নিতে পারবে?'

'কোথায়?'

'অনেক দূরে। সেই সাগরপারে?'

'পারবো বই কি? তুমিও কি যেতে চাও!'

'হ্যাঁ।'

'তবে দুর্গে গিয়ে চুপটি মেরে বসো। আমরা নিয়ে যাচ্ছি।'

এই বলে ক্ষুদে দৈত্য তিনটি সৈন্যসামন্ত শুদ্ধু প্রকাণ্ড দুর্গটাকে নিয়ে চললো মাথায় করে। আর নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলো দূর সাগরপারে।

চক্ষের নিমিষের মধ্যে কি ঘটে গেলো কেউ টেরও পেলো না।

এদিকে শিকারীর দল বিস্তর পশু পাখি, জন্তুজানোয়ার শিকার করে ফিরে এসে দেখে কোথায় দুর্গ? কোথায় তাদের আস্তানা। দুর্গের চিহ্নটিও নেই। এমন কি সোনামোড়া তার বারোটি খিলান পর্যন্তও উধাও। লেকের পারটিই শুধু খাঁ-খাঁ করছে।

সবাই জ্যাককে ঘিরে ধরলো। বললো: 'সবই তোমার বুজরুকি!' আমাদের দুর্গ কোথায় বলো। নইলে তুমি রেহাই পাবে না। তোমার বৌকে তোমার সঙ্গে যেতে দেবো না।'

কর্তাবাবু এসে ওকে বাঁচালেন। বললেন: 'ওর উপর তোমরা চোট-

পাট করছো কেন ? ও তো আমাদের সঙ্গেই ছিলো। দুর্গটা গেলো কোথায় তা বরং ওকে খোঁজ করতে দাও।'

তিনি এবার জ্যাকের দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন ঃ

'তোমাকে আমি পুরো এক বছর এক দিন সময় দিলাম। দুর্গটা গেলো কোথায় খোঁজ করে দেখো।'

জ্যাকও রাজি হোল। রাজকোষ থেকে একরাশ টাকা নিয়ে তেজী ঘোড়া একটা বেছে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো হারানো দুর্গের সন্ধানে।

হাট-মাঠ-ঘাট, বন-বনান্তর কত সে পার হয়ে এলো, কিন্তু কোথাও দেখতে পেলো না দুর্গটি। চোখে পড়লো না তার উঁচু গম্বুজটি।

তবু কিন্তু বিরাম নেই তার চলার।

চলতে চলতে একদিন সে এসে থামলো নেংটি ইঁদুরদের রাজ্যে। নতুন দেশে ঢুকে জ্যাক তো রাজবাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল। পাহারারত এক নেংটি ইঁদুর তার পথ আগলে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো :

'কোথায় যাচ্ছেন ?'

'মূষিক রাজার কাছে।'

জ্যাক মূষিক রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাইলো। মূষিকরাজ তাকে ডেকে পাঠালেন। জ্যাক মূষিকরাজকে সব কথা জানালো। সব শুনে মূষিকরাজ বললো ঃ

'আমি হলাম নেংটি ইঁদুরদের রাজা। কাল সকালে আমি সবাইকে ডেকে পাঠাবো। জিজ্ঞেস করবো, দুর্গটাকে কেউ দেখেছে কিনা। কেউ-না-কেউ দেখতে পারে।'

রাজা জ্যাককে রাত্রে পেট ভরে খেতে দিলো। ধবধবে বিছানা দিলো ঘুমুতে। পরদিন সকালে রাজা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো মাঠে। মাঠের মাঝখানে গিয়ে শিস কেটে রাজা সব মূষিকদের ডাকলো। এবং জিজ্ঞেস করলো ঃ 'কেউ সোনা-মোড়া বারো খিলানের দুর্গটি দেখেছে কিনা।'

সবাই কিন্তু মাথা নেড়ে 'না' জানালো একবাক্যে।

তাই শুনে রাজা জ্যাককে বললো ঃ 'তুমি এককাজ করো। আমার আরও দু'ভাই আছে। আমার ছোট যে সে হোল রাজ্যের সব ব্যাঙদের

রাজা। আর যিনি বড়ো তিনি হলেন পাখিদের রাজা। তাদের কাছে গেলে ওরা ঠিক তোমায় হদিশ দিতে পারবে।'

'বেশ, তাই যাবো।'

জ্যাক মূষিকরাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আবার রওনা হোল। যাবার সময় পাহারাদার সেই নেংটি ইঁদুরটি জ্যাককে বললো :

'আমাকেও আপনার সঙ্গে নিন।'

'সে কি। তুমি আবার কোথায় যাবে আমার সঙ্গে?'

'তা হোক, আমায় সঙ্গে নিন। বিপদ-আপদে আপনার অনেক কাজে লাগবো।'

জ্যাক আর না করলো না। বললো :

'বেশ, যদি যেতে চাও চলো। ঘোড়ার উপর উঠে পড়ো লাফিয়ে।'

নেংটি ইঁদুরটাকে পকেটে পুরে জ্যাক ঘোড়া ছুটিয়ে চললো তো চললো— চললো তো চললো—এ চলার যেন শেষ নেই।

চলতে চলতে একদিন সে ব্যাঙের দেশে এসে হাজির হোল। ব্যাং রাজার প্রাসাদে যেই সে প্রবেশ করতে যাবে, অমনি কোত্থেকে প্রকাণ্ড একটা ব্যাং বন্দুক-ঘাড়ে লাফাতে লাফাতে এসে পথ আগলে ধরলো তার।

সান্ত্রী-ব্যাং যেই শুনলো জ্যাক মূষিকরাজের কাছ থেকে আসছে, ব্যাং রাজার সঙ্গে দেখা করতে চায় তখন আর সান্ত্রী-ব্যাং আপত্তি করলো না। রাজবাড়িতে তাকে যেতে দিলো।

জ্যাক ব্যাংরাজার সঙ্গে দেখা করে তাকে সব কথা জানালো। তাই শুনে ব্যাংরাজ বললো : 'আচ্ছা, আমি রাজ্যের সব ব্যাংদের ডেকে পাঠাচ্ছি। বলে দেখি ওরা কেউ সোনা-মোড়া বারো খিলানের দুর্গটাকে দেখেছে কিনা।

এ বলে ব্যাংরাজা মাঠে নেমে গাল ফুলিয়ে ক্র্যাকো-ক্র্যাকো করে বিকট একটা আওয়াজ করলো। আর তাই শুনে রাজ্যের ব্যাং যত সব এসে জড়ো হোল লাফাতে লাফাতে।

ব্যাংরাজ তাদের সোনা-মোড়া খিলান-ওয়ালা দুর্গের কথা জিজ্ঞেস করলো। তাই শুনে ব্যাংগুলি সব গলা ফুলিয়ে এক বাক্যে ডেকে উঠলো : গ্যাঙ্ঙো—'গ্যাঙ্ঙো—।—না—না। দেখিনি—দেখিনি।'

জ্যাক আবার চললো দুর্গের সন্ধানে। এবার পক্ষীরাজের দেশ।

জ্যাক তখন নতুন আর একটা ঘোড়া নিলো আর সংগে নিলো পক্ষীরাজের জন্য একটা পিঠে। পিঠেটা বেঁধে সে যখন ফটক দিয়ে যাচ্ছিলো তখন সান্ত্রী সেই ব্যাঙটি তাকে দেখতে পেয়ে বললো : সেও যাবে জ্যাকের সংগে।

জ্যাক আপত্তি জানালো। বললো : 'আমাকে এখন কত দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হবে দুর্গের সন্ধানে, নাওয়া-খাওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা থাকবে না। তুমি আবার কোথায় যাবে আমার সংগে ?'

'নিন আমাকে সংগে, সান্ত্রী-ব্যাং পীড়াপিড়ি করতে লাগলো। বললো : 'আমি ব্যাং হলেও দেখবেন, বিপদে-আপদে আপনার অনেক কাজে লাগবো, আমায় সংগে নিন।'

'বেশ, চলো। ঘোড়ার উপর উঠে পড়ো।'

সান্ত্রী-ব্যাংটিও তাই করলো। এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়লো। জ্যাক তাকে ধরে নিজের ওয়েস্ট কোটের পকেটের মধ্যে রেখে দিলো। তারপর ঘোড়া দিলো ছুটিয়ে।

তিন দিনের দিন ঘোড়া এসে থামলো পক্ষীরাজের দেশে। পক্ষী-রাজ হোল তিন ভাইদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো। দেশ-বিদেশের নানান পাখিদের নিয়ে রাজ্যও তার বেশ প্রকাণ্ড।

সুন্দর একটি পাখি রাজপুরী পাহারা দিচ্ছিলো। জ্যাককে সে কোনো বাধা দিল না। জ্যাক তাই নিজে রাজার কাছে গিয়ে সব কথা জানালো। সংগের পিঠে খানাও পক্ষীরাজকে খেতে দিলো।

পক্ষীরাজ খুবই খুশি হোল। জ্যাককে আদর-আপ্যায়ন করলো খুব। সকাল হলে ওকে নিয়ে গেলো মাঠে। আর গলা ফুলিয়ে দীর্ঘ একটা আওয়াজ করলো। তাই শুনে রাজ্যের হরেক রকমের পাখিরা সব এসে হাজির হোল পক্ষীরাজের সামনে।

পক্ষীরাজ একে একে সবাইকে বারো খিলানের সোনা-মোড়া দুর্গের সন্ধান কিছু জানে কিনা জিজ্ঞেস করলো। ওরা কিন্তু নিজেদের অক্ষমতার কথা জানালো। বললো ঃ তারা দেখে নি কোথাও।

'তবে ঈগল পাখিকে একবার খবর দাও। ওই ঠিক খবর আনতে পারবে।'

পক্ষীরাজ-এর হুকুমনামা নিয়ে একদল পাখি অমনি উড়ে গেলো ঈগল পাখির খোঁজে। ঈগল পাখি এলে রাজা তাকে হারানো দুর্গের

কথা জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, দেখেছি বই কি! আমি তো ওখান থেকেই আসছি এখন।'

পক্ষীরাজ তখন জ্যাককে দেখিয়ে বললো ঃ 'দেখো বাপু, ও দুর্গটা ওরই। দুর্গটা যাতে ও আবার ফিরে পায় তার ব্যবস্থা করো। তুমি বরং ওকে তোমার পিঠে করে নিয়ে যাও। যাবার আগে কিছু খেয়ে নাও।' একটা চোর-পাখিকে বধ করে পক্ষীরাজ ঈগল পাখিকে খেতে দিলো। বললো ঃ

'পেট ভরে খেয়ে নাও। অনেকখানি পথ তোমাকে যেতে হবে।'

ঈগল পাখি চোর-পাখির মাংস দিয়ে দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করলো। তারপর জ্যাককে পিঠে করে নিয়ে চললো কত পাহাড়-পর্বত নদ-নদী-সাগর ডিঙিয়ে—বারো খিলানের দুর্গের সন্ধানে।

উড়তে উড়তে এক সময় ঈগল পাখি দুর্গের সোনালী গম্বুজটা দেখতে পেলো। তখন সকলের আনন্দ আর দেখে কে? দুর্গের সন্ধান তো পাওয়া গেলো। এখন এ দুর্গকে তাদের দেশে নিয়ে যায় কী করে? কর্তাবাবুর কাছে সে যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এক বছর এক মাসের মধ্যে দুর্গটিকে ফিরিয়ে দেবে বলে। তার নস্যির কৌটোটি যদি আজ থাকতো!

জ্যাককে আকাশ-পাতাল ভাবতে দেখে নেংটি ইঁদুরটি টুক করে পকেট থেকে বেরিয়ে এলো। বললো :

'অতো ভাবছো কেন বন্ধু? আমাকে দুর্গের কাছে কোথাও ছেড়ে দাও। আমি তোমার নস্যির কৌটোটা খুঁজে আনছি।'

জ্যাক তাই করলো। নেংটি ইঁদুরটিকে দুর্গের কাছে ছেড়ে দিলো। ইঁদুরটিও অমনি একটা খাদের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়লো দুর্গের মধ্যে। কিন্তু সেই যে ঢুকলো ইঁদুরটি, দুর্গ থেকে বেরুবার আর নাম নেই। নস্যির কৌটোরও কোনো পাত্তা নেই। এদিকে দিন গেলো রাতও শেষ হয়ে এলো। এমন সময় ছুটতে ছুটতে নেংটি ইঁদুর এসে হাজির। মুখে তার সোনা-মোড়া নস্যির সেই কৌটো।

তাই দেখে সকলের মনে আনন্দ আর ধরে না। নস্যির কৌটোটা নেবার জন্যও নিজেদের মধ্যে পড়ে গেলো হুটোপুটি। আর এরই মাঝ-খানে নস্যির কৌটোটি এক সময় টুক করে পড়ে গেলো নেংটি ইঁদুরের মুখ থেকে। আর গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়লো সমুদ্রের জলে। প্রকাণ্ড একটা ঢেউ এসে ওটাকে তারপর নিয়ে গেলো সমুদ্রের মধ্যিখানে।

জ্যাক এবার কান্নায় ফেটে পড়লো। কত সাধ্যসাধনা করে নস্যির কৌটোটার যা একবার সন্ধান পাওয়া গেলো তাও হোল হাত-ছাড়া।

তাই দেখে গাল-ফোলা ব্যাংটি ক্যাঁকো-ক্যাঁকো করে ডেকে উঠলো। বললো: 'অতো ভাববার কী আছে? দাও আমায় সমুদ্রের জলে নামিয়ে, আমি এক্ষুণি তোমার নস্যির কৌটো খুঁজে আনছি।'

এ বলে গাল-ফোলা ব্যাং ঝাঁপ দিলো সমুদ্রের জলে। আর দেখতে দেখতে হারিয়ে গেলো ঢেউ-এর নিচে।

এদিকে একদিন, দুদিন, তিন দিন তিন রাত্রি হয়ে গেলো, ব্যাং যে সেই জলে ডুব দিলো, আর তার দেখা নেই। চার দিনের দিন হুস করে ভেসে উঠলো ব্যাংটি।

ব্যাংকে ভেসে উঠতে দেখে একসঙ্গে সবাই প্রশ্ন করলো: 'কি, পেলে সন্ধান?'

'না, পাইনি এখনো' ব্যাং জবাব দিলো। বললো: 'দম নিতে উঠলাম। আবার যাচ্ছি খুঁজতে।'

এই বলে ব্যাং আবার ডুব দিলো জলের নিচে। তিন দিনের দিন ব্যাং আবার জলের উপর ভেসে উঠলো। মুখে তার নস্যির কৌটো।

কৌটো পেয়ে সবাইয়ের আনন্দ আর ধরে না। জ্যাক সোনা-মোড়া নস্যির কৌটোকে নিয়ে খুলতেই ক্ষুদে সেই দৈত্য তিনজন আবার বেরিয়ে এসে তাকে অভিবাদন জানালো। বললো: 'হুকুম করুন হুজুর, কি করতে হবে?'

'এ দুর্গটাকে আবার লেকের পারে নিয়ে যাও': হুকুম করলো জ্যাক।

ক্ষুদে দৈত্যরা তাই করলো চক্ষের নিমিষের মধ্যে। দেখতে দেখতে বারো খিলানের দুর্গটি যথাস্থানে মাথা তুলে দাঁড়ালো লেকের পারে। বুড়োকর্তা ছুটে এসে জ্যাককে জড়িয়ে ধরলেন। দিদিমণিও ছুটে এলো। চার চক্ষের মিলন হলো।

নষ্টেরগোড়া জ্যাকের ছোকরা চাকরটা গেল কোথায়?—খোঁজ খোঁজ। তাকে খুঁজে পাওয়া গেল জিপসি পাড়ায়। আর নিয়ে এসে লটকানো হোলো ফাঁসিতে।

১৯

এক ছিলেন এক 'বড়া রাই'—বড়ো লোক। একদিন তিনি বাড়ি ফিরছিলেন বনের পথ ধরে গাড়ি করে। গাড়িখানা তাঁর পথের ধারে এক খানার মধ্যে পড়ে গেলো। জল-কাদা-পাঁকের মধ্যে তিনি আটকে গেলেন। এমনিভাবে আটকে গেলেন যে, তিনি পারলেন না গাড়িখানা টেনে তুলতে কিংবা মুক্ত করতে নিজেকে পাঁক থেকে।

অনেক দিন গেলো এমনি করে।

এদিকে ঘরে তাঁর স্ত্রী এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তিনি যে ছেলের বাবা হলেন সে খবরও তাঁর কাছে পেঁছালো না।

এখন হয়েছে কি, এক দৈত্য যাচ্ছিলো বনের ওই পথ দিয়ে। সে 'বড়া রাই'-কে খানার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে ছুটে গিয়ে তাকে খানা থেকে তুলতে গেলো। বললো :

'আচ্ছা, তোমাকে যে খানা থেকে টেনে তুলবো তার বিনিময়ে তুমি আমায় কি দেবে ?'

'যা চাইবে তাই পাবে।'

'ঘরে তোমার কি কি আছে ?'

'ঘোড়া আছে, গরু আছে।'

'যদি বলি যা তুমি এখনও দেখ নি, তাও দেবে ?'

'হ্যাঁ, দেবো।'

'উঁহু, তার আগে লিখিত একটা চুক্তি করা যাক।'

এই বলে দৈত্য 'বড়া রাই'-যের সঙ্গে লিখিত একটা চুক্তি করলো। তারপর তাঁকে পাঁক থেকে টেনে তুললো গাড়ি শুদ্ধ।

খুশি হয়ে বড়োলোক বাবু বাড়ি চললেন। আর বাড়ি এসে দৈত্যের সঙ্গে চুক্তির কথা বেমালুম গেলেন ভুলে।

এদিকে বিশ বছর কখন কেটে গেছে। ছেলে তাঁর এখন বড়ো হয়েছে। একদিন সে মাকে গিয়ে বললো : 'মা, আমি বাইরে যাচ্ছি। আমাকে একটা-পিঠে বানিয়ে দাও। বাবার চুক্তি মতো আমাকে বেগার

খাটতে হবে।'

মায়ের দেওয়া পিঠেখানা নিয়ে ছেলে চললো বনের পথ ধরে। চলতে চলতে এক সময় সে দৈত্য-বাড়ির সামনে এসে থামলো। তাকে দেখতে পেয়ে দৈত্য বাড়ি থেকে এক বুড়ি বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলো : 'কী চাও, বাছা ?'

'আমি বাড়ির কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি তাঁর বেগার খাটতে এসেছি।'

ওর গলা শুনে দৈত্যের মেয়েও বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। আর মুগ্ধ হয়ে গেলো ওকে দেখে। নিজের পরিচয় দিয়ে বললো :

'আমি এ বাড়ির মেয়ে, যা বলি শোন। বাবা তোমায় দেখে অমনি একটা ঘোড়া হয়ে যাবে। আর তোমাকে বলবে ঘোড়সাওয়ার হতে। তুমি তাই হয়ো।'

দৈত্য-বাড়ির মেয়েটি একটু থামলো। আবার বললো :

'ঘোড়ায় চড়ার আগে হাতে একটা লোহার-মুগুর নিও। লোহার নাল-লাগানো বুট পরতেও ভুলো না যেন। ঘোড়ায় চেপে লোহার মুগুর দিয়ে ঘোড়াটার মাথায় বার-বার আঘাত করো। নইলে দু' পা তুলে সে তোমায় আছড়ে ফেলে দেবে। মেরে ফেলবে একেবারে।'

ছেলেটি তাই করলো। কর্তা এসে ঘোড়া হতেই সে তার পিঠে চেপে বসলো। ঘোড়াটা সামনের দু' পা তুলে আছড়ে তাকে ফেলে দিতে গেলো। সে কিন্তু লোহার মুগুর দিয়ে পিটিয়ে তাকে ঢিট করলো। তারপর এখানে-ওখানে নানা স্থান ঘুরে দৈত্যপুরীতে ফিরে এলো। আর ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখলো সে। তারপর দৈত্য-কন্যার সঙ্গে দেখা করলো।

দৈত্য-কন্যা ওকে দেখে খুব খুশী হোল। বললো : 'তোমাকে তা হ'লে পিঠ-থেকে ফেলে দেয় নি ?'

'না।'

দৈত্য কিন্তু ওকে আবার ডেকে পাঠালো।

এক পাত্র পোস্ত-দানা ঢেলে দিল ঘাসের উপর। বললো : 'দানাগুলো ঘাস থেকে বেছে নাও। নইলে আমি গর্দান কেটে তোমার টুকরো টুকরো করবো।'

দৈত্য ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ছেলেটি দুকড়ে কেঁদে উঠলো। তাই শুনে মেয়েটি ছুটে এলো। জিজ্ঞেস করলো ঃ

'কাঁদছো কেনো গো ?'

ঘাসের উপর ছড়ানো পোস্তর দানাগুলো দেখিয়ে ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে বললো ঃ 'ঘাস থেকে পোস্তর দানাগুলি এখন ছাড়াই কী করে বলো তো। আর ছাড়াতে না পারলে তোমার বাবা আমায় কেটে টুকরো টুকরো করবে।'

'ঠিক আছে, তুমি কেঁদো না, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

এই বলে মেয়েটি দুটি আংগুল তার পুরে দিল মুখের মধ্যে আর শিস কাটলো তিন তিনটি। তাই শুনে রাজ্যের যত সব নেংটি ইঁদুর ছুটে এলো কিচমিচ শব্দ করতে করতে।

ওরা এসে দৈত্য-কন্যাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'নির্দেশ দিন দিদিমনি, কি করতে হবে আমাদের।'

'পোস্তর দানাগুলি খুটিয়ে খুঁটিয়ে তুলে রাখো ঐ পাত্রটার মধ্যে।'

ইঁদুর গুলো তাই করলো। পোস্তর দানাগুলি একটি একটি করে বেছে নিয়ে ভর্তি করে রাখলো এক পাত্রে।

এ-দিকে দৈত্য বাড়ি ফিরে দেখে পোস্তর দানাগুলি সব ঘাস থেকে বেছে রাখা হয়েছে। একটা দানাও বাইরে পড়ে নেই। তাই দেখে দৈত্য বললো ঃ

'তুমি দেখছি বেশ চালাক চতুর ছোকরা! যা বলেছি তাই তামিল করেছো ঠিক ঠিক।'

দৈত্য একটু থামলো। আবার বললো ঃ 'তোমাকে এবার আর একটা কাজ করতে হবে। ওই যে সামনে যে জলা জমিটা দেখতে পাচ্ছো, ওটার সবটা জল সেঁচে ফেলবে। আর তাতে চাষ করবে ভুট্টোর। কাল সকালেই যেন পাকা ভুট্টোর খৈ খেতে পারি আমি। নইলে তোমার গর্দান নেবো।'

দৈত্য তো বলে খালাস। কিন্তু রাতারাতি ভুট্টোর চাষ করে ভুট্টো ফলিয়ে সেই ভুট্টোর খৈ খাওয়া কী সম্ভব ?

বুক ফেটে তার কান্না এলো। চোখ মুছতে মুছতে সে আবার দৈত্য-কন্যার কাছে গিয়ে উপস্থিত হোল। আর বললো তাকে সব কথা।

তাই শুনে দৈত্য-কন্যা তাকে আবার আশ্বাস করলো, বললো : "তুমি ভেবো না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।"

এ বলে সে জ্বলন্ত একটা চাবুক নিয়ে এলে কোত্থেকে। আর চাবুকটা দিয়ে জলা জমিতে আঘাত করতেই জলটা তার শুকিয়ে গেলো। দ্বিতীয়বার চাবুক দিয়ে আঘাত করতেই জমিটায় ভুট্টোর চারা গজিয়ে উঠলো। তৃতীয়বার আঘাত করতেই ভুট্টোর চারাগুলি দেখতে না দেখতে বড়ো হয়ে গেলো আর পাকাপাকা ভুট্টোয় নুয়ে পড়লো। আর একবার আঘাত করতেই গাছের পাকা ভুট্টোগুলো ভাজা খৈ হয়ে গেলো। আব তাই সকাল বেলা ছেলেটা দৈত্যকে দিলো খেতে।

মেয়েটি তখন ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো :

'দ্যাখো, আমাদের তিন বোনকে একই রকম করে সাজিয়ে-গুছিয়ে তোমায় বলবে এবার বেছে নিতে আমরা কে, কোন বোন। বলতে না পারলে বাবা নেবে তোমার গর্দান।'

মেয়েটি এবার থামলো। আবার বললো : 'তুমি কিন্তু ঘাবড়ে যেয়ো না। আমি সকলের আগে আগেই থাকবো। আর একটা পা আর একটা পায়ের উপর তুলে নাচাতে থাকবো। মেজো বোন থাকবে মাঝখানটায় আর বড় দিদি তোমার মুখো-মুখি। বুঝলে, তোমার কোন অসুবিধে হবেনা চিনতে।'

দৈত্য-কন্যার কথামত সে তাই করলো। আর ভালই ভালই এড়িয়ে গেলো এবারকার পরীক্ষাতেও।

দৈত্যটা এবার চটে গেলো রীতিমতো। বললো :

'দাঁড়া, তোকে আমি ঢিট করছি এবার। তোর মুরোদ কত দেখবো এবার।'

বনের গাছ পালা সব দেখিয়ে দৈতটা বলে উঠলো :

'এগুলো সব কাল সকালের মধ্যে কেটে রাখবি। সাজিয়ে রাখবি পরপর। নইলে তোর গর্দান যাবে। কেউ তোকে আর বাঁচাতে পারবে না বলে রাখলাম।'

ছেলেটি দৈত্য-কন্যার কাছে গিয়ে সব বললো। দৈত্য-কন্যা সব শুনে বললো : 'হ্যাঁ, এবার আর রক্ষে নেই। পালাও। বাঁচতে চাও তো পালাও।'

দৈত্য-কন্যা থেমে আবার প্রশ্ন করলো : 'আচ্ছা, তোমার বাপ-মা আছেন ?

'আছেন।'

'চলো, আমরা দুজন তাঁদের কাছে পালিয়ে যাই। আমার বাবা তোমাকে এবার মেরে ফেলবে। যাবার সময় একটা শান-পাথর সঙ্গে নিও আর নিও একখানা চিরুনী। আমি একখানা তোয়ালে নেবো সঙ্গে।'

তাই নিয়ে ওরা দু'জন বনের পথ ধরে বেরিয়ে পড়লো। তারপর শুরু করলো ছুটতে।

এদিকে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দৈত্য দেখে বনের একটা গাছও কাটা হয় নি। রাখা হয় নি কেটে কেটে সারি করে সাজিয়ে। তাই দেখে তার ভয়ানক রাগ হোল। সে তার মেয়ের নাম ধরে ডাকলো :

'পাজি, হতচ্ছাড়াটা গেলো কোথায় ? ডেকে আনো, আমি এক্ষুনি তার ঘাড় ভাঙব।'

দৈত্যটা গর্জাতে শুরু করলো।

'কী পালিয়েছে ? পালিয়েছে তো তোরা সব করছিলি কি ? যা, যেখান থেকে পারিস, ধরে নিয়ে আয়। ওদের আমি আজ ঘাড় মটকাবো।'

দৈত্য-বাড়ির লোকজন সব বেরুলো ওদের ধরবার জন্য। মেয়ে আর ছেলেটি যেই দেখলো তাদের ধরবার জন্য সবাই ছুটে আসছে, মেয়েটি তখন করলো কি তাড়াতাড়ি সে নিজেকে একখানা গম ক্ষেতে পরিণত করলো। আর ছেলেটাকে বানিয়ে দিলে এক চাষী। গমের চারাগুলি সে বুঝি তদারক করছে এক মনে। তাকে দেখে দৈত্যপুরীর লোকজন-সব বলে উঠলো :

'আচ্ছা কিসান ভাই, তুমি তো ক্ষেতের কাজ করছিলে। এ পথ দিয়ে একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে পালাতে দেখেছো ?'

'একটা ছেলে ? একটা মেয়ে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে দেখেছো ?'

'বাঃ-রে, দেখলাম না !'

'দেখলে ? তা কোন দিকে গেলো ?'

'সে কি এখন !'

'তবে কখন ?'

'আমি যে তখন আমার গমের ক্ষেতে লাঙলও দিইনি। সে কি আজকের কথা ?'

'তা, এখন যদি আমরা ছুটে যাই, তাদের ধরতে পারবো না ?'

'তা পারবে না, বাপু। ওরা যে চলে গেছে এখন অনেক দূর।'

দৈত্য-পুরীর লোকজন তখন একে অপরের মুখ চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগলো। নিজেরা তারপর ঠিক করলো :

'এখন মিছিমিছি শুধু ওদের পেছনে ছুটে গিয়ে কি হবে ? তার চাইতে চলো, কর্তাকে গিয়ে বলিগে ওরা চলে গেছে অনেক দূর।'

ওরা দৈত্য-পুরীতে ফিরে এসে সব জানালো কর্তাকে। কর্তাতো তাই শুনে রেগে আগুন।—

'চলে গেছে অনেকদূর! আহম্মকের দল! আরে বলি, পথে কাউকে দেখতে পেলি ?'

'হ্যাঁ কর্তা, এক চাষী-তার গমের ক্ষেতে চারা পুঁতছিলো।'

'ঠিক ধরেছি। যা ছুটে যা, বেশী দূর পালায় নি। ওই চাষীটাই হোল ছেলেটা আর গমের ক্ষেত হোল মেয়েটা। ধরে নিয়ে আয় দু'জনকে। আমি আজ তাদের রক্ত খাবো।'

দৈত্য-পুরীর লোকজন সব ছুটলো আবার ওদের ধরতে। ধেয়ে চললো শাঁ শাঁ করে আকাশ পাতাল বন বাদাড় সব কাঁপিয়ে।

তাই দেখে মেয়েটি অমনি এক ডিগবাজি খেলো চক্ষের নিমিষের মধ্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলো সে পুরোন এক গীর্জা। ছেলেটিকেও বললো : 'তুমিও এক ডিগবাজি খেয়ে তাড়াতাড়ি বনে যাও এক বুড়ো পাদরী।'

ছেলেটি তাই করলো। ডিগবাজি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে গেলো বুড়ো এক পাদরী সাহেব।

পথের ধারে পাদরী সাহেবকে দেখতে পেয়ে দৈত্য-পুরীর দল-বল সব তাকে ঘিরে ধরলো। শুধালো :

একটি ছেলে ও একটা মেয়েকে তিনি এ পথ দিয়ে যেতে দেখেছেন কিনা।

তাই শুনে পাদরী বলে উঠলেন : 'সে আর দেখিনি ! একটি ছেলে আর সুন্দর একটি মেয়ে তো। ওরা তো আমার চোখের উপর দিয়েই গেলো।'

'তাই নাকি ? কখন গেল ? কত দূর গেলো ?'

'সে কি আজকের কথা ?' বুড়ো পাদরী পুরোন কথা বুঝি স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন। —'আমি তো তখন এ গীর্জাটা সবে তৈয়েরি করছিলাম। তা অনেকদিন হোল বটে।'

'অনেকদিন হয়েছে ?

'তা হয়েছে।' পাদ্রী পাকা দাড়ি নেড়ে সায় দিলেন। '—তা হয়েছে। গীর্জাটা তো এখন ভেঙেই পড়ছে।'

'এখন ছুটে গেলে ধরতে পারবো ?'

'তা কি আর পারবে ? ওরা অনেক দূর চলে গেছে।'

তাই শুনে দৈত্যের দল ফিরে গেলো আবার দৈত্য-পুরীতে। তারা গিয়ে বললো সব কর্তাকে।

কর্তা শুনে তো রাগে কাঁই।

'বলি, ওরে আহম্মুকের দল, পথে কাউকে দেখতে পেলি ?'

'হ্যাঁ কর্তা, একটা বুড়ো পাদরী সাহেব তাঁর গীর্জায় যাচ্ছিলেন। আমরা তো তাঁর কাছ থেকেই সব জানতে পারলাম।' আরও বললো :

'পাদরী সাহেব বললেন, আমি যখন গীর্জা তৈরী করছিলাম, তখনই ওদের দেখেছিলাম। ওরা আমার কাছ থেকে পথের হদিশ নিয়ে গেলো। তা এখন গীর্জাটা তো ভেঙে পড়ো পড়ো। এখন ওদের পিছু নিলে কি আর ধরতে পারবে ?'

'ধরতে পারবে ! আরে বেকুব, আহম্মুকের দল, ওই বুড়োটাই তো ছেলেটা আর গীর্জা হোল মেয়েটা। বোকা পেয়ে তোদের ধোকা দিয়েছে। যাক, তোদের কর্ম নয়। আমি এবার নিজে যাবো, দেখি রেহাই পায় কি করে ?'

এ বলে কর্তা নিজেই ছুটলো এবার হন্তদন্ত হয়ে।

মেয়েটি তার বাপকে ছুটে আসতে দেখে বলে উঠলো : 'এবার আর রক্ষে নেই ! বাবা নিজেই আসছেন। এসে আমাদের ঘাড় মটকাবেন।'

মেয়েটি তখন ছেলেটাকে ডেকে বললো : 'তোমার পকেটের চিরুণীটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে দাও পথের উপর।'

ছেলেটি তাই দিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে—পথের উপর সৃষ্টি হোল গভীর এক জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললো দৈত্য। আর এরই ফাঁকে ওরা দু'জন এগিয়ে গেলো অনেক দূর।

সে কিন্তু বেশী দূর নয়। দেখতে না দেখতেই বাপ তার নিজ যাদুবলে গভীর জঙ্গলের মধ্যে সরু পথ একটা করে নিলো। আর সে পথ দিয়ে ছুটে এসে দু'জনকে আবার ধরে ফেললো।

তাই দেখে মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো: 'করছো কি? তোমার শান-পাথরটি এবার ছুঁড়ে দাও। বাবা যে ধরে ফেললো।'

ছেলেটি শান-পাথরটা ছুড়ে দিলো আর সঙ্গে সঙ্গে পথের উপর সৃষ্টি হোল আকাশ-ছোঁয়া এক উঁচু পাহাড়। সব পথটা জুড়ে বসলো পাহাড়টা। এদিক ওদিক যাওয়া-আসা করার উপায় রইলো না কোনো।

দু'জনে আবার ছুটতে শুরু করলো ছুট—ছুট—ছুট! এক সময় পেছন ফিরে দেখে বাপ তাদের পিছু নিয়েছে আবার। পাহাড় কেটে এক সুড়ঙ্গ দিয়ে বাবা তার বেরিয়ে এসেছেন আবার নিজের যাদু বলে। এই বুঝি তাদের ধরেই ফেললেন।

সে তখন করলো কি, কোমর থেকে তোয়ালেটা খুলে ছুঁড়ে দিলো পথের উপর। আর দেখতে না দেখতে পথের মাঝখানে হয়ে গেলো মস্তো একটা লেক। ওরা দু'জন লেকের ওপারে এক জাঁতা কলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

তাই দেখে দৈত্য মহা চটে গেলো। মেয়েকে ডেকে বললো: 'বে-জন্মা কোথাকার, খুব তো গেলি লেকের ওপারে! এখন ফিরবি কি করে?'

মেয়ে বাপের কথার কোন জবাব দিলো না। ছেলেটাকে শুধু বললো: 'আর দেরী নয়। জাঁতাকলের দড়িটা গলায় জড়িয়ে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ো জলে। উপায় নেই। নইলে প্রাণ হারাতে হবে দু'জনকে।'

ছেলেটি তাই করলো। জাঁতাকলের দড়িটা গলায় জড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে জলে। সঙ্গে সঙ্গে তারই বুঝি দম আটকে আসছিলো। ভয় পেয়ে সে আঁতকে উঠলো।

'না, ভয় পেয়ো না, তোমার কিছু হয় নি। বাবারই গলায় জাঁতা-কলের বাঁধনটি আটকে গেলো। আর তিনি জলের নিচে গেলেন তলিয়ে।'

মেয়েটির চোখদুটি ছলছল করে উঠলো। বললো : 'আমার বাবা আর নেই। এবার চলো তোমার মা-বাবার কাছে।'

মেয়েটিকে নিয়ে ছেলেটি তার বাপ-মায়ের কাছে এসে উপস্থিত হোল।

বুড়ো কর্তা আর গিন্নী দীর্ঘ দিন পর ছেলেকে পেয়ে খুব খুশী হোলেন। মেয়েটি তখন ছেলেটিকে বললো : 'তুমি এখন তোমার বাপ-মায়ের কাছে থাকো। সুখ শান্তিতে তাদের সংগে দিন কাটাও, আমি এখন বাবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে চললাম। বাবাকে তো আমার জন্যই প্রাণ হারাতে হোলো।'

মেয়েটি ছেলেটার একখানা হাত ধরে এবার বললো :

'তিন বছর পর আমি আবার ফিরে আসবো। তখন আমাদের বিয়ে-থা হবে। সুখে-শান্তিতে ঘর-সংসার করবো।'

এই বলে দৈত্য-কন্যা বেরিয়ে গেলো। যাবার সময় তার হাতের আংটিটি খুলে করে নিল সমান দু'ভাগ। একটা ভাগ ছেলেটির আঙুলে সে পরিয়ে দিলো। অপরটি নিজে পরলো। বললো : 'আংটির কথা ভুলো না যেন। তিন বছর পর আমি আবার ফিরে আসবো। তিন বছর পর দেখা হবে আবার।'

ছেলেটি কিন্তু সব কথা ভুলে গেলো।

এদিকে বাপ-মায়ের পিড়াপীড়িতে বিয়ে করতেও রাজি হোল।

বিয়ের দিন কিন্তু কোত্থেকে এক জিপসী মেয়ে এসে হাজির হোল। সে বরের সংগে পান-আহার করতে চাইলো। খানা-পিনার ফাঁকতালে বরের পানীয়র গ্লাসের মধ্যে টুক করে সে এক সময় তার হাতের আংটিটা ফেলে দিলো। বর তা দেখতেও পেলো না।

এদিকে হয়েছে কি, বর এক সময় তার গ্লাসের মধ্যে নিজের হাতের আংটির মত আর আধখানা আংটি দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠলো। আংটি দেখে পুরোন কথা সব তার মনে পড়ে গেলো।

সেই প্রতিশ্রুতি!

তার বিয়ের কথা। যে মেয়ে বার বার তার প্রাণ রক্ষা করেছে তার সংগে তার বিয়ের কথা। সে তার নতুন সম্বন্ধ দিলো ভেঙে। আর বিয়ে করলো তার পুরোন বাগদত্তাকে।

সুখে শান্তিতে তারপর দুজনে ঘর সংসার করলো অনেক দিন।

২০

এক ছিলো কারিকর। তার ছিলো অনেক টাকা-কড়ি, ধনদৌলত। কিন্তু থাকলে কি হবে? সব কিছু সে উড়িয়ে দিলো মদ খেয়ে আর জুয়া খেলে। শেষ মেস এমনই তার পরিণতি হোল, দুবেলা আর খাবারও জুটতো না। না খেয়েই তাকে কাটাতে হোত রাত-দিন।

এমনিভাবে কাটছিলো তার কাল।

একরাত্রে সে স্বপ্ন দেখলো তার দুটি পাখা গজিয়েছে।

ঘুম তার ভেঙে গেলো। ধড়ফড় করে সে উঠে বসলো। হাত বাড়িয়ে দেখলো, সত্যি সত্যি পিঠে তার পাখা গজিয়েছে দু'খানা। পাখা দু'খানা সে নেড়ে চেড়ে দেখলো। সত্যিকারের পাখাই বটে। নতুন পাখায় ভর করে সে তখন উড়ে চললো আকাশ পথে। উড়তে উড়তে কত দেশ দেশান্তর সে পার হয়ে এলো। তারপর এক সময় এসে বসলো এক দুর্গের উপর। নীচে নামতেই তাকে দেখে রাজপুত্র ছুটে এলো। জিজ্ঞেস করলো:

'কোত্থেকে আসছো তুমি?'

'আসছি অনেক দূর থেকে।'

'তা, তুমি তোমার পাখাটা বিক্রী করবে? আমি কিনবো।'

'হ্যাঁ, করবো।'

'কত দাম নেবে?'

'এক হাজার মোহর।'

'বেশ নিয়ে যাও!' রাজপুত্র তাকে হাজার মোহর গুণে দিলো। বললো: 'ডানা দুটো নিয়ে তুমি এখন বাড়ি যাও। মাস খানেক পরে এসো। আমি তখন পাখা তোমার রাখবো।'

কারিকর উড়তে উড়তে বাড়ি ফিরলো।

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেলো। এক মাস কেটে যেতেই কারিকর তার পাখা দু'খানা নিয়ে আবার উড়ে চললো রাজবাড়ি।

রাজপুত্র তাকে দেখে বললো: 'তুমি এসেছো, ভালই হোল। এবার

ডানা দুটি আমার পিঠে জুড়ে দাও। আমিও উড়বো তোমার মতো।'

কারিকর তাই করলো। শুধু—তাই নয়। একটা কাগজ নিয়ে তার উপর লিখে দিলো ডানা ঘুরিয়ে কি করে ওপরে উঠতে হয়; কি করে নামতে হয় নিচে।

তাই দেখে দেখে রাজপুত্র শিখে নিল কি করে ডানা ঘোরাতে হয়, চালাতে হয় কিভাবে। রাজপুত্র একটুখানি আকাশে উড়ে আবার নেমে এলো মাটিতে। কারিকরকে রাজপুত্র আবার একগাদা টাকা কড়ি উপহার দিলো। বললো: 'এ ফ্লোরিণগুলি নাও। তুমি খরচ করো।'

রাজপুত্র কারিকরকে একটা ঘোড়াও দিলো। বললো: উড়ে এসেছো। এখন হেঁটে বাড়ি যাবে কি করে? এ ঘোড়াটা নাও। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাড়ি যাও।'

রাজপুত্র তখন কারিকরের নির্দেশ মত ডানাদুটি পিঠে বেঁধে উড়ে চললো দক্ষিণ মুখো। কিন্তু দক্ষিণ দিক থেকে উঠলো প্রচণ্ড একটা ঝড়। আর তাঁকে নিয়ে চললো উত্তর মুখো। ঝড়ের দাপটে রাজপুত্রও দুলতে লাগলো এপাশ-ওপাশ গাছ-পালার মতো। আর ভাসতে ভাসতে এসে পেঁৗছল নবম রাজ্যে। শহরে পেঁৗছে দেখে আগুন লেগে গেছে এক জায়গায়। তাই দেখে রাজপুত্র উপর থেকে নেমে এল ডানাগুটিয়ে। আর আশ্রয় নিলো এক বাড়িতে। বাড়িতে ছিল এক বুড়ি। রাজপুত্র তার কাছে খাবার চাইলো।

বুড়ি তাকে খানিকটা ছাতু খেতে দিলো। রাজপুত্র সেই শুকনো খাবার খেলো না। না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লো। পর দিন সকাল হলে একটা কাগজের উপর খাবারের নাম লিখে টাকা দিয়ে বুড়িকে সে পাঠিয়ে দিলো খাবারের দোকানে। চিঠি মতো দোকানী বুড়ীর হাতে দিলো টাটকা খাবার।

খাবার নিয়ে বুড়ি বাড়ি ফিরলো। রাজপুত্র নিজে খেলো। বুড়িকেও খেতে দিলো। খেয়ে দেয়ে রাজপুত্র বাইরে এসে দাঁড়ালো। দেখলো: চারতলা রাজবাড়ির নিচের তিন তলা হোল ইঁটের তৈয়েরী কিন্তু সব চেয়ে উপরের চারতলাটি হোল কাচের।

রাজকুমার তাই জিজ্ঞেস করলো: 'ওখানে কে থাকে জানো?

'ওখানে থাকেন আমাদের রাজকন্যা। রাজা তাঁকে কোথাও যেতে

দেন না। বেরুতেও দেন না। একটা দড়ি ঝুলিয়ে রাখা হয় বাইরে। তাই দিয়ে খাবার-দাবার পাঠানো হয় ওর কাছে।'

বুড়ি আরও বললো : 'রাজকন্যার জন্য একটি ঝিও রয়েছে। তার আলাদা একটা ঘর আছে। রাত্রে সে ওঘরে শোয়। দিনের বেলা শুধু থাকে রাজকন্যার কাছে।'

রাজপুত্র সব শুনলো। তারপর ডানায় ভর করে উড়ে গেলো কাঁচের ঘরে। গিয়ে কাঁচের ঘরের দরজা জানালা সব পরখ করে দেখে নিলো।

প্রকাণ্ড একটা ঘরে ঢুকে দেখে প্রশস্ত এক পালঙ্কে অপরূপা এক রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে। রাজপুত্র রাজকন্যাকে অনেক ডাকাডাকি করলো। এগিয়ে গিয়ে নাড়াও দিলো গায়ে। কিন্তু রাজকন্যার কোন সাড়া নেই। প্রাণহীন দেহটি অসাড় হয়ে পড়ে রইলো।

একসময় তার নজরে পড়লো, রাজকন্যার কপালের মাঝখানটায় একটা মোমবাতি জ্বলছে মিটমিট করে। আলোটা তুলতেই রাজকন্যার দেহে প্রাণ ফিরে এলো। ধড়ফড় করে সে উঠে বসলো। ভিনদেশী রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করলো : কে সে? কি করে বা সে এসেছে এ ঘরে?

ভিন দেশী রাজপুত্র সব কথা তাকে জানালো। তাই শুনে রাজপুত্রের সংগে রাজকন্যার খুব ভাব হয়ে গেলো। রাজপুত্রের গলা জড়িয়ে সে বলে উঠলো ঃ

'আমায় এখানে ফেলে তুমি যেয়ো না গো। আমি তা হলে মরে যাবো।'

'না না, আমি তোমায় নিয়ে যাবো।'—রাজপুত্র তাকে আশ্বাস দেয়। —'তুমি ভেবো না। আমার এ ডানার সাহায্যে তোমাকেও আমি নিয়ে যাবো।'

কিন্তু নিয়ে আর যাওয়া হয় না। শুধু ভাবাই সম্বল।

রাজপুত্র শত ভেবে ভেবেও কোন কূল কিনারা বাতলাতে পারলো না। সে রোজ রাত্রে আসে। রাজকন্যার ঘরে ঢুকে কপালের উপর থেকে তার মোমের আলোটি সরিয়ে রাখতেই রাজকন্যার প্রাণহীন দেহে জীবন ফিরে আসে। গল্প গুজব করে সারা রাত কাটায় দু'জনে। তারপর ভোর হতে রাজকন্যার কপালের উপর মোমবাতিটি জ্বেলো দিলো সে। রাজকন্যার মৃত দেহটি পড়ে থাকে পালঙ্কের উপর। রাজকন্যার ঠোঁটে

চন্দ্বনের রেখা এঁকে সে তখন বিদায় নেয়। প্রতীক্ষায় থাকে পরের রাত্রির জন্য।

এমনি কাটে দিন। কেটে গেল এমনি করে ছয় মাস।

এদিকে কিন্তু রাজকন্যা মা হতে চললো।

জামা কাপড় সব পরিপুষ্ট দেহে তার আঁটসাট হয়ে উঠলো। মাপ-সই জামা-কাপড় দেহে আর ফিটই করে না। এখন উপায়? ঝি তাই লক্ষ্য করে মহা ফাঁপড়ে পড়লো। মহারাজকে সব কথা খুলে লিখে জানালো।

মহারাজও রীতিমতো অবাক। সে কি কথা! অমন দশা করলো কে? কাণ্ডটা কার?

মহারাজ একটা বুদ্ধি বাতলালেন। ঝিকে ডেকে বললেন: 'তুমি এক কাজ করো। ময়দা গুলিয়ে নরম নরম লেচি করে তা দাও ঘরময় ছিটিয়ে। বাছাধন রাত্রে এসে নাকাল হবে।'

ঝি তাই করলো। একরাশ ময়দা গুলিয়ে সারা মেঝেতে সে দিলো ছড়িয়ে।

এ দিকে রাত্রে রাজকুমার রাজকন্যার সংগে মজা লুটে ফিরবার সময় টেরই পেল না যে তার জুতোয় ময়দার লেচির ছাপ লেগে আছে। আব আর দিনের মত রাজকুমার বুড়ির ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো আর নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে লাগলো।

সকালে ঝি মৃত রাজকন্যার ঘরে পাহারা দিতে এসে দেখে সারা ঘরে জুতোর ছাপ রয়েছে। সে তখনই মহারাজকে সব ব্যাপার জানিয়ে চিঠি লিখলো।

'এ মাপের জুতো পায়ে দেয় যে লোক, যেখানেই থাকুক পাকড়াও করে নিয়ে এসো আমার কাছে।'

রাজার নির্দেশ পেয়ে চাকর-বাকর পাইক-বরকন্দাজরা সব ছুটলো বাড়ি বাড়ি। কিন্তু প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি খুঁজেও কোথাও রাজকন্যার মন-চোর সেই জুতোর মালিকের হদিশ পেলো না। ওরা তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো: 'রাজ্যের সর্বত্র তো খুঁজে দেখলাম, বুড়ির ঐ ঘরটাই বা বাদ যায় কেন? চলো একবার পাই কিনা খুঁজে দেখি।'

'বুড়ির ঘরে আবার রাজকন্যার মনের মানুষ লুকিয়ে থাকবে কেনো?' কে বুঝি আপত্তি করলো।

'এখানে তোরা দাঁড়া। আমি একবার দেখে আসি।' এ বলে সে বাড়ির ঘরে গেলো খুঁজে দেখতে। সে গিয়ে দেখে কি, সত্যি সত্যি ভিনদেশী এক রাজকুমার ঘরের মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। পায়ের নাগরা জুতোজোড়াটি খোলাই হয়নি তখনো। আর সেই নাগরা জুতোয় লেগে আছে ময়দার লেচির ছাপ।

সবাই তখন, ওকে ঘিরে ধরলো। বললো :

'চলো মহারাজার কাছে।'

'বেশ, চলো।' রাজপুত্র জবাব দিলো। বললো : 'একটু দাঁড়াও। আমি আমার পোষাকটা পরে নি।'

এই বলে সে তার ডানাদুটি ঢাকবার জন্য প্রকাণ্ড একটা আলখাল্লা পরে নিলো। তাই পরে রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হোল।

রাজা ওকে দেখে প্রশ্ন করলেন :

'অমন কাজ কেনো তুমি করতে গেলে?'

'আমি আপনার মেয়েকে ভালোবাসি।'

'ভালোবাসো?'

'হ্যাঁ।'

'ভালোবাসো? ওকে তুমি বিয়ে করবে?'

'হ্যাঁ, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।'

'হুঁ, বিয়ে আমি করাচ্ছি! দু জনকে আমি পুড়িয়ে মারবো।'

এই বলে রাজা তাঁর লোকজনকে তিন আঁটি খড়-কুটো-এনে আগুন ধরিয়ে ওদের পুড়িয়ে মারবার হুকুম দিলেন। রাজকন্যাকেও নিয়ে আসতে বললেন। তাই শুনে রাজকুমার বলে উঠলো :

'মহারাজ, মরবার আগে আমাদের একবার হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করতে অনুমতি দিন।'

'বেশ, মরবার আগে ইষ্টনাম স্মরণ করো।'

রাজপুত্র তখন রাজকন্যাকে চুপিচুপি বললো : 'হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করবার ভাণ করে তুমি আমার আলখাল্লার মধ্যে ঢুকে পড়বে টুক করে। আর ঢুকে আমার গলা আঁকড়ে থাকবে। ডানায় ভর করে আমি তোমায় নিয়ে উড়ে যাবো। রাজবাড়ির লোক আমাদের নাগাল পাবে না।'

রাজকন্যা তাই করলো। প্রার্থনা করার ভাণ করে সে রাজপুত্রের পোষাকের নীচে ঢুকে পড়লো এক সময়। রাজপুত্রও তখন ডানা ফিট্ করে উড়ে চললো আকাশপথে। রাজবাড়ির লোকজন, সৈন্য-সামন্ত তীর-ধনুক ছুঁড়েও তাদের নাগাল পেলো না।

উড়তে উড়তে ওরা অনেক দূর চলে এলো। আর এসে বসলো উঁচু এক পাহাড়ের চূড়োয়। এ পাহাড়ের চূড়োয় রাজকন্যা প্রসব করলো এক সন্তান! রাজকন্যা তখন বললো ঃ

'একটু আগুন আনতে পারবে কোথাও থেকে? ছেলেটার হাত পা-গুলো একটু গরম করে নিতাম।'

পাহাড়ের উপর এখন কোথায় সে আগুন পায়? রাজপুত্র তাই মহা ভাবনায় পড়লো। এক সময় নিচে তাকিয়ে দেখে দূরের ক্ষেতে এক কিসান বুঝি আগুন জ্বালিয়ে রান্না-বান্না করছে। রাজপুত্র উড়ে গিয়ে তার কাছ থেকে একটু আগুন চেয়ে আনলো। আগুনটা নিয়ে উপরে উঠবার সময় কি করে তার এক ডানায় আগুন লেগে গেলো। আর সে আগুনে একখানা ডানা তার পুড়ে গেলো। এক ডানায় সে আর ভার সামলাতে পারলো না। হুড়মুড় করে সে আছড়ে পড়লো একেবারে পাহাড়ের নিচে। এতখানি পথ ভেঙে সে পাহাড়ে ওঠে কি করে? রাজকন্যার কাছেই বা যায় কি করে? বুক ফেটে তার কান্না এলো। কান্না থামিয়ে সে এক সময় ঠাকুরের নাম করতে লাগলো।

তার কাতর প্রার্থনা বুঝি ভগবানের কানে গেলো। তিনি সাড়া দিলেন। রাজপুত্রের সামনে এসে শুধালেন ঃ

'কাঁদছো কেনো?'

'কি যে বলেন ঠাকুর, কাঁদবো না? আমার পরিবার যে ছেলে কোলে করে বসে আছে পাহাড়ের উপর আমার জন্য। আমাকে সে একটু আগুন নিয়ে যেতে বলেছিলো। তা আমি এখন যাই কি করে?'

'সে ব্যবস্থা আমি করবো। তুমি আমায় কি দেবে?'

'যা চাইবেন, তাই দেবো।'

'তাই দেবে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, তাই দিয়ো। বললেন, 'তবে একটা চুক্তি করে নেওয়া

ভালো।'

ঠাকুর জবাব দিলেন।

তারপর ঠাকুর দুজনকে মায়াবলে ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন। আর ঘুমের মধ্যে তাদের নিয়ে গেলেন রাজপুত্রের আপন রাজ্যে। শুধু তাই নয়, নিয়ে গিয়ে ওদের ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন নিজ পালঙ্কের উপর। কোলের ছেলেটিকেও তাই করলেন। ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন মায়ের বুকে। ঠাকুর তারপর বিদায় নিলেন।

ঘুমের মধ্যে ছেলেটি এক সময় কেঁদে উঠলো! আর তাই শুনে রাজবাড়ির সবাই ছুটে এলো। এসে দেখে রাজপুত্র আর ভিনদেশী এক রাজকন্যা শুয়ে আছে পালঙ্কে। আর কোলে রয়েছে ফুটফুটে এক শিশু। তাই দেখে ওরা সবাই চিৎকার করে উঠলো ঃ

'দেখুন মহারাজ, রাজপুত্র আবার ফিরে এসেছেন। সঙ্গে এক রাজকন্যাকেও এনেছেন।'

মহারাজ ওদের ডেকে পাঠালেন।

রাজপুত্র ও রাজকন্যা শিশুপুত্রকে নিয়ে রাজ দরবারে এসে হাজির হোল। বাবা-মাকে যথারীতি প্রণাম করে মার কোলে তুলে দিলো পুত্রকে।

বাপ-মা ওদের আশীর্বাদ করলেন।

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেলো।

শিশু পুত্রটিও দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলো।

একদিন রাজবাড়ির সবাই গীর্জায় উপাসনা করতে গেলে, এক ভিখারী এসে হাজির হোল রাজবাড়িতে।

ভিখারী রাজপুত্রের নিকট কিছু ভিক্ষা চাইলো।

রাজপুত্র তখন তার ছেলেকে ডেকে বললো ঃ 'যাও তো বাবা, ভিখিরীটার হাতে কিছু পয়সা দিয়ে দাও।'

ভিখারী কিন্তু তাতে রাজি হোল না। বললো ঃ

'আমি পয়সা নেবো কেনো? তুমি কি তোমার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলে?'

এই বলে বুড়ো ভিখারী উঁচু পাহাড়ের নিচে ডানা-ভাঙা রাজপুত্রের কান্নার কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। বললো ঃ 'ভেবে দেখো, তুমি তখন কি বলেছিলে। আমি যা চাইব তাই দেবে। কি বলেছিলে?'

'হঁ্যা, বলেছিলাম।'

আমি তোমার ছেলেকে চাইছি। ছেলেকে দাও।'

'না। ছেলে আমি দেবো না। তুমি টাকা-কড়ি যত খুশি নাও।'

'না, টাকা-কড়ি আমি চাই না।' ভিখারীর সেই এক কথা।—'ছেলে দাও আমায়। তুমি যা বলেছিলে, ভুলে যেয়ো না।'

রাজপুত্র তখন রেগে গেলো। তরবারিখানা বাগিয়ে ভিখারীকে কাটতে গেলো।

ভিখারীটি তখন স্বরূপে প্রকাশ করলো। এক ঝটকায় রাজপুত্রের হাত থেকে তরবারিখানা ছিনিয়ে নিলো। তারপর ছেলের হাত ধরে বলে উঠলো: 'আমি তোমার কথা মত ছেলেকে নিয়ে চললাম।'

কিন্তু রাজপুত্রও ছাড়বে না। পা ধরে ছেলের টানাটানি করতে লাগলো। আর ভিখারী তার মাথা ধরে।

দুজনের মধ্যে হেস্ত-নেস্ত টানাটানি শুরু হোল। আর এদিকে ছেলেটির প্রাণ যায় যায়। ভিখারী তখন হাতের তরবারিখানা দিয়ে ছেলেটাকে সমান দুখান করে ফেললো কেটে। বললো: 'এ নাও, তোমার ভাগ তুমি নাও। আমার ভাগ আমি।'

ছেলেকে দু'খান করে কাটতে দেখে রাজপুত্র তখন বলে উঠলো: 'ছেলেটাকে তুমি যখন কেটেই ফেললে, তখন আর ওর আধখানা নিয়ে আমি কি করবো? তুমি নাও সবটা।'

ভিখারী তখন ছেলেটার দেহের দুটো ভাগ জোড়া লাগিয়ে একবার হাত বুলালো তার উপর। আর দেখতে না দেখতে ছেলেটি লাফিয়ে উঠলো প্রাণ লাভ করে।

'এই নাও, তোমার ছেলে। আমি তোমার ছেলে নিয়ে আর কি করবো? তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তও মিটে গেল এখানে।'

এই বলে ভিখারী ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে বিদায় নিলো।

২১

সে অনেকদিন আগের কথা। তখনকার দু'জন চোরের কথা।

এক চোর থাকতো শহরে আর এক চোর থাকতো গাঁয়ে। একদিন চুরি করতে গিয়ে দু'জনের হোল দেখা। গাঁয়ের চোর তখন শহরের চোরকে ডেকে বললো :

'হ্যাঁ ভাই, শুনতে পাই তুমি নাকি হয়েছো নামকরা চোর। গাঁয়ে যখন এসেই পড়েছো তখন তোমার ক্ষমতাটাও একবার পরখ করা যাক। ঐ গাছের আগায় কাকের বাসাটা থেকে কাকের ডিম চুরি করতে পারবে লুকিয়ে? তাহলে বুঝবো হ্যাঁ, চুরিবিদ্যায় তোমার হাত পাকা।'

'আরে ছ্যাঃ, কাকের বাসা থেকে ডিম চুরি, ও একটা বাহাদুরির কাজ নাকি!'

এই বলে শহুরে চোর জামা জুতো ছেড়ে তরতর করে উঁচু গাছটায় উঠে গেলো। আর কাকগিন্নীর অলক্ষ্যে কাকের বাসা থেকে তার ডিম কয়টি চুরি করে নেমে এলো নিচে। একগাল হেসে বললো ঃ

'কেমন গেঁয়ো ভাই, চুরি করতে পারি কিনা দেখো। আরে ডিম খোয়া গেছে কিনা কাকগুলো জানতেই পারে নি!'

এদিকে হয়েছে কি, শহুরে চোর তরতর করে গাছে চড়তেই গেঁয়ো চোর তার জামা-কাপড় জুতো সব তুলে নিলো। শহুরে চোর জানতেই পারলো না কখন সে এ কাজ করলো। গাছ থেকে নেমে সে দেখে তার জামা-জুতো সব উধাও। জানতে পারলো না যে গাঁয়ের চোর কখন হাত সাফাই করেছে।

শহুরে চোর তখন গাঁয়ের চোরকে ডেকে বললো ঃ 'তুমি ভাই আমার চাইতে পাকা চোর। চলো আমরা দুজন এবার থেকে চোর-চোর ভাই-ভাই হই।'

তখন থেকে ওরা দু'জন ভাই-ভাই।

সেই থেকে দু'জনের খুব ভাব। এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে না দেখে থাকতে পারে না এক দণ্ড। কথায় বলে চোরে চোরে মাসতুতো

ভাই। এদের বেলায়ও তাই।

দু'বন্ধু একদিন শহরে এসে পেঁছিল। আর দু'জনে বিয়ে করলো এক মেয়েকে। শহুরে বন্ধু একদিন গাঁয়ের বন্ধুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো ঃ

'দ্যাখো ভাই, এটা শহর। পাড়াগাঁ না। দু'জনে মিলে এক মেয়েকে বিয়ে করাটা ভালো দেখায় না। তুমি বরং ওর সংগে ঘর সংসার করো।'

'হ্যাঁ ভাই, তাই হবে। ও একা আমার সংগে ঘর করবে।' গাঁয়ের চোর সায় দিলো।

'কিন্তু তা তো হোল। নতুন বৌ নিয়ে তুমি সংসার পাতবে কোথায় ? টাকা-কড়ি সব আসবে কোত্থেকে ?'

'তুমি শহুরে মানুষ সে তুমি ভাববে।'

গাঁয়ের চোর জবাব দিলো।

দু'বন্ধু তখন হাঁটতে হাঁটতে রাজবাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হোল।

শহুরে চোর তখন গাঁয়ের চোরকে বললো ঃ

'দেখো ভাই, রাজবাড়িতে ঢুকে রাজার খাজাঞ্চিখানা থেকে টাকা চুরি করতে হবে। তার একটা মতলব বাতলাও।'

'তুমি শহুরে লোক, সে তুমি বাতলে দিয়ো ভাই। আমি ভাবছি, সিঁধ কেটে আমরা দুজন রাজবাড়িতে ঢুকবো এক এক করে।'

'বেশ, তাই হবে।'

দু'চোর তখন চুপি চুপি রাজবাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। দু'জনে তখন সিঁধকাঠি দিয়ে ছাদে এক গর্ত করলো। আর গাঁয়ের চোর সেই গর্ত দিয়ে নিচে মাথা গলিয়ে দিলো। এবং রাজকোষ থেকে দুশ' তোড়া টাকা হাতড়ে বেরিয়ে এলো। তাই নিয়ে দুই বন্ধু ফিরলো বাড়ি।

এদিকে সকালে রাজা ঘুম থেকে উঠে দেখেন, রাজকোষ থেকে দু-দুশ' তোড়া টাকা খোয়া গেছে বেমালুম।

রাজা সরাসরি তাঁর কয়েদীখানায় গিয়ে হাজির হলেন। দীর্ঘ মেয়াদী বুড়ো চোরটাকে ডেকে বললেন ঃ

'তুমি তো বাপু, অনেক দিনের জেল-ঘুঘু। সব খোঁজ-খবর রাখো। রাজভাণ্ডার থেকে দুশ' তোড়া টাকা চুরি গেছে। কিন্তু চোরের কোন

হদিশ নেই। রাজবাড়ির কোথাও কোন ছাপ নেই চোর ঢোকার।'

'আছে, মহারাজ, আছে। শেয়ানা চোর, এমন করে সিঁধ কেটেছে, আপনার চোখ গেছে এড়িয়ে।'

পুরোন দাগী চোর এবার একটু থামলো। তারপর মহারাজকে বললো: 'আপনি এখন বাড়ি যান মহারাজ। আর প্রত্যেক ঘরে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া দেন গিয়ে। যে ঘর থেকে দেখবেন কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, সে ঘরেই আপনার শেয়ানা চোর সিঁধ কেটেছে।'

রাজা বাড়ি ফিরে তাই করলেন আর দেখলেন, শুধু খাজাঞ্চি ঘরের ছাদ দিয়েই কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তিনি ছুটে গিয়ে দেখলেন, চোর সত্যি সত্যি ছাদেই সিঁধ কেটেছে।

রাজা আবার পুরোন দাগী চোরের কাছে ছুটে গেলেন। এবং সব বললেন। তাই শুনে দাগী চোর বললো: 'ভাববেন না মহারাজ, আপনার চোর আবার আসবে চুরির মতলবে। আপনি গিয়ে গর্তের নিচে এক জালা সেদ্ধ গুড় রেখে দিন গে। আপনার চোর বাবাজির ঠিক শিক্ষা হবে।'

রাজা তাই করলেন। দাগী চোরের কথামত একজালা সেদ্ধ গুড় গর্তের নিচে রেখে দিলেন।

এদিকে রাত্রে চোর এসে গর্ত দিয়ে মাথা গলিয়ে নামতে গিয়ে পড়বি তো পড় একেবারে ফুটন্ত গুড়ের মধ্যে। গাঁয়ের চোর তখন শহরের চোরকে ডেকে বললো: 'ভাই, আমি তো ফুটন্ত গুড়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে পুড়ে মরলাম। আমার পোড়া মুখ আর দেখতে দিয়ো না কাউকে। তুমি বরং আমার মাথাটা কেটে নিও, পুঁতে রেখো কোথাও।'

শহরের বন্ধু তাই করলো। মাথা গলিয়ে কোন রকমে বন্ধুর মাথাটা কেটে নিয়ে সে তা কবর দিলো বনে গিয়ে।

এদিকে রাজা সকাল বেলা খাজাঞ্চিখানা ঘরে গিয়ে দেখেন সত্যি সত্যি ফাঁদে পড়েছে চোর। তবে চোরের মাথা নেই! ধড়টাই শুধু পড়ে আছে গুড়ের জালার মধ্যে।

রাজা অমনি ছুটে গেলেন দাগী চোরের কাছে। গিয়ে বললেন: 'তুমি ঠিকই বুদ্ধি দিয়েছো। চোর ধরা পড়েছে। তবে এ চোরের মাথা নেই। স্কন্ধ কাটা চোর। আছে শুধু ধড়।'

বলেন কি মহারাজ, চোরের মাথা নেই? জবর মাথা দেখছি! মহা শেয়ানা,! ধড়িবাজ। সঙ্গে ধূর্ত সাঙ্গাৎও আছে। আপনি এক কাজ করুন, মহারাজ!'

বুড়ো চোর একটু থামলো। তারপর বললো: 'গলা-কাটা চোরটাকে নিয়ে গিয়ে নগর তোরণে ঝুলিয়ে রাখতে বলে দিন। দেখবেন, যে শেয়ানা চোর ওর মাথাটা কেটে নিয়েছে সে নির্ঘাৎ আসবে তার ধড়টাও চুরি করতে। আপনি আপনার পাইক-বরকন্দাজ-সৈন্য-সামন্তদের নজর রাখতে বলবেন ওর উপর।'

রাজা তাই করলেন। চোরের গলা কাটা দেহটা নগর-তোরণে টাঙিয়ে রাখতে নির্দেশ দিলেন। বাছা বাছা বিশ জন সৈন্যও মোতায়েন করলেন তার পাহারায়।

এদিকে শহরের চোর করলো কি, শাদা একটা খচ্চর ও একখানা এক্কাগাড়ি কিনলো সে। আর নিলো বিশ বোতল মদ ধরে এমন একটা পিপে। গাড়িতে তাই বোঝাই করে সে সিধে গিয়ে উপস্থিত হোল যেখানে তার সাঙ্গাতের শব ঝুলিয়ে রেখেছে সেখানে। নিজেরও বুড়ো থুড়থুড়ে এক গাড়িওয়ালার বেশ নিলো। নগর-তোরণের কাছাকাছি এসে সে তার মদের পিপেটাকে রাস্তায় এমন করে ছুঁড়ে দিলো যা থেকে মদের বোতলগুলি বুঝি সব ছড়িয়ে পড়লো। গাড়িখানাও রাস্তায় বিকল হয়ে পড়লো। বুড়ো গাড়িওয়ালা তখন দাড়ি ছিড়ে, চুল ছিড়ে আষাঢ়ে কান্না জুড়ে দিলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো: সে গরীব মানুষ। বুড়ো হয়েছে, চোখে ভাল দেখতে পায় না। তাই গাড়ি থেকে তার মাল পত্র সব পড়ে গেলো। মালিক তাকে কোতল করবে। জানে মেরে ফেলবে। কি সর্বনাশটাই না হোল তার!

বুড়ো গাড়িওয়ালা বুক ফাটা মরা কান্না শুরু করলে। —'কি সর্বনাশটাই না হোল তার।'

বুড়ো গাড়িওয়ালার বুক-ফাটা কান্না সহ্য করতে না পেরে সৈন্যরা সব ছুটে এলো। বললো: 'কি হোল বুড়ো, কি হোল? অমন বুক ফাটা কান্না জুড়ে দিলে কেনো?'

'কি যে বলেন কর্তা, কাঁদবো না? আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেলো। মালিকের মালপত্র সব রাস্তায় পড়ে গেলো। মালিক আমায় কি আজ

রাখবেন ? জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন গো।'

'বেশ আমরা সবাই মিলে তোমার মাল পত্তর সব তুলে দিচ্ছি গাড়িতে। গাড়ীখানাও ঠিক-ঠাক করে দিচ্ছি। আমাদের কিন্তু—।'

'সৈন্যরা একটু থামলো। বললো : 'আমাদের কিন্তু গলাটা একটু ভিজাতে দিও ভাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবো বই কি ?' বুড়ো সায় দিলো। —'শুধু গলা ভেজা কেনো। পেট ভরে খেয়ো। তোমরা ভাই, হাত্তাহাতি করে মালটা যদি গাড়িতে তুলে না দাও, তবে রাস্তায় পড়ে থাকবে।'

সৈন্যরা তখন ধরাধরি করে বুড়োর ছড়ানো মাল-পত্রগুলি গাড়িতে আবার তুলে দিলো। তার গাড়িখানাও আবার মেরামত করে দিলো। আর বুড়োর কথামত নিজেদের গলাটাই শুধু খানিকটা ভিজিয়ে নিলো না, আকণ্ঠ পানও করলো। চোখে তখন তাদের নেশা ধরেছে। বুড়ো এগিয়ে এসে গলা-কাটা চোরের লাশটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো : 'ওটা কার লাশ গো ?'

'একটা চোরের।'

'চোরের ?'

'হ্যাঁ।'

'তবে রে হয়েছে। চোর ? ও যে তা হলে নির্ঘাৎ চুরি করবে আমার গাড়ির ঘোড়াটাকেও।'

'কি বলছো তুমি ? ওর যে গলা কাটা। চুরি করবে কি করে ?'

'ঠিকই করবে। চোর তো, আমি বাপু থাকবো না এখানটায়। ঘোড়া নিয়ে রাত কাটাবো আর কোথাও গিয়ে।'

'তোমার মাথা খারাপ। বাহুত্তুরে পেয়েছে তোমায়।' সৈন্য সামন্তরা সব চটে উঠলো বুড়োর উপর। বললো : 'ওটা তো একটা মড়া। তোমার ঘোড়া চুরি করবে কি করে ? আর যদি করে আমরা তার ক্ষতি-পূরণ দেবো।'

'সে কি আর দেবে ভাই, সে কি আর দেবে ?'

'আলবৎ দেবো।' সৈন্যরা বলে উঠলো : 'তোমার ঘোড়া ও যদি চুরি করে আমরা তার জন্য তিন শ' 'গ্রোট' পুরনো বৃটিশ টাকা গুণে দেবো তোমায়।'

'গুণে দেবে ? ঠিক দেবে ভাই ?'

'হ্যাঁ, দেবো। এই লিখে দিলাম।'

সৈন্যরা তাই লিখে দিলো।

বুড়ো তখন বললো ঃ 'তা তোমরা যখন অতো করে বলছো, কোথাও আর আমি গেলাম না। রাতটা এখানেই না হয় কাটালাম।'

বুড়ো একটু থামলো। আড় চোখে মাতাল সৈন্যদের দিকে একবার তাকালো। তাকিয়ে আবার বললো ঃ 'কই তোমরা তো কিছুই খেলে না। সবটা পড়েই রইলো। জিনিষটা মিছিমিছি নষ্ট হবে। খেয়ে ফেলো, খেয়ে ফেলো সবটা। আমি ওই চুল্লিটার ধারে একটু ঘুমিয়ে নিই।'

বুড়ো সত্যিসত্যি চুল্লির পাশে কম্বল জড়িয়ে ঘুমোবার ভাণ করলো।

সৈন্যরা এরই মধ্যে বেসামাল হয়ে পড়েছিলো। বুড়োর কাছ থেকে ছাড়পত্র পেয়ে এবার হোল রীতিমত মাতাল। টাল সামলাতে না পেরে যে যেখানে পারে মেঝেতেই গড়িয়ে পড়লো অসাড় হয়ে। আর কারো হুঁশ রইলো না।

বুড়ো সব লক্ষ্য করছিলো। সৈন্যদের সবাইকে ঢলে পড়তে দেখে সে উঠে চুপি চুপি বন্ধুর কাটা ধড়টা ফাঁসিকাঠ থেকে নামালো। ঘোড়ার পিঠে সেটা চাপিয়ে নিয়ে গেলো সে বনের মধ্যে। বনে গিয়ে ধড়টাকে সে দিলো কবর আর ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখলো এক গাছের সংগে।

বুড়ো আবার ফিরে এলো নগর-দ্বারে। আর নিঃশব্দে গিয়ে শুয়ে পড়লো চুল্লির পাশে আপন বিছানায়। পাহারাদার সৈন্যরা তখনও পড়ে আছে বেহুঁশ হয়ে।

সকালের দিকে ওদের নেশা টুটলো। ওরা ধড়ফড় করে উঠে বসলো। চোখ কচলে তাকিয়ে দেখলো ঃ চোরের গলা-কাটা ধড়টা কোথাও নেই। তার সংগে বুড়োর ঘোড়াটাও। তাজ্জব কথা। পাহারাদার সৈন্যরা পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। 'দেখলে তো, বুড়ো কিন্তু ঠিকই বলেছিলো। মড়া চোরটা তার ঘোড়াকে নির্ঘাৎ চুরি করবে। হোলও তাই, এখন উপায়।'

ওরা তখন গেলো বুড়োর কাছে। গিয়ে তাকে সব কথা বললো।

শুনে বুড়ো হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো : 'আমি আগেই বলেছিলাম, ভাই ! আমি গরীব মানুষ, আমার কি হবে গো ! মুনিব আমার জান নেবে। আমায় কোতল করবে।'

বুড়ো তার দাড়ি ছিঁড়ে, চুল ছিঁড়ে একাকার করতে লাগলো। তাই দেখে পাহারাদার সৈন্যরা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। বললো : 'তুমি দুঃখ করো না। তোমাকে টাকা দিচ্ছি, তুমি এখান থেকে সরে পড়ো। কাউকে কিন্তু বলো না একথা।'

সৈন্যরা ওর হাতে চার শ' 'গ্রোট' পুরনো বৃটিশ মুদ্রা গুঁজে দিলো। বললো : 'এ নাও। এ টাকা দিয়ে তুমি তোমার ঘোড়া কেনো গে। কিন্তু এ কথা কাউকে বলো না যেন।'

'না-না, স্কন্ধ-কাটা চোর আমার জল জ্যান্ত ঘোড়াটা বেমালুম চুরি করে নিয়ে গেলো, তা কি বলবার কথা ? আমি কাউকে বলবো না।'

টাকাটা ট্যাঁকে গুঁজে বুড়োর বেশধারী শহুরে চোর কেটে পড়লো ওখান থেকে।

একটু পরে মহারাজও ছুটে এলেন। এসে দেখেন, চোর ধরা পড়ে নি। এমন কি আশে-পাশে কোথাও গলা-কাটা চোরের ধড়টাও নেই। পাহারাদাররাও সব উধাও। আশে পাশে মদের খালি বোতলগুলি দেখে তিনি ব্যাপারটা কিছুটা আন্দাজ করে নিলেন। তারপর ছুটলেন জেলখানায় দাগী চোরটির কাছে।

রাজা তাকে সব কথা জানালেন। তাই শুনে সে বলে উঠলো : 'আমি এখনও বলছি মহারাজ, ও মহা ধূর্ত' শেয়ানা চোর। তবে বাছাধনকে আমি এবার জব্দ করছি।'

এই বলে সে মহারাজের কাছে গিয়ে বললো :

'আপনি একটা কাজ করুন মহারাজ, বাজারের সব চাপ মাংসটা কিনে নেন। শুধু একজনকে বাদ দেবেন। এবং তাকে বলে দেবেন, যে কেউ তার কাছ থেকে মাংস কিনতে আসুক না কেন, সে যেন তার কাছ থেকে ঐ মাংস বাবদ কেজি পিছু দু ডাক্যাট মোহর অতিরিক্ত দাবী করে। দেখবেন বাছাধন ঐ ফাঁদে পা দিয়েছে।'

মহারাজ তাই করলেন। বাজার থেকে বাছাই করা সব চাপ চাপ মাংস কিনে নিলেন এবং একটা দোকানই শুধু রাখলেন ছাড়।

পরদিন শেয়ানা চোর বাজারে মাংস কিনতে এসে সব শুনে ব্যাপারটা কি সে আন্দাজ করে নিলো। তাই সে সওদা করলো না কিছু। খালি হাতে ফিরে গেলো। কিন্তু পরের দিন সে আর লোভ সামলাতে পারলো না। ঘোড়ায় টানা একখানা গাড়ি নিয়ে সে মাংসের বাজারে এসে হাজির হোল। কশাই খানার সামনে গাড়িটা থামিয়ে সে দোকানীকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

'আমার গাড়িটা একটু মেরামত করতে হবে ভাই, তোমার কাটারিটা একবারটি দেবে ?'

'নাও না, ওই তো মাংসের পাশে রয়েছে।' দোকানি তার মাংস কাটা কাটারিটা গাড়িওয়ালাকে দেখিয়ে দিলো। আপন মনে তারপর বলে চললো ঃ 'বসে আছি তো আছি। খদ্দেরের নাম নেই। কালকেও আসে নি। আজকেও এখনো এলো না কেউ।'

'সে কি ? মাংসের দোকানে খদ্দেরের আকাল কেনো গো ? কি ব্যাপার ?'

'তা আর বলো না ভাই !' দোকানি বলতে শুরু করলো ঃ 'কোথেকে এক শেয়ানা চোর এসে পড়েছে রাজ্যে। রাজকোষ থেকে টাকা হাতড়ে উধাও সে। বিলকুল বেপাত্তা। রাজা তাকে ধরবার জন্য ফাঁদ পেতেছেন। কিন্তু চোরের টিকিটি দেখা নেই। প্রত্যেকের হাতে হাতে এখন সে তামাক খেয়ে বেড়াচ্ছে।'

'তাই নাকি ? আমি বাপু আগে ভাগে সরে পড়ি। এ নাও তোমার কাটারি। তোমার জিনিষ তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম।'

এই বলে গাড়িওয়ালা দোকানির কাটারিটা রেখে গাড়ি নিয়ে আবার ফিরে চললো। যাবার আগে কথা বলার ফাঁক তালে আসল কর্মটি কিন্তু সে সমাধা করে গেলো। বিশ কিলোর মতো সেরা চাপ মাংস হাত সাফাই করে কেটে নিয়ে নিজের কোটের নিচে চালান দিলো। দোকানির তা চোখেই পড়ে নি।

গাড়িওয়ালা চলে যেতেই রাজা হন্তদন্ত হয়ে মাংসের দোকানে এসে হাজির হলেন। তিনি দোকানিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ খরিদ্দার কেউ এসেছিলো কিনা।

'না মহারাজ, আসেনি কেউ।' দোকানি মাথা নেড়ে জানালো।

বললো : 'তবে এক গাড়িওয়ালা এসেছিলো। আর আমার কাটারিখানা নিয়ে তার গাড়িটা সারিয়ে নিলো।'

'কাটারি তোমার ফেরৎ পেয়েছো ?'

'তা পেয়েছি, মহারাজ।'

রাজা কিন্তু দোকানিকে তার মজুত মাংসটা মেপে দেখতে বললেন। আর দেখা গেল বিশ কেজির মত সেরা চাপের মাংস ঘাটতি পড়েছে। এবং এটা যে কার হাত সাফাই রাজার বুঝে নিতে দেরী হোল না।

তিনি অমনি জেলখানায় ছুটলেন। বুড়ো চোরকে সব কথা তিনি জানালেন। তাই শুনে সে বলে উঠলো :

'আপনাকে আমি বারবার বলছি মহারাজ। ও মহা শেয়ানা চোর। সহজে ওকে বাগ মানান যাবে না।'

'এখন তা হলে কি করবো ?'

'ঢেড়া পিটিয়ে ঘোষণা করুন : চোর যদি তার সঠিক পরিচয় দেয় তাহলে আপনি আপনার ধন-দৌলত, রাজমুকুট সবই তাকে দিয়ে দেবেন। এমন কি রাজকন্যার সংগে তার বিয়ে দেবেন। আপনার পরিবর্তে সেই হবে রাজা।'

রাজা তাই করলেন। বুড়ো চোরের কথা মত ঘোষণাপত্র লিখে মাঠ-ঘাট, হাট-বাজার, নগর-দ্বারে সর্বত্র তা টাঙিয়ে দিলেন।

ঘোষণা পত্রটি চোরের চোখেও পড়লো। সে ভাবলো নিজের পরিচয় দিয়ে রাজার কাছে ধরা দেবে কিনা। তা হলে রাজ্য শুদ্ধ বিপুল ধন-দৌলতের মালিক হবে সে। এমন কি, রাজকন্যাকেও লাভ করবে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে—পর মুহূর্তে সে ভাবলো, রাজা তাকে ধরতে পেরে শূলে দেবে তার কৃতকর্মের জন্য। তা হোক, একবার যদি সে রাজাই বনে যায়, তা হলে চোর বানিয়ে তাকে আবার শূলে দেবে কি করে ? রাজাকে কি শূলে দেওয়া যায় ? ঝুঁকি সে নেবে, মনে মনে ঠিক করল।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে সিধে রাজ-দরবারে এসে হাজির হোল। রাজার কাছে গিয়ে বললো : 'মহারাজ, আমিই সেই চোর।'

'তুমিই চোর ?'

'হ্যাঁ মহারাজ, আমিই।'

রাজা আপাদ-মস্তক ওর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। রাজ্য

আর রাজকন্যার লোভে চোর সেজে আর কেউ আসে নি তো? নইলে চোর কবে চোর বলে ধরা দিতে আসে? তাই বললেন: 'তুমি যে চোর আমি তা মেনে নেবো যদি 'তুমি হাতে-নাতে প্রমাণ দিতে পারো।'

রাজা একটু থামলেন। তারপর রাজপথের একটা গরুর গাড়ি দেখিয়ে বললেন: 'তুমি যদি গাঁয়ের ওই চাষীর একটা বলদ চুরি করে আনতে পারো, তবে বুঝবো, হ্যাঁ, তুমি পাকা চোর বটে। কি রাজি?'

হ্যাঁ মহারাজ, এ আর বেশী কি? দেখুন পারি কি না।'

এই বলে চোর গাঁয়ের লোকটির গোরুর গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। আর যেতে যেতে সমানে চিৎকার করে বলতে লাগলো:

রীতিমত নাটক—রীতিমত নাটক।
দেখে যান—দেখে যান
নইলে পরে পস্তাতে হবে—পস্তাতে॥

গাঁয়ের লোকটি তার বলদ দুটিকে পথের মাঝখানটায় থামিয়ে বলে উঠলো: 'কোথায় ভাই, কোথায় হচ্ছে?'

'শহরের শেষ মাথায়।'

'তাই নাকি? তবে তো একবার দেখতে হয়।' গাঁয়ের লোকটি বলে উঠলো আপন মনে—'গাঁয়ে থাকি—নাটক থিয়েটার তো আর দেখা হয় না। গিয়ে একবার দেখতে হয়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও ভাই। না দেখলে পরে পস্তাতে হবে। এ সুযোগ আর পাবে না।'

'হ্যাঁ ভাই, যাই' গাঁয়ের লোক হন-হন করে এগিয়ে গেলো কিছুদূর। তারপর সে ফিরে দাঁড়ালো। চোরকে ডেকে বললো: 'তা ভাই, আমি তো যাচ্ছি, তুমি আমার গরু দুটোকে একটু দ্যাখ। এই আমি যাব আর আসব, দেরী হবে না মোটে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি যাও। আমি ঠিক দেখবো।' চোর পুংগবটি সংগে সংগে সায় দিল। বললো: 'রীতিমত নাটক—দেখে এস। এমন সুযোগ পাবে না আর।'

এদিকে গাঁয়ের লোক চোখের আড়াল হতে না হতে শহুরে চোর করলো কি, একটা বলদকে জোয়াল থেকে খুলে নিলো। কিছুদূরে গিয়ে সে তার ল্যাজের ডগাটুকু কেটে নিলো আর নিয়ে গিয়ে তা অপর

বলদটার মুখের মধ্যে গুঁজে দিলো। তারপর তাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে সে ল্যাজকাটা বলদটাকে নিয়ে রাজার কাছে এসে হাজির হোল। বললো ঃ 'এই নিন মহারাজ, আপনার বলদ।'

ল্যাজ-কাটা বলদ দেখে মহারাজ তো হেসে খুন। কোন রকমে হাসির ফোয়ারা থামিয়ে তিনি বলে উঠলেন ঃ

'আরে, ল্যাজকাটা এ গরু কোত্থেকে তুমি জোগাড় করলে?'

রাজা আবার গড়াগড়ি খেতে লাগলেন হাসির চোটে।

'তা করতে হোল মহারাজ। তবে আমি আর কি বলবো। যার গরু তার কাছেই শুনতে পাবেন সব।' চোর জবাব দিলো।

একটু পরে হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে রাজদরবারে এসে হাজির হোল গাঁয়ের লোকটি। কোন রকমে কান্না থামিয়ে বললো ঃ 'সর্বনাশ হয়েছে মহারাজ! আমার একটা বলদ আর একটাকে খেয়ে ফেলেছে!'

'খেয়ে ফেলেছে?'

'হ্যাঁ মহারাজ, মুখে এখনও ল্যাজের ডগাটা লেগে আছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, মহারাজ।'

'তুমি তোমার বলদ দেখলে চিনতে পারবে?'

'তা পারব।'

রাজা তখন চাষীর ল্যাজ-কাটা গরুটি নিয়ে আসতে হুকুম করলেন চাকরদের। চাকররা গরুটি নিয়ে এলো। তাই দেখে সে তখনই বলে উঠলো ঃ 'হ্যাঁ মহারাজ! খায় নি এখনও। ওই তো আমার ধলা বলদ।'

'হ্যাঁ, খায়নি। গরু গরু খায় না। তোমার গরু তুমি নিয়ে যাও। সঙ্গে আরও দুটো গরু দিলাম। যাও, ভালো করে চাষ-বাস করগে।'

রাজা এবার শেয়ানা চোরের দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন ঃ 'তুমি বেশ চালাক চতুর। তোমার বুদ্ধি দেখে আমি খুব খুশী হলাম। তোমার সঙ্গে আমি রাজকন্যার বিয়ে দেবো। রাজাও করবো আমার জায়গায় তোমাকে। কিন্তু তার আগে তোমার বুদ্ধিপনা আর একবার যাচাই করে নেব।'

'হ্যাঁ, মহারাজ, নির্দেশ দিন কি করতে হবে।'

'গীর্জার ওই বুড়ো পুরোহিতকে পাকড়াও করে আমার কাছে

আনতে পারবে ?'

'সে আর এমন কি। পারবো মহারাজ !'

শেয়ানা চোর জবাব দিলো।

সে তখন রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলো। বিদায় নিয়ে গেলো বাজারে। বাজারে গিয়ে গুণে গুণে তিনশ'টি বড়ো কাঁকড়া কিনলো সে আর কিনলো তিনশ'টি মোমবাতি। তাই নিয়ে সে চুপি চুপি গীর্জায় গিয়ে ঢুকলো। গীর্জার চাতালে কিছুক্ষণ সে ঘুপটি মেরে দাঁড়ালো। যেই দেখলো পাদরী সাহেব বিড়বিড় করে আপন মনে বাইবেল আউড়ে চলেছেন, তখন সে করলো কি, আপন থলে থেকে এক একটা করে কাঁকড় বার করে কাঁকড়ার পায়ের সংগে মোমবাতি বেঁধে আলো জ্বালিয়ে ছেড়ে দিতে লাগলো। দেখতে দেখতে সারা গীর্জাঘর আলোয় আলোকময় হয়ে উঠলো।

বাইবেল পাঠ করতে করতে পাদরী সাহেব সহসা দেখতে পেলেন অসংখ্য আলো। আলো দেখে তিনি ভাবলেন, দেবদূতদের শুভ আগমন হয়েছে বুঝি তাঁর গীর্জায়। তাই তিনি বিড়বিড় করে উঠলেন ঃ

'হে পরম পিতা, যিশু, আমি কি এতই পুণ্যবান যে আপনি আমার প্রতি সদয় হয়েছেন। দেবদূতদের পাঠিয়েছেন আমায় নিয়ে যেতে স্বর্গরাজ্যে ?'

বুড়ো পাদরী হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে বসলেন

চোর দেখলো এই সুযোগ। সে অমনি চাতালের আড়াল থেকে বলে উঠলো ঃ 'পরম পিতা তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন। তিনি তোমায় স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যাবার জন্য দেবদূতদের পাঠিয়েছেন '

'কিন্তু আমি যাবো কি করে ?' বুড়ো পাদরী শুধালো।

'সিঁড়ির মুখে রয়েছে থলে। তার মধ্যে ঢুকে পড়ো শিগগির। দেবদূতরা নিয়ে যাবেন।'

বুড়ো পাদরী তাই করলেন। স্বর্গরাজ্যে যাবার জন্য সুড়সুড় করে থলের মধ্যে তিনি ঢুকে পড়লেন। শেয়ানা চোর ওৎ-পেতে ছিলো। পাদরী সাহেব যেই থলের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন, অমনি সে তার মুখটা বেঁধে দিলো। আর পাদরী শুদ্ধু থলেটি টানতে টানতে নিয়ে চললো

রাজার কাছে। বললো: 'এই নিন মহারাজ, পাদরী সাহেব স্বর্গরাজ্যে যাবেন। আপনার কাছে তাই নিয়ে এলাম।'

পাদরীকে থলের মধ্যে দেখে রাজা হাসিতে ফেটে পড়লেন। হাসতে হাসতে বললেন: 'আহা, থলের মুখটা খুলেই দাও। বুড়ো মানুষ, এতক্ষণে বুঝি দম আটকে মরেই গেছেন।'

নিজে হাতে তিনি থলের মুখটা খুলে দিলেন।

তারপর দিন-ক্ষণ দেখে একদিন রাজকন্যার সঙ্গে চতুর চোরের বিয়ে দিলেন। রাজ্যের ভারও দিলেন তার হাতে তুলে। আর নিজে নিলেন অবসর।

২২

এক ছিল এক পর্বত। সে পর্বতে ছিল এক বন। আর সে বনের মধ্যিখানে ছিলো একখানি কুঠির। আর এ কুঠিরে বাস করতো একটি মেয়ে। আর তার বাবা-মা চার ভাই। নাম ম্যারা।

এখন হয়েছে কি, এ বনে প্রায় শিকারে আসতো সুন্দর এক যুবক। সুন্দর যুবকটি প্রতিদিন শিকারে এসে যেত মেয়েটির কুঠিরের পাশ কেটে। ভুলেও কিন্তু কোনদিন তার সংগে একটু কথা বলতো না। এমন কি চোখ তুলে একবারটি তাকাতো না পর্যন্ত। সে যদি কোন দিন যেচে কথা বলতে যেত, যুবকটি তখন সরে পড়তো। যেন সে শুনতে পায়নি।

মেয়েটির মনে তাই খুব দুঃখ। নিশি-দিন তাই সে বসে বসে কাঁদতো। আর টেনে টেনে গাইতো ঃ

হে দূরদেশী, ওগো বিদেশী,
চোখ তুলে তাকাও একবার
দেহখানি আমার তুলে ধর
জড়িয়ে ধর বুকে ;
আমায় খাও চুম্বন
আমি যে ওগো তোমায় ভালবাসি।···

শিকারী কিন্তু মেয়েটির আকুল মিনতি কানে নিতো না। সাড়া দিত না তার কাতর আহ্বানের। উপায় নেই দেখে একদিন তাই সে স্মরণ নিলো শয়তানের—ব্যাং-এর।

শয়তান সংগে সংগে এসে হাজির। হাতে তার একখানি আয়না।

শয়তান এসে মেয়েটিকে শুধালো, তাকে সে স্মরণ করেছে কেনো ?

ম্যারা তখন সব কথা শয়তানকে জানালো, শয়তান সব মন দিয়ে শুনলো। তারপর বললো : 'ওঃ, এই ব্যাপার। তা আমি তোমায় সাহায্য করবো। তুমি কিছু ভেবো না।'

এই বলে শয়তান একখানা আর্শি ম্যারার হাতে দিলো। বললো : 'এটি তোমার কাছে রাখো। এটা দেখিয়ে তুমি তোমার প্রেমিকাকে বশ করতে পারবে। মন পাবে তার।'

শয়তান বিদায় নিলো।

পরদিন শিকারী যুবকটি শিকার করতে এলে মেয়েটি আয়নাখানা তার সামনে ধরলো। আয়নার মধ্যে নিজের মুখ দেখে শিকারী যুবকটি অমনি শিউরে উঠলো :

এ-সব শয়তানের কীর্তি! আয়নাতে নিজেকে নিজের মুখ দেখতে হোল।'

শিকারী যুবক ছুটে বেরিয়ে গেলো বন থেকে। বনের দিকে সে আর পা বাড়ালোনি।

ম্যারা আবার কান্না জুড়ে দিলো। তাই শুনে শয়তান এসে আবার দেখা দিলো। ম্যারা কাঁদছে কেন জিজ্ঞেস করলো। সে তখন সব বললো। আয়না দেখে শিকারী যুবক রাগ করে চলে গেছে জানালো সে।

শয়তান শুনে হেসে উঠলো। বললো : 'বাছাধন পালিয়ে আর যাবে কোথায়? আবার ফিরে আসতে হবে। তোমার মতো সেও মরেছে আমার হাতে। কেননা, আয়নাতে যে একবার নিজের মুখ দেখেছে, তার আর নিষ্কৃতি নেই। আমার স্মরণ নিতে হবে। আমারই অনুগত বস।'

শয়তান এবার থামলো। তারপর আবার বললো ঃ

'তা আমি তোমায় সাহায্য করবো। তবে তোমাকে তার মূল্য দিতে হবে কড়ায় গণ্ডায়।'

'হ্যাঁ, শোধ দেবো।'

'দেবে?'

'হ্যাঁ, দেবো।' যা বলবে তাই দেবো।'

'তোমার চারটি ভাই আছে না?'

'হ্যাঁ, আছে। আমি না হলে ওদের খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো হয় না।'

'ওদের দিতে হবে।'

'না। সে আমি পারবো না। ওরা আমায় ভালবাসে।'

'বেশ, আমি চললাম। আমায় আর ডেকো না।'

'না—না, যেয়ো না। আমি দেবো।' ম্যারা রুদ্ধকণ্ঠে বলে

উঠলো। বললো : 'দেবো। আমি তাহলে কি আমার আপন জনকে পাবো ?'

'হ্যাঁ, পাবে।' শয়তান উত্তর দিলো। 'আমি রাত্রে আবার আসবো।'

রাত যখন নিশীথ হোল, শয়তান তার কথা মতো ঠিক এসে হাজির। আর ম্যারা ঘুমন্ত চার ভাইকে এনে দিলো। শয়তান তখন ম্যারার চার ভাইকে দিয়ে বানালো চারগাছি বেহালার তার। বড়োজনকে দিয়ে বানালো মোটা তার ; মেজোজনকে দিয়ে আগের তারের চাইতে একটু সরু তার। সেজোজনকে দিয়ে আর একটু মিহি আর সব চাইতে ছোটজনকে দিয়ে বানালো পাতলা একগাছি সরু তার। শয়তান এবার ম্যারার দিকে ফিরে তাকালো। বললো :

'এবার তোমার বাবা আর মাকে চাই। নইলে আমি কাজ ফেলে চললাম।'

'তা হলে কি আমি আমার আপন জনকে পাবো ?'

'হ্যাঁ, পাবে।'

ম্যারা তখন শয়তানকে নিজের বাপ-মায়ের কাছে নিয়ে গেলো। শয়তান তার ঘুমন্ত বাপকে দিয়ে তৈয়ারি করলো বেহালার একটি সুন্দর খোল আর মা-র সোনালী সুন্দর চুলগুলি দিয়ে বানালো বেহালার ছড়টি।

শয়তান তখন অভিনব এই যন্ত্রটি বাজাতে লাগলো আপন মনে। শুনতে শুনতে ম্যারা মশগুল হয়ে গেলো। প্রথম প্রথম বেহালার বাজনা শুনে খুশির চোটে সে হেসে ফেললো।

কিন্তু একটু পরেই বুক ফেটে তার কান্না এল যখন বেহালা করুণ তান ধরলো শোকের মূর্চ্ছনায়।

বেহালা আর তার ছড়টি ম্যারার হাতে তুলে দিলো শয়তান। বললো : 'বসে বসে এখন বেহালা বাজাও। তোমার আপন জন তোমার কাছে এসে ধরা দেবে।'

এই বলে সে চলে গেলো। যেতে যেতে বললো : নয় দিনের দিন সে আবার আসবে।

'দেখতে দেখতে ন'দিন কবে কেটে গেলো সে দিকে তার খেয়াল নেই। সে তখন আপন মনে বেহালা বাজিয়ে চলেছে তো চলেছে। তার বেহালার বাজনা শুনতে শিকারী ছেলেটিও ছুটে এলো। আর মুগ্ধ হয়ে ম্যারার

বেহালার বাজনা শুনতে লাগলো।

শিকারী যুবকও যোগ দিল ম্যারার সঙ্গে হাসি-কান্নায় সুরের মূর্চ্ছনায়।

দেখতে দেখতে ন'দিন কেটে গেলো।

ন'দিনের দিন শয়তান আবার এসে হাজির। হেসে বললো : 'এই তো দুজনের মিলন হয়েছে। আপন জনকে পেয়ে গেছো। এবার চলো। যেতে হবে এখন।'

'না।'

'কোন ওজর নয়।' শয়তান জবাব দিলো—'তোমরা দু'জনেই আমার শরণাপন্ন হয়েছিলে। তোমরা আমার দাস। আমি তোমাদের প্রভু। তোমরা আমায় পুজো করো।'

'না—না—না, তুমি শয়তান!'

শয়তান তখন অট্টহাসি হেসে উঠলো। তারপর শিকারী আর ম্যারাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো চক্ষের নিমিষে।

আর বেহালাটি শুধু পড়ে রইলো গাছ তলায় অনাদর উপেক্ষায়।

অনেক দিন—অনেক রাত্রি কেটে গেলো। কেউ আর বেহালা বাজায় না। তোলে না কেউ আর সুরের মূর্চ্ছনা—হাসি-কান্নার সকরুণ তান।

একদিন এক গরিব জিপসী সে বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। যেতে যেতে গাছ তলায় সেই বেহালাটির উপর তার চোখ গিয়ে পড়লো। সে ছুটে গিয়ে বেহালাটি তুলে নিলো আর বাজাতে শুরু করলো। আপন মনে বেহালা বাজাতে বাজাতে সে তখন চললো গ্রাম-গ্রামান্তর হাট-বাজার, নগর-নগরপ্রান্ত দিয়ে। আর তার পিছু পিছু রাজ্য শুদ্ধ লোক চলতে লাগলো বেহালার বাজনা শুনতে শুনতে।

সেই থেকে বেহালা হোল জিপসীদের নিত্য সঙ্গী। তাদের হাসি-কান্নার দরদী বন্ধু।

২৬

একসময় এক ছিলো কিসান। কিসান আর কিসানী ছাড়া তাদের ছিলো তিন মেয়ে। ওরা ছিলো খুব গরীব। বয়সও হয়েছিলো। কাজ-কর্ম করার শক্তি ছিলো না ওদের গায়ে।

তাই একদিন বুড়ো ছোট মেয়েকে নিয়ে বনে গেলো ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহ করতে। এক গাছের নিচ থেকে বাপ আর মেয়ে যখন ব্যাঙের ছাতা তুলছিলো তখন ওখানে এসে হাজির হলেন গাঁয়ের জমিদার। জমিদারকে দেখে বুড়ো কিসান খুব ঘাবড়ে গেলো। তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে মাথার টুপি খুলে সে অভিবাদন জানালো জমিদার কর্তাকে। থতমত খেয়ে সে বলে উঠলো ঃ

'না কর্তা, আমি আপনার বন থেকে চুরি করে কাঠ কাটছি না। এই দেখুন না, ব্যাঙের ছাতা তুলছি খাবো বলে।'

'তা, তোল না যতো খুশি,' জমিদার কর্তা জবাব দিলেন বুড়োর মেয়েটির দিকে আড়চোখে বারবার তাকাতে তাকাতে। —'তোল না, তোমায় মানা করছে কে? তা বলি, ও মেয়েটা কে? তোমার পরিবার বুঝি?'

'ছিঃ ছিঃ, কর্তা। কি যে বলেন! পরিবার হবে কেন? ও যে আমার মেয়ে! ব্যাঙের ছাতা তুলতে এসেছে।'

'বেশ বেশ, ওকে তুমি আমার কাছে বেচে দাও। আমি তোমায় অনেক টাকা দেবো। বনের সব কটা গাছ কেটে নিতে দেবো।'

'তা কি হয় কর্তা! আপনারা হলেন কতো বড়ো লোক আর আমরা হলাম গরীব জিপসী। চেয়ে চিন্তে খাই। আপনার কত সুন্দর সুন্দর বউ আসবে। আপনার কি আমার মেয়েকে ভালো লাগবে?'

'সে আমি বুঝবো'খন। তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। এখন কত টাকা নেবে বলো?'

'তা আপনি যখন বলছেন, তখন কি আর—,' গাঁয়ের লোকটি কি যেন আরও বলতে যাচ্ছিলো। জমিদার কর্তা তাকে থামিয়ে দিলেন। ওর দু'হাতের মুঠোর মধ্যে একরাশ 'ডাক্যাট' গুঁজে দিয়ে তিনি বলে

উঠলেন : 'এ নাও। এ নিয়ে তোমার মেয়েকে আমায় দাও।'

অতগুলি কাঁচা টাকা পেয়ে কিসানটি কি করে উঠবে ভেবে পেলো না। বার কয়েক সে মাথা চুলকালো। তারপর টাকাগুলি পকেটে পুরে হন হন করে চললো সে এক ইহুদী বাড়ি। নিজ বাড়িতে গেলো না। ইহুদী বাড়ি গিয়ে সে তার কাছে কিছু খাবার ও পানীয় চাইলো। ইহুদী কিন্তু খাবারের বিনিময়ে চাইলো টাকা। বুড়ো কিসান তাকে জানালো যে তার কাছে কোন টাকা নেই। তবে জমিদার কর্তার দেওয়া 'ডাক্যাট'-গুলি রয়েছে।

তাই দেখে ইহুদী তাকে পেটভরে খেতো দিলো। পান করতে দিল পানীয়। তারপর এক সময় তাকে মাতাল বানিয়ে সর্বস্ব তার আত্মসাৎ করে নিলো। আর নামিয়ে দিলো পথে।

কিসান বুড়ো এক সময় বাড়ি ফিরলো। কিসান বুড়ি তাকে জিজ্ঞেস করলো : 'মেয়ে কোথায়? ওকে কোথায় রেখে এলে?'

'জানো গিন্নি, তোমার মেয়ের বরাত খুব ভালো।' কিসান বুড়ো তখন এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদলে। বললো: 'তোমার মেয়ের বরাত খুবই ভালো। এক জমিদার কর্তার তো পছন্দ হয়ে গেল তাকে দেখে। তাকে নিয়ে গেলেন সাদি করবেন বলে। দাস-দাসী চাকর-চাকরানী নিয়ে তোমার মেয়ে এখন রাজবাড়িতে সুখে শান্তিতে থাকবে।'

ও একটু থামলো। আবার বললো : 'তোমার আর দুই মেয়েকেও দাও, দিয়ে আসি। ওরাও থাকবে সুখে-শান্তিতে।'

'তা টাকা-কড়ি খাবার-দাবার কিছু আনলে না? ঘরে যে খাবার বাড়ন্ত!'

'এই যাঃ, একদম ভুলে গেছি! আমারও যে কিছু খাওয়া হয় নি। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। কর্তাবাবু বললেন কিনা, যাও, তোমার আর দুই মেয়েকে নিয়ে এসো। ওদেরও আমি রাজবাড়িতে নিয়ে যাবো। তাই তো আমি ছুটে এলাম।'

গিন্নি তখন অপর দুই মেয়েকে যেতে দিলো বুড়ো কিসানের সংগে। সে তখন করলো কি, বনে গিয়ে মেজো মেয়েটিকেও আর এক জমিদারের কাছে বিক্রি করে দিলো। আর পেলো ওই জমিদারের কাছ থেকে টুপি ভর্তি এক রাশ ডাক্যাট। ঐ 'ডাক্যাট' নিয়ে সে আবার

ছুটলো—বাড়িতে নয়, সেই ইহুদীর কাছে। আর যাবার সময় ছোট মেয়েটিকে ওখানটায় বসিয়ে রাখলো। বললো: 'তুমি এখানটায় অপেক্ষা করো। আমি তোমার জন্যে খাবার নিয়ে আসছি। কোথাও যেয়ো না।'

ইহুদী বাড়ি গিয়ে সে আবার খাবার চাইলো। ইহুদীও দাঁও বুঝে ওর টাকাটা সব আত্মসাৎ করে নিলো। আর বার করে দিলো তাকে ঘর থেকে। অবশ্য যাবার সময় ওর হাতে গুঁজে দিলো এক টুকরো রুটি।

ফিরে এসে রুটিখানা কিসান বুড়ো মেয়ের হাতে দিলো। তৃপ্তির সঙ্গে সে তাই খেলো।

এই সময় ওখানে এসে উপস্থিত হোল আর এক জমিদারবাবু। ছোট মেয়েটিকে দেখে তাঁরও খুব পছন্দ হয়ে গেলো। তিনিও তাকে কিনে নিলেন বিস্তর টাকা দিয়ে। কিসানটির হাতে অনেকগুলি ডাক্যাট গুঁজে দিয়ে বললেন:

'এ গুলি নিয়ে সিধে বাড়ি যাও। গিন্নির হাতে দেবে। ইহুদীকে নয়। তাহলে সব টাকাটা সে গাপ করে নেবে আবার।'

কিসান এবার তাই করলো। বাড়ি ফিরে সব টাকাটা সে গিন্নির হাতে তুলে দিলো। আর গিন্নির আনন্দ তখন দেখে কে?

এদিকে জমিদার কর্তা যাবার আগে কিসানকে ডেকে বললেন:

'দ্যাখো, এ বনে একটি সুন্দর দুর্গ আছে। দুর্গটি রুপোর। তাই বলছিলাম কি, তুমি শহরে যাও। শহরে গিয়ে ভাল দেখে কয়েকটা ঘোড়া কিনো। কিছু লোকও যোগাড় করো। তারপর বন কেটে রাস্তা বানিয়ে দুর্গ কোথায় খুঁজে দেখো। তুমি নিজে আর কাজ করোনা, তোমার লোকজনদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিও।'

কিসানটি তাই করলো। ঘোড়া কিনে একটা গাড়িও করে নিলো। তারপর নিজ গাঁয়ের লোক-জনদের নিয়ে ঠাকুরের নাম করে দুর্গ খোঁজার কাজে নেমে পড়লো। কিছু খোঁজা-খুঁজির পর দুর্গে যাবার সুন্দর একটা মজবুত পথও তারা পেয়ে গেলো।

এখন হয়েছে কি, সুন্দর ওই পথ ধরে ওরা যখন এগিয়ে যাচ্ছিলো তখন পথে এক বুড়ো ভিখেরীর সঙ্গে দেখা। ভিখেরীটি বুড়ো কিসানকে শুধালো:

'আচ্ছা, তোমার মেয়েগুলো কোথায়?'

আমাদের কিসান কিন্তু আগেকার কিসানটি নেই। ছোট মেয়ের দৌলতে তার এখন অনেক পয়সা। সেও এখন রীতিমত এক জমিদার। বুড়ো ভিখেরীর কথা সে কানেই তুললো না অবজ্ঞায়। কোন জবাব দিলো না ভিখেরীর প্রশ্নের।

ভিখেরী তাই চলে গেলো। কিন্তু এদিকে হয়েছে কি, বনের যে পথ ধরে সবাই এগুচ্ছিলো, সে পথটা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেলো। তার আর হদিশ পাওয়া গেলো না। সে জায়গায় দেখা গেলো অসংখ্য নদ-নদী খাল-বিল এসে জুড়ে রয়েছে। এখন উপায় ?

কিসান তাই মহা ফাঁপরে পড়লো।

এমন সময় আর এক ভিখেরী এসে তাদের জিজ্ঞেস করলো : 'আরে তোমরা এ বনে কি করছো ? এখানে যে কোন পথ নেই। বেরুতে পারবে না যে।'

'এখন উপায় ? যাই কি করে ?'

'কেন ? ঘোড়ার ল্যাজটা মলে দাও না একটু। পথ খুঁজে পাবে।' বুড়ো ভিখেরী জবাব দিলে।

এক ছোকরা ঘোড়ার ল্যাজটা একটু মলে দিলো আর ঘোড়াটা অমনি ছুটতে লাগলো নতুন এক পথ ধরে। দুর্গে যাবার নতুন পথ পেয়ে সকলের আনন্দ আর ধরে না। ওরা সবাই বুড়ো সেই ভিখেরীকে ধন্যবাদ জানাতে গেলো। কিন্তু তাকিয়ে দেখে ভিখেরীটি কোথাও নেই। উধাও হয়েছে কখন। ওরা তবু তার উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে মাথায় ঠেকালো। কেন না, তাদের বুঝতে বাকি রইলো না যে ভিখেরীটি আর কেউ নন, সাক্ষাৎ ভগবান। বিপদে তাদের সাহায্য করতে এসেছিলেন।

সে যাই হোক, বুড়ো কিসান আর কিসানী সেই দুর্গে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো তাদের লোকজনদের নিয়ে। সে আর গাঁয়ের কিসান নয়। রীতিমত এখন জমিদার।

দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে গেলো। দশ-দশ বছর পার হয়ে গেলো। কিসান একদিন কিসানীকে ডেকে বললো : 'দ্যাখো গিন্নি, ভগবান আমাদের তিন তিনটি মেয়ে দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু তাদের বেচে দিলাম টাকার লোভে। তাই ভগবান আমাদের আর ছেলের মুখ দেখালেন না।'

বুড়ো কিসান একটু থামলো। তারপর আবার বললো : 'আমাদের যদি একটি ছেলে থাকতো, তবে আমাদের সে দেখা-শুনা করতে পারতো।'

কথাটা বুঝি ভগবানের কানে গেলো। বুড়ি কিসানীর কোল জুড়ে এক ছেলে হোল। বুড়ো বাপ-মায়ের আনন্দ আর ধরে না। দেখতে দেখতে তিন বছর পার হয়ে গেলো। ছেলে দিন দিন বড় হয়ে উঠতে লাগলো। ছেলে তো নয়, যেন হীরের টুকরো। রূপে-গুণে জুড়ি নেই।

ছেলের যখন বয়স হোল বারো, বাবা তখন তাকে জার্মাণ স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আর ছেলেও দুদিনে জার্মাণ ভাষায় পারঙ্গম হয়ে উঠলো। লিখতে পড়তে শিখে নিলো দু'দিনের মধ্যে। বড়দের সঙ্গে টেক্কা মেরে চলার বিদ্যাও নিলো রপ্ত করে।

একদিন হয়েছে কি, আর আর দিনের মতো ছেলে স্কুলে যাচ্ছিলো। একটু বুঝি দেরী হয়ে গিয়েছিলো। হন হন করে তাই সে চলেছিলো একরূপ ছুটে। পেছন থেকে শুনতে পেলো তাদের স্কুলের দুটি ছেলে তাকে দেখিয়ে বলছে নিজেদের মধ্যে : 'জানিস ভাই, ওই যে ছেলেটা যাচ্ছে তার বাপ তার তিন মেয়েকে শয়তানের কাছে বেচে দিয়েছে টাকার জন্যে।'

কথাটা শুনার পর তার মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে উঠলো। পড়া-শুনায় আর মন বসাতে পারলো না। তাড়াহুড়ো করে কোন রকমে স্কুলের কাজ শেষ করে সে তখন বাড়ি ফিরে এলো। মা বুঝি তাকে দেখে খাবার যোগাড় করছিলো। ছেলে মাকে এড়িয়ে বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ওর বাবা ওকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, ছেলে তাকে থামিয়ে বলে উঠলো :

'তুমি একবার আমার ঘরে এসো, দরকারী কথা আছে।'

একটু পরে বাবা ওর ঘরে যেতেই সে বাবার পিছু পিছু দরজায় খিল আটকে দিলো। ড্রয়ার থেকে দুটো পিস্তল বার করে সে এবার ঘুরে দাঁড়ালো বাবার দিকে। বললো : 'তুমি যদি সত্যি কথা না বলো, এর একটা গুলি খরচ হবে তোমার জন্য আর অপরটা আমার।'

'কি কথা বাবা?—কি কথা?' বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

'আমার কি তিন বোন ছিলো?'

'হ্যাঁ, তোমার তিন বোন ছিলো?'

'তুমি কি তাদের বেচে দিয়েছিলে টাকার জন্য?'

'তা বেচে দিয়েছিলাম। তবে যারা কিনেছিলো তাদের চিনি না।'

'ঠিক আছে। তুমি বাজারে যাও বাবা। আমার জন্য একটা আপেল কিনে এনো। আপেলটার ওজন যেন আধ কেজি মতো হয়।'

একটু পরে ওর বাবা বাজার থেকে প্রকাণ্ড একটা আপেল কিনে এনে ছেলের হাতে দিলো। আপেল পেয়ে ছেলে খুশি হোল খুব। আর বিদেশে যাবার জন্য নিজে প্রস্তুত হতে লাগলো। যাবার দিন বাবা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো:

'সাবধানে থেকো বাবা; ভগবানের নাম স্মরণ করো। তোমার সঙ্গে আমার হয়তো এই শেষ দেখা। বুড়ো হয়েছি, বেশী দিন আর বাঁচবো না, বাবা।'

রুদ্ধ আবেগে বাবা-মা ছেলেকে বিদায় দিলো।

কিছু দূর গিয়ে সে দেখে, এক মাঠে দু'ভাই তুমুল মারামারি করছে। সে গিয়ে তাদের থামালো। ধমকিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলো: 'তোমরা দু'জন অমন মারামারি করছো কেনো?'

ওরা তখন বললো: 'জানেন ছোট কর্তা, আমাদের বাপ-মা কিছুদিন হোল মারা গেছেন। বাবা মারা যাবার আগে একটা ঘোড়ার জিন আর একটা গা-ঢাকা আবরণ আমাদের দু'জনকে দিয়ে যান। এবং বলে যান, যে জিন নেবে সে আর গা-ঢাকা আবরণটি নেবে না। দাদা এখন দুটোই হাত করতে চাইছে।'

ছোটভাই অভিযোগ করলো।

বড় ভাই বললো: 'না, কর্তা। বরং ছোটই বাপের দুটো জিনিষই আত্মসাৎ করতে চাইছে। আপনি এর একটা বিহিত করুন।'

'দাঁড়াও করছি।' ছোট কর্তা জবাব দিলে।

—'আমি আমার হাতের এ আপেলটি ছুঁড়ে দিচ্ছি মাঠে। যে আগে গিয়ে আপেলটাকে কুড়িয়ে আনতে পারবে বাপের সবই সে পাবে।'

এই বলে ছোট কর্তা হাতের আপেলটা মাঠের মাঝখানে অনেক দূরে

ছুঁড়ে দিলো। আর গড়িয়ে যাওয়া আপেলটাকে ধরবার জন্য দু-ভাই ছুটলো মাঠে। এরই ফাঁকে ছোট কর্তা ওদের ঘোড়ার জিন আর গা-ঢাকা আস্তরনটি গায়েব করে ওখান থেকে কেটে পড়লো এক সময়।

ছোট কর্তা হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর এগিয়ে এলো। এক সময় সে করলো কি, ঘোড়ার জিনটাকে হাতে নিয়ে বলে উঠলো :

'আমার ছোটদি যেখানে আছেন আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।'

যেই না বলা অমনি ঘোড়ার জিনটি ছোট কর্তাকে শাঁ-শাঁ করে আকাশ পথে উড়িয়ে নিয়ে চললো যেখানে তার ছোট দিদি ঘুমিয়ে আছে নিঝুম পুরীতে। নিঝুম পুরীর দ্বার পথে দাঁড়িয়ে সে আবার হাঁক ছাড়লো :

ছোট দি. ছোট দি, দরজা খোলো. আমি তোমার ছোট ভাই। আমাকে ভেতরে আসতে দাও।'

ছোট কর্তার হাঁক-ডাকে ছোট দিদির ঘুম ভেঙে গেলো। ধড়ফড় করে সে বিছানার উপর উঠে বসলো। বললো : 'বিশ বছর আমি এক নাগাড়ে ঘুমিয়ে আছি কেউ আমার ঘুম ভাঙায় নি। এ আবার কে? ছোট ভাই আবার আমার কোথা থেকে এলো?'

'হ্যাঁ দিদি, আমি তোমার ছোট ভাই। এই দ্যাখো প্রমাণ।'

এই বলে সে একখানা রুমাল তার দিদির হাতে দিলো। রুমালখানায় ছিলো তার বাবা-মা ও ভাইয়ের নাম লেখা।

দিদি তখন ভাইকে ভিতরে ঢুকতে দিলো। বললো : 'এতদিন পর এলি তো ভাই, কিন্তু তোকে এখন লুকবো কোথায়? তোকে দেখলেই তো তোর দাদাবাবু খেয়ে ফেলবে।'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমার ব্যবস্থা আমি করবো। আমার কাছে একটা গা-ঢাকা আলখাল্লা আছে। ছদ্মবেশী ওটা পরে আমি দাদাবাবুর চোখের আড়াল হয়ে থাকবো।'

'বেশ, তাই থাকিস।'

দিদি আবার মরার মতো শুয়ে পড়লো।

একটু পরে দৈত্য জামাইবাবু বাড়ি ফিরলো। দিদি জেগে উঠে তাকে খেতে দিলো। দিদি একসময় বললো : 'ওগো জানো, কাল আমি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।'

জামাইবাবু বললো : 'কি স্বপ্ন গো?'

'স্বপ্ন দেখছিলাম আমার নাকি একটা ভাই আছে।'

'ভাই? তাই নাকি!'

'কিন্তু সে যদি কোনদিন আমার কাছে আসে, তুমি তাকে খেয়ে ফেলবে না তো?'

'খাবো কেনো? তোমার ভাই, তার সংগে আমার কি খাবার সম্পর্ক?'

'ওগো ঠিক বলছো, খাবে না তো?'

'খাবো না, খাবো না, খাবো না। বরং খেতে দেবো পেট ভরে।'

ছদ্মবেশী আলখাল্লাটার দিকে চেয়ে ছোটদি তখন ভাইকে ডাকলো। —'বেরিয়ে আয় ভাই, তোকে তোর দাদাবাবু দেখতে চাইছে।'

ছোট ভাই তখন আলখাল্লার ছদ্মবেশী আবরণ ফেলে দৈত্য জামাইবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালো। জামাইবাবু তাকে দেখে খুশি হোল। বললো: 'তোমার ভাইয়ের তো বেশ নাদুশ-নুদুশ চেহারা গো!'

এই বলে দৈত্য জামাইবাবু শালাকে পেট পুরে খেতে দিলো। পানীয় এনে দিলো। তারপর বাইরে গিয়ে নিজের দাদাদের ডেকে আনলো। সংগে তাদের স্ত্রীদের—তার দুই বড় দিদিকে। ছোট ভাইকে পেয়ে সকলের মনে স্ফূর্তি আর ধরে না। খানা-পিনার ধুম পড়ে গেলো। এরই ফাঁকতালে দৈত্যপুরীর এক রূপসী কন্যার সংগে ছোট ভাইয়ের মন দেয়া-নেয়ার পালাও ঘটে গেলো। দৈত্যপুরীর সুন্দরী সেই মেয়েটিকে সে বিয়েই করে বসলো।

এমনি ধারা হাসি গল্প-গুজবে দশ বছর কেটে গেলো দৈত্য-পুরীতে। একদিন সে তার দিদিদের বললো:

'দিদি আমি এবার যাই। দশ বছর হোল এখানে এসেছি। বাবা-মাকে অনেক দিন দেখিনি। তাঁরা কি আর বেঁচে আছেন?'

জামাইবাবুদের কাছ থেকেও সে পরদিন বিদায় নিলো। - যাবার সময় ওরা তাকে একগাদা মনি-মুক্তো টাকাকড়ি উপহার দিলো।

বউ নিয়ে দিদির বাড়ি থেকে সে রওনা হোল। দিদির বাড়ির পাশেই ছিলো ছোট একখানি গাছ-গাছালীর বাগান। বাগানে নিচু একটা চারাগাছ গজিয়ে ছিলো। গাছটা ছিলো ভারী সুন্দর। বউ-এর পছন্দ হয়ে গেলো। সে বায়না ধরলো, গাছটা তাকে তুলে দিতে হবে। বাড়ি নিয়ে গিয়ে সে পুঁতবে। বড়ো করবে।

সে আর করে কি, বউ-এর মন রাখতে চারা গাছটাকে তুলে আনলো। আর বউ তার বাড়ি গিয়ে ওটাকে পুঁতে রাখলো।

এখানে একটা কথা বলে রাখি চুপি চুপি। ঐ গাছটা কিন্তু সত্যিকারের চারাগাছ নয়। ছদ্মবেশী এক দানব। এ কথা ওরা কেউ জানতে পারলো না।

ছেলে ও ছেলের বউকে এতদিন পরে বাড়ি ফিরতে দেখে বাপ-মা দু'জনেই মহাখুশি। মা-তো ফুটফুটে ছেলের বউকে বরণ করে নিলো সোনার মোহর দিয়ে।

সুখে-শান্তিতে দিন গড়িয়ে চললো।

দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেলো। কোল জুড়ে এক পুত্র-সন্তান এলো নতুন বউ-এর। শহরের পাদরী সাহেবকে খবরটা দেবার জন্য ছুটলো ছোট কর্তা। গীর্জায় নবজাতককে নিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিতও করে আনা হোল। এ উপলক্ষে খানা-পিনারও বেশ ভালো আয়োজন করা হোল। নিমন্ত্রিতরা খাওয়া-দাওয়া করলো পেট পুরে। নিমন্ত্রিত অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে জানাতে রাত অনেক হয়ে গেলো। ছোট কর্তা নতুন বউকে নিয়ে যখন নিজ ঘরে শুতে এলো তখন রাত প্রায় শেষ। তবু সে একটু ঘুমিয়ে নিলো। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখে, পাশে-শোয়া তার বউ নেই। এমন কি বাচ্চা সন্তানটিও নেই।

চারদিকে সবাই খোঁজা-খুঁজি করলো অনেক। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলো না ছেলে আর তার মাকে। সে সংগে বাগানে পোতা সেই গাছের চারা'টও।

এই ভাবে গেলো কিছুদিন।

একদিন ছেলে বুড়ো বাবার কাছে গিয়ে বললো: 'বাবা, আমি দিন কয়েকের জন্য একবার বাইরে যেতে চাই।'

বুড়ো বাবার মনেও দুঃখ কম নয়। তবু বললেন: 'কোথায় যাবে বাবা, বুড়ো বাপ-মাকে ফেলে?'

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বাপেরও বুঝি বুক ফেটে কান্না আসছিলো। তিনি আর আপত্তি করলেন না। বললেন:

'বেশ যাও। গিয়ে ওঁদের খোঁজ-খবর করে দেখো। যাবার সময়

টাকা-কড়ি সংগে নিও বেশি করে। ভালো একটা ঘোড়াও নিয়ো সঙ্গে।'

ছোট কর্তা তাই করলো। বিস্তর টাকা-কড়ি নিয়ে সে রওনা হোল বাড়ি থেকে।

যেতে যেতে সামনে পড়লো বিরাট এক বন। গভীর এই বন-প্রান্তর ধরে কিছু দূর যেতেই মুষলধারে নামলো বৃষ্টি। আর বৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে সে আশ্রয় নিলো প্রকাণ্ড একটা ওক গাছের নিচে।

আশ্রয় তো নিলো। কিন্তু বৃষ্টি থামবার আর নাম নেই। ওক গাছটায় হেলান দিয়ে তার বুঝি একটু তন্দ্রার মতো এসেছিলো। হঠাৎ তন্দ্রার ঘোর তার কেটে গেলো। সে শুনতে পেলো একটা শিশু কাঁদছে যেন কোথায়। সে এদিক-ওদিক তাকালো। দেখলো : সত্যি, ফুটফুটে একটা ছেলে।

ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেলো সে। গিয়ে বলে উঠলো :

'আহা, এ কাদের ছেলে কাঁদছে গো?'

'তোমার ছেলে।' কে যেন আড়াল থেকে বলে উঠলো।

'আমার ছেলে? আমার ছেলে এখানে এলো কি করে?'

সে ফিরে তাকালো। দেখলো, তার বউ দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। দেখেই সে বলে উঠলো :

'তুমি? তুমি এখানে?'

বউ তখন তাকে সব কথা বললো। বাগানের চারা গাছটা যে গাছ নয়, একটা দানব তাও জানালো। বললো, কি করে সে তাদের চুরি করে নিয়ে এসে এই ওক গাছটায়—তার নিজের দৈত্যপুরীতে বন্দী করে রেখেছে। বউ এবার কেঁদে ফেললো :

'আমায় বাঁচাও, ওগো আমায় বাঁচাও।'

'বাঁচতে চাওতো একটা কাজ করতে পারবে?'

'কি কাজ?'

'এই দৈত্যপুরীর চাবি কোথায় জানতে পারবে?'

'পারবো।'

'সে সংগে জেনে নিও, তার মরন-কাঠি জীয়ন-কাঠি বাঁধা আছে কোথায়?'

বউ তাই করলো। দৈত্য ফিরে এলে সে তাকে পাত ভর্তি করে

চব্য-চূষ্য পঞ্চ দ্রব্য খেতে দিলো। কড়া পানীয় দিলো। ছেনালী করে এক সময় ওর কাছ থেকে জেনে নিলো, দৈত্যপুরীর চাবিটা কোথায় রয়েছে। দৈত্য কিন্তু কিছুতেই বলবে না। কিন্তু বউকে কপট অভিমান করতে দেখে বলে উঠলো :

'বলছি গো বলছি, রাগ করো না গিন্নি! এ বনেরই মাঝখানে রয়েছে খুব বড় একটা জালা। জালাটার মধ্যে আছে একটা গরু। গরুটার পেটে আছে একটা বাছুর। বাছুরটার পেটের মধ্যে আছে একটা রাজহাঁস। রাজহাঁসটার মধ্যে আছে একটা পাতিহাঁস। পাতিহাঁসটার পেটে আছে একটা ডিম। ডিমটা ভাঙলে তার মধ্যে পাবে একটা চাবি। ঐ চাবিটা দিয়েই খোলা যাবে ওক গাছের এই দৈত্যপুরীর দরজা।'

লম্বা ফিরিস্তি শুনে বউ এবার হেসে ফেললো ফিক করে। বললো : 'চাবি নিয়ে আমার কাজ নেই। তোমার চাবি তোমার কাছে থাক। আমি তো আর তোমায় ফেলে সত্যি সত্যি পালাচ্ছি না।'

বউ এবার দুহাত বাড়িয়ে দৈত্যের কণ্ঠলগ্ন হোল। বললো :

'তোমার চাবি তোমার কাছে থাক। আমার দরকার নেই। কিন্তু তোমার জীয়ন-কাঠি আর মরন-কাঠিটা কোথায় আছে গো?'

'আমার বাপু, জীয়ন-কাঠি মরন-কাঠি বলতে কিছু নেই। তবে আমি যখন পায়ে জুতো মোজা পরতে থাকব তখন যদি কেউ আমায় আক্রমণ করে আমি আর পেরে উঠবো না। আমার মৃত্যু হবে অনিবার্য। অন্য সময় কেউ আমায় কিছু করে উঠতে পারবে না।'

খাওয়া দাওয়া করে দৈত্য তারপর ঘুমিয়ে পড়লো। বউটি তখন বেরিয়ে এসে স্বামীকে তার সব কথা জানালো। স্বামী তার করলো কি, মাথার টুপির পালকটাকে সে শুকলে তিনবার। আর সংগে সংগে এসে হাজির হোল তার তিন দানব ভগ্নিপতি।

শালা বাবুকে গভীর জংগলে এভাবে দেখবে ওরা আশা করে নি। তারপর সব ঘটনা শুনে দৈত্যটাকে তিনজনে মেরে ফেললো তার জুতো মোজা পরার আগেই। আর বনের মাঝখানে বার করলো মস্ত বড় সেই জালাটি। জালাটা ভাঙতেই বেরিয়ে পড়লো একটি গরু। গরুটি কাটতেই তার থেকে বেরিয়ে এলো একটা বাছুর। বাছুরটার পেট থেকে বেরিয়ে পড়লো একটা রাজহাঁস। রাজহাঁসটার পেট থেকে বেরুলো একটা

-পাতি হাঁস। আর পাতি হাঁসটা কাটতে তার পেট থেকে এবার পাওয়া গেল একটা ডিম। এ ডিমটার মধ্যেই ছিলো দৈত্যপুরীর চাবিটা। ডিমটা ভাঙতেই বেরিয়ে পড়লো টুক করে সেই চাবিটা। আর সেই চাবি দিয়ে খোলা হোল দৈত্যপুরীর লৌহ কপাট।

মুক্তি পেলো নতুন বউ আর তার শিশু-সন্তান।

২৪

এক ছিলো এক গাঁয়ের চাষী। তার ছিলো তিন ছেলে। দুই ছেলে খুব চালাক চতুর। আর ছোট ছেলেটি বুদ্ধির ঢেকী। আকাট মূর্খ। বোকারাম।

সেও যাবে রাজবাড়ির ভোজে। বায়না ধরলো, সেও যাবে দাদাদের মত নিমন্ত্রণ খেতে।

মা কিন্তু আপত্তি জানালো। বললো: 'তুই একটা বোকা-সোকা মানুষ। রাজবাড়ির অতো লোকের মধ্যে তুই গিয়ে কি করবি?'

'না মা, দাদারা গেলো, আমিও যাবো।'

'না-না, রাজবাড়িতে তোর গিয়ে কাজ নেই। তুই বরং কাট চিরে উনানটা ধরিয়ে দেগে।'

তবু নেমন্তন্নে যাবার জন্য বারবার সে জিদ করতে লাগলো। মার কিন্তু সেই এক কথা।—'তুই যা, উনান ধরাগে।'

বোকারাম অগত্যা তাই করলো। উনান ধরাতে গেলো কাটচিরে। যাবার সময় বলে গেলো:

'আমায় তুমি যেতে দিলে না, মা। ঠাকুরের কৃপায় দেখে নিয়ো আমি কী না করি।'

এবং তাই হোল।

দেশের রাজা সেবার অতি উঁচু এক বুরুজ তৈয়েরি করলেন। বুরুজের তিন তলার এক ঘরে তিনি রাজকন্যাকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখলেন। এবং ঢেড়া পিটিয়ে রাজ্যময় ঘোষণা করে দিলেন: যে জন বুরুজে উঠে রাজকন্যাকে চুমু খেতে পারবে, তিনি তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেবেন। অর্ধেক রাজত্বও দেবেন ঐ সঙ্গে।

রাজার ঘোষণা শুনে দেশ বিদেশের কত রাজা মহারাজা রাজপুত্র এসে চেষ্টা চরিত্র করলো। কিন্তু পারলো না কেউ রাজকন্যাকে চুমু খেতে। কোন সিঁড়ি নেই। কোন মই নেই। অতি উঁচু বুরুজে ওঠে কি করে? তাই ফিরে গেল সবাই ব্যর্থ হয়ে।

রাজা তখন করলেন কি, নতুন করে ঘোষণা জারি করলেন যে, রাজ্যের

কিসানরাও এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবে। যদি রাজকন্যাকে কেউ চুম্বন করতে পারে তবে তার সংগে রাজকন্যার তিনি বিয়ে দেবেন। অর্ধেক রাজত্বও দেবেন।

রাজার ঘোষণা পত্র শুনে বুড়ো কিসানের দুই চালাক-চতুর ছেলে অমনি ছুটলো রাজবাড়ির দিকে। ভাবলে ঃ ওরা বুদ্ধিমান বুরুজে উঠে রাজকন্যাকে লাভ করতে পারবে। সেই সংগে রাজত্বও।

চালাক চতুর দাদাদের রাজবাড়ির দিকে রওনা হতে দেখে, হাদারাম ভাইটিও বেরিয়ে পড়লো। মাকে ডেকে বলে গেলো : 'মা, আমি জল আনতে যাচ্ছি ঝর্ণায়।'

এই বলে সে ঝর্ণার ধারে এক ঝোপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। একটা কঞ্চি নিয়ে তিন তিন বার সে ঝোপটায় আঘাত করলো। আর সংগে সংগে বেরিয়ে এলো সুন্দরী এক পরী। পরীটি তাকে শুধালো ঃ

'কে তুমি? কি চাও?'

'আমার চাই রুপোর একটা ঘোড়া; রুপোর পোষাক আর কিছু টাকা-কড়ি।'

পরীটি তাই এনে দিলো। এনে দিলো রুপোর একটি ঘোড়া, এক প্রস্ত রুপোর পোষাক আর বিস্তর টাকাকড়ি। তাই পরে রুপোর ঘোড়ায় চড়ে বোকারাম চললো রাজা-বাড়ির দিকে টগবগিয়ে।

কিছু দূর গিয়েই দেখা হোল তার চালাক চতুর বুদ্ধিমান দাদাদের সংগে। ওদের দেখে সে শুধালে ঃ

'কোথায় চললে তোমরা?'

'রাজবাড়িতে যাচ্ছি।'

'রাজবাড়িতে আজকেও নেমন্তন্ন আছে নাকি?'

'দূর বোকা, নেমন্তন্ন নয় রে! শুনিস নি? তা তুই-তো হাঁদারাম, শুনবি কোত্থেকে? রাজা যে ঘোষণা করেছেন, যেজন বুরুজে উঠে রাজকন্যাকে চুমু খেতে পারবে, তার সংগে তিনি রাজকন্যার বিয়ে দেবেন। অর্ধেক রাজত্বও দেবেন। আমরা তাই যাচ্ছি।'

'তা উঁচু বুরুজে উঠবি কি করে?'

'বুদ্ধি করে ঠিক উঠে যাবো দেখিস।'

'হুঁ, তারপর রাজকন্যা আর আর্ধেক রাজ্য!'

বোকারাম তখন করলো কি, ঘোড়া থেকে নেমে সে পাশের ঝোপ থেকে একটা আস্ত ডাল ভেঙে নিলো। আর তাই দিয়ে দুই দাদাকে সে সমানে পিটাতে লাগলো একসময়। তারপর দু'জনের হাতে তিনটে করে ডাক্যাট গুঁজে দিলো। বললো: 'এই বুদ্ধি নিয়ে তোরা রাজকন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিস! ভাগ, বাড়ি যা।'

এই বলে সে আবার ঘোড়ায় চেপে ছুটলো রাজবাড়ির দিকে। রাজবাড়িতে এসে সে সিধে গিয়ে দাঁড়ালো বুরুজের নিচে। ওর রুপোর পোশাক, রুপোর ঘোড়ার দিকে রাজা মহারাজা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। সে কিন্তু কারও দিকে চোখ তুলে তাকালো না। রাজকন্যার দিকে প্রকাণ্ড একটা লাফ দিলো। তাকে ছুঁই ছুঁই করেও না ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলো সে রাজসভা থেকে ঝড়ের মত। যেমন করে এসেছিলো ঠিক তেমনি করে গেলো বেরিয়ে।

সবাই তখন একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এ আবার কেমন ধারা কাণ্ড! রাজকন্যাকে চুমু খেতে পেরেও চুমু না খেয়ে চলে যাওয়া—এ আবার কোন দেশি ব্যবহার!

ঘোড়া ছুটিয়ে কিন্তু বোকা ছেলে ঝর্ণার ধারে ঝোপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘোড়া থেকে নেমে সে ঝোপের উপর তিন তিন বার আঘাত করলো। তখন ফুটফুটে সেই সুন্দর পরীটি বেরিয়ে এলো। বললো:

'কি চাই?'

'আমার পোশাক আর ঘোড়াটি নিয়ে যাও।'

এই বলে সে জলের পাত্রটা ঝোপের আড়াল থেকে হাতে তুলে নিলো তারপর সেটা জলে ভর্তি করে বাড়ি ফিরলো যথারীতি। মা তাকে দেখে বলে উঠলো:

'এতক্ষণ তুই ছিলি কোথায়?'

'বাইরে গিয়ে মাথার উকুন বাছছিলাম, মা। জামা ইজের সব খুলে রোদে দিয়েছিলাম।'

'তবু ভাল, বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে দেখছি ছেলের।' মা ওকে কিছুটা খেতে দিলো।

এদিকে বড়ো দুই ছেলে বাড়ি ফিরলো। আর মাকে বললো: 'জানো মা, আমরা যখন রাজবাড়ি যাচ্ছিলাম তখন কোত্থেকে এক রাজপুত্র

ঘোড়ায় চড়ে এসে আমাদের ধরে ফেললো। জিজ্ঞেস করলো আমারা কোথায় যাচ্ছি। পরণে তার র:পোর পোশাক ; ঘোড়াটিও তার র:পোর। দেখতে যা মানিয়েছিল ! আমরা তখন তাকে বললাম : 'তিন-তলা সমান উঁচ: ব:র:জে উঠে যে জন রাজকন্যাকে চ:ম: খেতে পারবে, রাজা তার সংগে বিয়ে দেবেন রাজকন্যার। অর্ধেক রাজ্যও তাকে দেবেন। তাই আমরা চলেছি রাজবাড়ি।'

একটু থেমে ওরা আবার বললো : 'এ শ:নে কিন্ত: রাজপ:ত্রটি ঘোড়া থেকে নেমে আমাদের পিটাতে শ:র: করলো একটা ডাল ভেঙে। তবে জানো মা, ও আমাদের তিন তিনটে করে ডাক্যাট দিয়েছে দ:'জনকে।'

ডাক্যাট পেয়ে মা খ:ব খ:শি। ওদের খেতে দিলো পেট ভরে। কিসান বাড়ির গিন্নি, ভাল মন্দ খাবারই চোখে দেখে না। তাই হাতে টাকা পেয়ে ছেলেদের পেট ভরে খেতে দিলো।

ব:দ্ধিমান ছেলে দ:'জন পরদিনও রাজবাড়ি রওনা হোল। তাই দেখে মা তার বোকা ছোট ছেলেকে ডেকে বললো :

'তুমি আর বসে আছো কেনো ? একটু পরে তো গিলতে আসবে। যা, ফোয়ারা থেকে জল নিয়ে আয়।'

বোকা ছেলে জলের পাত্র নিয়ে অগত্যা বের:লো। আর ঝর্ণার ধারে ঝোপের পাশে জলের পাত্রটাকে রেখে একটা ডাল দিয়ে সে ঝোপটায় তিন-তিন বার আঘাত করলো। আঘাত করতেই ফ:টফ:টে সেই স:ন্দরী পরীটি আবার বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলো : 'কি চাও ?'

'আমার চাই সোনার পোশাক, সোনার ঘোড়া আর এক কাঁড়ি টাকা।'

পরী তাই এনে দিলো। চক্ষের নিমিষের মধ্যে এনে দিলো ওর জন্য সোনার পোশাক, সোনার ঘোড়া আর এক কাঁড়ি টাকা। বোকা ছেলে তাই পরে ঘোড়ায় চড়ে চললো রাজবাড়ি।

পথে দেখা তার দ:ই দাদার সংগে। এবার আর সে ঘোড়া থেকে নামলো না। পাশে এক ঝোপ থেকে আস্ত একটা ডাল ভেঙে সে দ:'ভাইকে আচ্ছা করে পিটালো। তারপর তাদের হাতে দশটা করে ডাক্যাট দিয়ে সে আবার ঘোড়া ছ:টালো রাজবাড়ির দিকে। রাজাসভায় গিয়ে নামলো সে ঘোড়া থেকে। রাজবাড়ির সবাই—রাজা, মহারাজা, অমাত্য, আমন্ত্রিতের দল—সবাই তার সোনার পোশাক-আসাকের প্রশংসা করতে লাগলো। সে

কিন্তু কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করলো না। বুরুজের নিচে গিয়ে রাজকন্যার দিকে দিলো সে প্রকাণ্ড একটা লাফ। রাজকন্যাকে ধরে চুমু খেয়ে সে আবার লাফিয়ে পড়লো নিচে। তারপর ঝড়ের মত যে ভাবে এসেছিলো ঠিক সেই ভাবে সে বেরিয়ে গেলো। রাজবাড়ির পাইক-বরকন্দাজ, সৈন্য সামন্ত তাকে ধরতে গেলো বটে। কিন্তু কেউ আর তার নাগাল পেলো না। ঝরণার ধারে ঝোপের পাশে এসে সে নামলো ঘোড়া থেকে। ঝোপের উপর তিন তিন বার সে আঘাত করলো একটা কাঠি দিয়ে। আর ফুটফুটে সুন্দরী সে পরীটি বেরিয়ে এলো। পরীর হাতে সে তার সোনার পোশাক আসাক আর সোনার ঘোড়াটি দিয়ে নিজের ছেঁড়া আধ-ময়লা জামা ইজের সব নিলো আবার পরে। তারপর জলের পাত্রটা জলে ভর্তি করে সে বাড়ি ফিরলো। তাকে দেখে মা শুধালো ঃ

'কি রে, অত দেরি হোল কেন ?'

'জানো মা, আমি আমার জামা ইজেরটা খুলে রোদে দিয়েছিলাম। রাত্রে বড় ছারপোকায় কামড়াতো কিনা, হিঃ !'

বোকার মত সে দাঁত বার করে হাসলো।

মা কোন জবাব দিলো না। ছেলের হাতে খানিকটা খাবার মা তুলে দিলো। তাই নিয়ে সে চুল্লির পেছনে ছাইয়ের গাদাতে বসে চিবুতে লাগলো সশব্দে।

একটু পরে দু'দাদা তার বাড়ি ফিরলো। মা ওদের দেখে মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললো ঃ

'এ কি, তোদের এ দশা কে করলো ? অমন করে মার ধোর করলো কে ?'

'কালকের সেই রাজপুত্রটি মা। আজকেও যাচ্ছিলো রাজবাড়িতে সোনার ঘোড়ায় চেপে। সেই আমাদের মারলো। তবে হ্যাঁ, দু'জনকে দশ ডাক্যাট করে দিয়েছে। এই দেখো, মা।'

এই বলে দু'ভাই মার হাতে ডাক্যাটগুলি তুলে দিলো।

'টাকা নিয়ে আমার কাজ নেই। আমি আর তোদের রাজবাড়িতে পাঠাবো না।'

'জানো মা, ওই রাজপুত্রকে ধরবার জন্য রাজা চারদিকে প্রহরী মোতায়েন করেছে। এই ধরলো বলে ! রাজকন্যাকে চুমু খেয়ে বিয়ে না করে

পালিয়ে গেছে কিনা, তাই তো অতো ধড়পাকড়। পালিয়ে বাছাধন, যাবে কোথায় ?'

'ওর টিকিটিও দেখতে পাবে না বলে রাখলাম।' ছাইয়ের গাদা থেকে বোকারাম সহসা বলে উঠলো।—'ওর অনেক কলা কৌশল জানা আছে ঠাকুরের দৌলতে।'

'তুই চুপ কর ! বোকা-সোকা মানুষ, তুই আবার এ সব কথায় নাক গলাতে আসিস কেনো ? দেখে নিস, আমরা ওকে ঠিক ধরবো।'

'ধরো না, ও ঠিক পালাবে।'

তিন দিন পর দু'ভাই আবার রওনা হোল রাজবাড়ির দিকে। বোকারাম তখন ছাইয়ের গাদার উপর বসে উকুন মারছিলো। মা তাকে ডেকে বললো : 'যা, বন থেকে কিছু কাঠ কেটে আন। বসে বসে খালি পিণ্ডি গেলা।'

বোকারাম অগত্যা ছাইয়ের গাদা থেকে বেরিয়ে এলো। আর কাঠ কাটতে চললো বনে। ঝরণার পাশে ঝোপের ধারে সে গিয়ে আবার দাঁড়ালো। কাঠি দিয়ে ঝোপের উপর তিন-তিন বার আঘাত করতেই ফুটফুটে সেই সুন্দর পরীটি বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলো : 'কি চাও।'

'চাই হীরের পোশাক, হীরের ঘোড়া আর কিছু টাকা।'

পরী তাই এনে দিলো। আর বোকারাম তাই পরে রাজদরবারে গিয়ে হাজির হোল সটান। ওকে তখন সবাই ঘিরে ধরলো। সে কিন্তু বুরুজের নিচে গিয়ে রাজকন্যাকে তাক করে উঁচু একটা লাফ দিলো। এবং দ্বিতীয়বার রাজকন্যাকে চুমু খেলো। তার হাতের সোনার আংটিটা নিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো মাটীতে। তারপর ঝড়ের মত যেমন করে এসেছিলো তেমনি করে আবার বেরিয়ে গেলো পাশ কেটে। যারা তাকে ধরতে এসেছিলো তারা সবাই পড়ে রইলো পেছনে। যাবার সময় তার দুই বুদ্ধিমান দাদার সংগেও দেখা হয়েছিলো। এবার সে কিন্তু দাদাদের আর পিটায় নি। বরং তাদের হাতে বিশ ডাক্যাট করে গুঁজে দিলো।

বোকারাম ঝোপের কাছে এসে পরীকে ডেকে তার হীরের পোশাক আর হীরের ঘোড়াটি ফিরিয়ে দিলো। তারপর বন থেকে কাঠ নিয়ে দাদাদের আগে আগে বাড়ি ফিরলো।

মা ওকে দেখে এবার খুশি হোল। কিছু খেতে দিলো। বললো।

'হ্যাঁ, শুধু বসে বসে পিণ্ডি না গিলে, কাজকর্ম কিছু একটা কর। তোর দাদারা কত কাজের লোক।'

'হ্যাঁ মা, খুব কাজের।' খাবার নিয়ে যথারীতি সে ছাইয়ের গাদার পেছনে তার আস্তানায় আশ্রয় নিলো।

এ দিকে তার বুদ্ধিমান ভাইরা বাড়ি ফিরলো। ফিরেই মাকে ডেকে বললো: 'জানো মা, সে রাজপুত্রকে আজকেও কেউ ধরতে পারলো না। সকলের চোখে দিব্যি ধুলো দিয়ে বেরিয়ে গেলো নাকের ডগা দিয়ে।'

'তাই নাকি? তা তোদের মার-ধোর করেনি তো?'

'না মা, এবার মার-ধোর কিছু করে নি। আমাদের বরং বিশ ডাক্যাট করে দিয়ে গেছে। এই দেখো।'

ডাক্যাটগুলি ওরা মার হাতে দিলো। মা তাই নিয়ে বললো: 'না, কাল আর তোদের যেতে দেব না।'

'না মা, যাব না মা।'

কিন্তু তা আর খাটলো না।

রাজা অনেক ভেবে-চিন্তে আবার এক ভোজ দিলেন। ভাবলেন, দেশ বিদেশের যে সব রাজা, মহারাজা, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্ররা সব আসবে ভোজ-সভায়, রাজকন্যা তাদের মধ্যে ডানপিটে সে রাজপুত্রকে চিনতে পারবে। পরপর চার দিন খানা-পিনা চললো। কিন্তু পলাতক সে রাজপুত্রের পাত্তা নেই। একদিনও তাকে দেখতে পাওয়া গেলো না ভোজসভায়। রাজাও ছাড়বার পাত্র নন। রাজাও ঘোষণা করলেন শুধু রাজা মহারাজা নয়, দেশের সাধারণ মানুষ যত আছে—চাষা-ভুষা, রাজ্যের যত ভিখিরী—তাদেরও নিমন্ত্রণ করো। ওরাও আসুক। এমনকি র‍্যজ্যের প্রতিবন্ধক যতো আছে—বোকা-সোকা, খোঁড়া, অন্ধ—ওদেরও ডাকো। কেউ যেন বাদ না যায়।

পুরো সাতদিন ধরে খানা-পিনা রাজভোজ চললো। কিন্তু রাজপুত্রের আর দেখা নেই।

রাজা তখন তাঁর লোকজন পাইক বরকন্দাজদের হুকুম করলেন:

'যাও, বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ করে দেখো। বার করো সে লোককে যার হাতে আছে রাজকন্যার আংটি। যেখান থেকে পারো খুঁজে বার করতে হবে—বোকা-সোকা, পাগল-ছাগল যাই সে হোক।'

রাজার হুকুম। নড়ন-চড়ন হবার উপায় নেই। রাজবাড়ির পাইক-বরকন্দাজ, সৈন্য-সামন্ত সবাই তাই বেরুলো প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি তল্লাসি করে দেখতে। দেখতে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে কিনা।

খুঁজতে খুঁজতে রাজবাড়ির লোক বুড়ো কিসানের বাড়ি এসে হাজির। বোকারাম উনানের পাশে ছাইয়ের গাদার উপর বসে মাথার উকুন বাছছিলো। তাই দেখে ওরা চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ

'হ্যাঁরে, ওখানে বসে তুই কি করছিস? নেমে আয়, তোকে তল্লাসি করে দেখবো।'

'আমি যা করি, তাতে তোদের কী?'

বোকারাম সমানে জবাব দিলো।

বুড়ী কিসানী হাঁ-হাঁ করে উঠলো। বললো : 'না বাবা, ও একটা বোকা-সোকা মানুষ। কাকে কি বলে, ঠিক নেই।'

'তা হোক, বোকা হোক আর যাই-হোক, কিছু এসে যাবে না। রাজার হুকুম, আমরা তল্লাস করে দেখবো।'

বোকারাম তখন ছাইয়ের গাদা থেকে নেমে এলো। ওর হাতে রাজকন্যার আংটি দেখে রাজবাড়ির লোক-জন সব চিৎকার করে উঠলো ঃ

'হুঁ, তা হলে তুমিই সেই। এ তোমারই কীর্তি! বোকা নও, শেয়ানা শিরমণি!'

'হ্যাঁ, আমিই!'

'চলো রাজার কাছে। রাজা তোমাকে তলব করেছেন।'

নোংরা, ছেঁড়া, আধ-ময়লা পোশাক-পরা বোকাটাকে দেখে রাজা বলে উঠলেন ঃ 'এ কাকে ধরে আনলি? এ নয়। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে ওকে।'

'না মহারাজ, এ সেই। এই দেখুন ওর হাতে রাজকন্যার আংটি!'

'তাই নাকি? কই, দেখি!'

রাজা আংটিটা পরীক্ষা করে দেখলেন। তখন আর তাঁর মনে কোন সংশয় রইলো না। তিনি তখন রাজবাড়ির দর্জিকে ডেকে ওর জন্য তিন প্রস্ত দামী নতুন পোশাকের অর্ডার দিলেন। নতুন পোশাকে বোকারামকে কিন্তু বেশ খাসাই দেখাতে লাগলো। রাজা-রানীর খুব পছন্দ হয়ে গেলো। তারপর একদিন শুভ দিন-ক্ষণ দেখে তিনি রাজকন্যার সঙ্গে

বোকা কিসানপুত্রের বিয়ে দিয়ে দিলেন। সঙ্গে অর্ধেক রাজ্যও। প্রভুর আশীর্বাদে বোকা কিসানপুত্র আর রাজকন্যা সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলো।

এখন হয়েছে কি, ভিন দেশী এক রাজা বিস্তর সৈন্য সামন্ত নিয়ে বোকা কিসানপুত্রের শ্বশুর মশাইয়ের রাজ্য আক্রমণ করে বসলো। এ দেশ জয় করে সে প্রতিশোধ নেবে তার পুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে না দেবার। শুধু দেশ জয় করা নয় রাজকন্যাকেও সে জোর করে নিয়ে যাবে নিজের পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে।

সারা দেশে তাই সাজো সাজো রব পড়ে গেলো। দুই রাজপুত্র সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এই আক্রমণ রুখতে তাই ছুটলো যুদ্ধক্ষেত্রে। ওদের দেখা দেখি নতুন জামাইবাবুও গেলো যুদ্ধ করতে। সে কিন্তু যুদ্ধের মাঠে না গিয়ে রাস্তার পাশে এক ডোবায় মণ্ডুক নিধনে লেগে গেলো। মেতে গেলো রাজ্যের যত ব্যাং আছে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে। নতুন ভগ্নিপতিকে ডোবায় নেমে ব্যাং মারতে দেখে রাজপুত্ররা হেসে ফেললো। বললো ঃ

'ডোবায় নেমে কি করছো?'

'লড়াই করছি।'

'লড়াই! কার সঙ্গে?'

'ব্যাঙের সঙ্গে। দেখে যাও দাদা, কত মারলাম।'

দুই রাজপুত্র আর জবাব দিলো না। কেবল একে অপরের দিকে মুখ চাওয়া চাউয়ি করলো। ভাবলো ঃ কাণ্ড দেখ নতুন জামাইয়ের। বাবা এক খাজা জামাই পেয়েছেন বটে! ওরা আর মিথ্যা বাক্যব্যয় না করে ঘোড়া ছুটালো রণক্ষেত্রের দিকে।

রাজপুত্ররা চোখের আড়াল হ'তে ডোবা থেকে সে উঠে এলো। তারপর ঝরণার পাশে সেই ঝোপের উপর কাঠি দিয়ে তিন তিন বার আঘাত করলো। আঘাত করতে ফুটফুটে সেই পরীটি আবার বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করলো ঃ 'কি চাই তোমার?'

সে তখন চাইল তেজী একটা ঘোড়া, খুব ধারালো একখানা কিরিজ আর যুদ্ধের জমকাল পোশাক।

পরী তাই এনে দিলো সঙ্গে সঙ্গে। তাই পরে কিরিজখানা

কোমরে ঝুলিয়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে তেজী ঘোড়াটা ছুটালো সে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে। কিছু দূর যেতে না যেতেই তার দেখা হোল দুই রাজপুত্রের সঙ্গে। কোথায় ওরা যাচ্ছে জিজ্ঞেস করলো সে।

ওরা জবাব দিলো :

'আমারা যুদ্ধে যাচ্ছি।'

'চলো, আমিও যাচ্ছি।'

ওরা তিনজন একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পেঁছালো। কিন্তু কিসান-পুত্র এগিয়ে গিয়ে ঈশ্বরের দেওয়া তার ধারালো কিরিজখানা দিয়ে এক কোপে শত্রু সৈন্য সব কেটে দুখান করে ফেললো। যারা পালালো তারাই শুধু প্রাণে বাঁচলো।

কিসানপুত্র তখন ঘোড়া হাঁকিয়ে যুদ্ধের মাঠ থেকে বেরিয়ে এলো। ঝরণার ধারে ঝোপের পাশে গিয়ে পরীর হাতে তার যুদ্ধের পোশাক, ঘোড়া আর কিরিজখানা ফেরিয়ে দিলো। তারপর বাড়ি ফিরলো যথারীতি। সে যে যুদ্ধে গিয়েছিলো কেউ তা জানতেই পারলো না।

এ দিকে দুই রাজপুত্র বাড়ি ফিরলে রাজা তাদের জিজ্ঞেস করলেন : 'কি, তোরা যুদ্ধে যাস নি?'

'হ্যাঁ বাবা, আমরা গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার জামাই কি করছিলো, জানো?'

'কি করছিলো?'

'ডোবায় নেমে ব্যাং মারছিলো। তবে যুদ্ধ একখানা করলো বটে।'

'কে সে?'

'বিদেশী এক রাজকুমার। যেমন পোশাক-আসাক, তেমনি দেখতে। তেজী এক ঘোড়ায় চেপে তরবারি ঘুরাতে ঘুরাতে এলো। আর এক কোপে সব সৈন্যের মাথা কেটে যেমনি করে এসেছিলো তেমনি করে আবার চলে গেলো।'

রাজা শুনে খুশী হলেন। কিন্তু মেয়েকে ডেকে বললেন :

'জামাইয়ের কাণ্ডখানা শুনেছিস তো?'

'কি বাবা?'

'যুদ্ধে না গিয়ে সাত সকালে ডোবায় নেমে সে ব্যাং মারছিলো।'

'সে কি আমার দোষ বাবা ? তোমরাই তো ধরে-বেঁধে নিয়ে এলে। আর আমার কপালে জুটিয়ে দিলে। ভগবান যাকে দিয়েছেন তাকে ফেলি কি করে ?'

রাজকন্যা মুখ ভার করে আপন ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

পরদিন রাজপুত্ররা আর যুদ্ধে গেলো না। রাজা নিজেই গেলেন। জামাইকেও সংগে নিলেন। যেতে যেতে জামাই কিন্তু এক ফাঁক-তালে কেটে পড়লো। ঝর্ণার ধারে ঝোপের পাশে গিয়ে সে ফুট ফুটে সেই পরীর কাছ থেকে তার যুদ্ধের পোশাক, তেজী ঘোড়া আর ধারালো সেই কিরিজখানা চেয়ে নিলো। আর তাই পরে ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধে চললো সে কিরিজ বাগিয়ে। ওকে দেখে শত্রুপক্ষ রণে ভংগ দিলো। যে যেদিকে পারলো পালালো। যারা পালাতে পারলো না তাদের আর প্রাণ নিয়ে ফেরা হোলো না। বেঘোরে প্রাণ হারালো। ধারালো কিরিজের এক কোপে সে সাবাড় করলো সবাইকে।

রাজা দূর থেকে সব দেখছিলেন। আর তারিফ করছিলেন নতুন যোদ্ধার। আপন জামাতাকেও তিনি খোঁজ করছিলেন। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলেন না। কিন্তু নতুন যোদ্ধা যে তাঁর জামাতা, তিনি জানতেও পারলেন না। যুদ্ধ করতে করতে হাঁটুর কাছে কিছুটা বুঝি কেটে গিয়েছিল ওর। রাজা ছুটে গিয়ে নিজের রুমালখানা ওর হাঁটুতে বেঁধে দিলেন। যুদ্ধ শেষে সে কিন্তু ঘোড়া হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেলো যুদ্ধের মাঠ থেকে। আর সিধে রাজবাড়িতে ফিরে শুয়ে পড়লো খাটে। কেন না, তার কাটা পা দিয়ে রক্ত ঝরছিল আর যন্ত্রনাও হচ্ছিল।

এদিকে হয়েছে কি, ভিন দেশী রাজা যুদ্ধে বিলকুল হেরে গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। ঘাট মেনে তিনি ঘোষণা করলেন : আর কোনদিন তিনি পররাজ্য গ্রাস করতে আসিবেন না।

দুই রাজায় আবার মিলন হোল। যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা তাঁরা ভুলে গেলেন।

এদিকে রাজা বাড়ি ফিরলে রাজপুত্ররা আর সবাই তাঁকে ঘিরে ধরলো।

'যুদ্ধের খবর কি মহারাজ ?'

'ভাল। আমাদের জিৎ হয়েছে। ভিনদেশী রাজা পরাজয় স্বীকার করেছেন। সন্ধি করেছেন আমাদের সঙ্গে।'

রাজা একটু থেমে আবার বললেন: 'তবে হ্যাঁ, যুদ্ধ করেছে বটে সেই রাজপুত্রটি। তরোবারির এক কোপে সব সৈন্যের মাথা কেটে সাফ। বাহাদুর ছেলে বটে! পায়ে বুঝি একটু চোট লেগেছিলো। রক্ত পড়ছিলো। আমি তাই আমার রুমালখানা বেঁধে দিয়েছিলাম ওর পায়ে।'

'হ্যাঁ বাবা, তোমার রুমাল তোমাদের জামাইয়ের পায়ে এখনও বাঁধা আছে।' রাজকন্যা বলে উঠলো।

'তাই নাকি, তাই নাকি? চল তো দেখি।'

যুদ্ধের সাজপোশাক পরে বোকা কিসানপুত্র তখনও শুয়েছিল আর বুঝি যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিলো। রাজকন্যা রুমালখানা খুলে রাজার হাতে দিলো। রাজা দেখেই চিনতে পারলেন। খুশি হয়ে বললেন:

'তা হলে তুমিই সেই রাজপুত্র!'

'হ্যাঁ মহারাজ, আমিই!'

রাজবাড়িতে তখন আনন্দের বান ডাকলো। খানাপিনার এলাহি কাণ্ড লেগে গেল আবার।

২৫

এক ছিলো এক বিধবা। তার ছিলো একমাত্র পুত্র। সবে ধন চোখের মণি। দেখতে ছিলো ভারী সুন্দর। ফুটফুটে রঙ। চাঁদপানা মুখ। সবাই তাই ডাকত তাকে চাঁদপানা পিটার বলে।

এখন হয়েছে কি, পিটার একদিন তার হাতের আংটিটা দেয়ালের এক জায়গায় গুঁজে রাখলো। মাকে ডেকে বললো: 'কিছুদিনের জন্য আমি এখন বাইরে যাচ্ছি, মা। যখনই দেখবে আমার এই আংটিটি থেকে রক্ত ঝরছে তখনই বুঝবে আমি আর বেঁচে নেই। আমার মৃত্যু হয়েছে।'

এ বলে ছেলে বেরুলো দেশ ভ্রমণে। পথে যেতে যেতে তার সংগে দেখা হোল এক ড্রাগনের। এ ড্রাগনের ছিল ছয় মাথা। ড্রাগন তাকে দেখতে পেয়ে অমনি গিলতে এলো।

পিটারও প্রস্তুত ছিলো। সে তার তরবারি দিয়ে ড্রাগনটার ছয়-ছয়টি মাথাই কেটে ফেললো ঘ্যাচ করে। আর তা সাজিয়ে রাখলো তিন স্তূপাকার করে। তিন স্তূপের উপর একটি লাল নিশানাও সে রাখলো পুঁতে।

তারপর এগিয়ে চললো সে পথ ধরে।

কিছুদূর যেতেই ফোঁস ফোঁস করে গর্জাতে গর্জাতে আর এক ড্রাগন এসে তার পথ রুখে দাঁড়ালো। এ ড্রাগনের ছিল ছয় মাথা নয়, বারো মাথা। পিটার কিন্তু তার তরবারি দিয়ে বারোটা মাথাই ড্রাগনটার কেটে ফেললো ঘ্যাচ করে। আর মাথাগুলি সাজিয়ে রাখলো বারোটা স্তূপাকারে। স্তূপগুলোর উপর একটা কালো নিশানাও সে রাখলো পুঁতে।

তারপর আবার এগিয়ে চললো সে পথ ধরে

কিছু দূর যেতে না যেতেই ফোঁস ফোঁস করে গর্জাতে গর্জাতে চোব্বিশ মাথাওয়ালা আর এক ড্রাগন এসে রুখে দাঁড়ালো তার পথ। পিটার এবারও প্রস্তুত ছিলো। সে তার ধারালো তরবারিখানা দিয়ে চোব্বিশটা মাথাই ড্রাগনটার কেটে ফেললো ঘ্যাঁচ করে। আর কাটা মুণ্ডু-

গুলো চোব্বিশটা স্তূপ করে তাদের উপর শাদা একখানা নিশানা পুঁতে দিলো।

এখন হয়েছে কি, চোব্বিশ মাথাওয়ালা ড্রাগনটা এক রাজকন্যাকে এনেছিলো হরণ করে। আর বন্দী করে রেখেছিলো নিজ দুর্গে। চোব্বিশ মাথাওয়ালা ড্রাগন শুধু একা ছিলো না। তার মত ছিলো আরও এগার জন। এ বারো জনে মিলে এক সঙ্গে বিয়ে করতে চায় রাজকন্যাকে। তাই সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সর্বক্ষণ নিজেদের মধ্যে তাদের মারা-মারি, ঝগড়া-ঝাটি, লড়াই লেগেই থাকতো। কেননা যে জিতবে সেই লাভ করবে রাজকন্যাকে।

এ কথা শুনে পিটারের তখন মার কথা মনে পড়ল। মা তাকে বলে দিয়েছিলেন ঃ 'কোন বীরপুরুষের হাতে তোর মরণ নেই। মৃত্যু তোর খোঁড়া, পঙ্গু প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে। মনে রাখিস, বাবা।'

পিটার মার কথাগুলো আবার স্মরণ করলো। তাই যদি হয় ড্রাগনের ভয় কিসের ? ঈশ্বরের নাম করে সে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দেখলো, জানালার ধারে এক রাজকন্যা চুপচাপ একা বসে আছে।

পিটার এগিয়ে গেলো। রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলো : 'একা একা তুমি কী করছো এখানে ?'

'ড্রাগনরা আমায় এখানে এনেছে চুরি করে। আর বন্দী করে রেখেছে এই দুর্গে।'

'ওরা এখন কোথায় ?'

'কামড়া-কামড়ি করছে নিজেদের মধ্যে। যে জিতবে সেই আমায় বিয়ে করবে কিনা।'

'কখন আসবে ?'

'খেতে আসবে দুপুরে। হাতের মুগুরগুলি ওরা তখন ছুঁড়ে মারবে দরজার দিকে। আমাকে তখন খাবার জোগাতে হবে।'

একটু পরে ড্রাগনরা রাস্তার ধুলো উড়িয়ে, গাছ-পালা কাঁপিয়ে বাড়ি ফিরলো। পিটার গিয়ে দরজা খুলে দিলো আর চুপি চুপি রাজকন্যার কাছে ফিরে গেল। ড্রাগনরা তখনও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটিতে এমনই মশগুল ছিলো যে পিটারকে ওরা দেখতেই পেলো না। আর আর দিনের মত আজও তারা বাড়ি ঢুকে নিজেদের মুগুরগুলি দরজার

দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলো। পিটার তখন করলো কি, এক একটা মুগুর তুলে নিয়ে সে ওদের দিকে সজোরে নিক্ষেপ করতে লাগলো। আর তাতে এক একটা ড্রাগনের মাথা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেলো।

এমনি করে বারোটা ড্রাগনই মারা পড়লো ওর হাতে।

পিটার তখন রাজকন্যাকে ডেকে আনলো। বললোঃ 'আর কোন ভয় নেই। সব কটা ড্রাগনকে আমি মেরে ফেলেছি।'

তাই শুনে রাজকন্যার খুব আনন্দ হোল। তারপর পিটারের সংগে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল ড্রাগন-পুরীতে।

তবে এ বিয়ের খবর কেউ জানতে পারলো না।

এখন হয়েছে কি, রাজা শুনতে পেলেন রাজকন্যাকে ধরে নিয়ে গেছে বারোটি ড্রাগনে। তাই রাজা রাজ্যময় ঢেড়া পিটিয়ে ঘোষণা করলেনঃ

'যে কেউ রাজকন্যাকে ড্রাগনদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে তিনি তার সংগে রাজকন্যার বিয়ে দেবেন।'

এদিকে যে রাজকন্যা পিটারকে বিয়ে করেছে এবং তারা সুখে শান্তিতে বাস করছে তিনি জানতে পারলেন না।

রাজার এ ঘোষণার কথা গিয়ে পৌঁছলো ছুটিল্লার কানে। ছুটিল্লা হোল হাতকাটা প্রতিদ্বন্দ্বী। সে রাজার কাছে গিয়ে বললোঃ 'মহারাজ, আমি আপনার কন্যাকে ড্রাগনের হাত থেকে উদ্ধার করবো।'

'বেশ কর। যদি উদ্ধার করতে পার, তোমার সংগে আমি তার বিয়ে দেব।' রাজা জবাব দিলেন।

রাজার কথা শুনে ছুটিল্লার তখন রাজকন্যার সন্ধানে বেরুলো। খোঁজ করতে করতে সে ড্রাগন পুরীতে এসে উপস্থিত হোলো। রাত হয়ে গিয়েছিলো। ছুটিল্লা আর কোথাও শোবার জায়গা না পেয়ে ড্রাগন পুরীতে মুরগির ঘরে ঘুমিয়ে রাত কাটালো। সকাল বেলা যখন সে মুরগির ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলো, পিটার তখন তাকে দেখতে পেলো জানলা দিয়ে। ছুটিল্লা চাঁদপানা পিটারের কাছে গিয়ে বললোঃ

'ভালো চাওতো রাজকন্যাকে দিয়ে দাও আমায়।'

'তুই কে রে, তোকে দেবো কেনো?'

পিটার চোখ মুখ ধুচ্ছিলো। জবাব দিলো। —'আমার বিয়ে-করা বউ তোকে দেব কেন?'

'দেবে না ? তবে মর !' নেকড়ে বাঘের মত ছুটিল্লা পিটারের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়লো। ফেলে দিল তাকে মেঝেতে আর সজোরে টুঁটি তার টিপে ধরলো।

অতর্কিত এ আক্রমণের জন্য পিটার প্রস্তুত ছিলো না। কোনরূপ বাধা দিতে পারলো না সে। তার তখন মায়ের কথাগুলিই শুধু মনে পড়লো : 'জানিস বাবা, কোনো বীর পুরুষ তোর কেশস্পর্শ করতে পারবে না। তুই তাদের সহজেই মেরে ফেলতে পারবি। কিন্তু রাজ্যের পঙ্গু খোঁড়া প্রতিবন্দীরাই হোল তোর যম। তাদের কাছ থেকে সাবধান থাকবি।'

এখন আর উপায় নেই। তবু সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার আগেই ছুটিল্লা তার কণ্ঠ নালিটা ধারালো ছুরি দিয়ে চিরে ফেললো। মুণ্ডুটাকেও কেটে ফেললো দু'খান করে। ছুটিল্লা তখন রাজকন্যাকে নিয়ে দেশে ফিরে গেলো।

চাঁদপানা পিটার ড্রাগনপুরীতে মরে পড়ে রইলো।

এখন হয়েছে কি, পিটার বাড়ি থেকে যাত্রা করবার সময় দেয়ালের গায়ে যে আংটিটা পুঁতে এসেছিলো, সে আংটিটা দিয়ে এখন রক্ত ঝরতে লাগলো। তাই দেখে পিটারের মা বুঝতে পারলেন : ছেলের কোন না কোন অমংগল হয়েছে। ছেলে আর বেঁচে নেই।

মা কাঁদতে কাঁদতে ছেলের সন্ধানে বেরুলেন। পথে যেতে যেতে এক স্থানে এসে মা দেখতে পেলেন লাল নিশান পোতা রয়েছে। তা দেখেই মা বুঝতে পারলেন ছেলে তাঁর এই পথ দিয়ে গেছে। তাই তিনি সে পথ ধরে এগিয়ে গেলেন। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আর এক স্থানে দেখতে পেলেন এক কালো পতকা পোতা রয়েছে। তিনি তখন বুঝতে পারলেন, তাঁর ছেলে এ পথ ধরেই গেছে। তিনিও ঐ পথ ধরে এগিয়ে গেলেন। এবং এক জায়গায় এসে দেখলেন, এক শাদা পতকা পোতা রয়েছে পথের ধারে। তিনি তখনই বুঝতে পারলেন, তাঁর ছেলে এ পথ দিয়ে গেছে। তিনিও সে পথে অগ্রসর হলেন। আর কিছু দূর গিয়েই দেখতে পেলেন ড্রাগন পুরী। ড্রাগন পুরীতে ঢুকেই তিনি দেখলেন তাঁর ছেলে মেঝেতে পড়ে আছে গলা কাটা অবস্থায়। আর দুটি সাপ তার রক্ত খাচ্ছে চেটে চেটে।

মা তখন করলেন কি, একটা সাপকে তিনি মেরে ফেললেন। অপর

সাপটা তখন পালিয়ে গেলো। কিন্তু একটু পরে ওটা আবার ফিরে এলো মুখে একটা পাতা নিয়ে। সাপটা তখন মুখের পাতাটা তার মৃত সঙ্গীর গায়ে ঠেকাল আর সঙ্গে সঙ্গে মরা সাপটা জ্যান্ত হয়ে উঠলো।

তাই দেখে মা তখন করলেন কি, সাপদুটোকে তিনি মেরে ফেললেন। তারপর পিটারের কাটা মুণ্ডুটা ঘাড়ে বসিয়ে তিনি সাপের মুখের পাতাটা ছেলের ক্ষতস্থানে ঠেকালেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কাটা মুণ্ডুটা জোড়া লেগে গেলো। পিটার গায়ের আলমোড়া ভেঙে উঠে বসলো। চোখ দুটি কচলে বলে উঠলো :

'এ কি, মা! তুমি? আমি অনেক ক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম, না মা?'

'হ্যাঁ বাছা, অনেক ক্ষণ ঘুমিয়েছিলে। আর এ ঘুম তোমার কোনো-দিন ভাঙতো না, যদি আমি না আসতাম।'

মা ছেলের সর্বাঙ্গে একবার হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন : 'আর না, এবার বাড়ি চলো।'

'কিন্তু রাজকন্যা কোথায় মা?'

'আমি জানি না। রাজকন্যার আর খোঁজ করো না। আবার বেঘোরে প্রাণ হারাবে।'

পিটার কিন্তু মার কথা শুনলো না। রাজকন্যার খোঁজে সে আবার বেরিয়ে পড়লো। আর খুঁজতে খুঁজতে এসে উপস্থিত হোল রাজকন্যার দেশে। রাজপুরীতে ঢুকে পিটার দেখতে পেলো ছুটিল্লা বসে আছে একস্থানে।

পিটারকে দেখতে পেয়ে ছুটিল্লা ভীষণ ঘাবড়ে গেলো। সে বলে উঠলো : 'তুমি তাহলে মর নি?'

'না, মরিনি এখনো, তোমাকে মারবো বলে।'

এই বলে চাঁদপানা পিটার কোমরের তরবারি নিয়ে ছুটিল্লার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর ধরালো তরবারিখানা দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করলো ছুটিল্লাকে। ছুটিল্লার টুকরো টুকরো মাংসগুলি সে তখন খাওয়াল রাজবাড়ির কুকুরদের।

চাঁদপানা পিটারের সঙ্গে আবার মিলন হোল রাজকন্যার। সুখে শান্তিতে তারা দুজন বাস করতে লাগলো। চাঁদপানা পিটারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রাজকন্যা এখনও বুঝি রাত কাটায়। আর যত দিন তারা বাঁচবে ততদিন বুঝি তাই করে রাত কাটাবে।

২৬

এক ছিল এক গরীব লোক। তার ছিল চার ছেলে।

ছেলেরা একদিন কাজে গেলো। আর গিয়ে কাজ নিলো এক ধনী লোকের—'রাই'-এর। কাজটা হোল গমের খোসা ছাড়ানো। 'রাই' ওদের কাজ দেখে খুশি হোল। আর প্রত্যেককে অনেকটা করে গম দিলো বেতন হিসেবে।

ছেলেরা গমটা বাড়ি এনে বাবার হাতে দিলো। বললো: 'দেখো বাবা, কত গম পেয়েছি কাজ করে। কালও আমরা কাজে যাবো।'

বাবা গম দেখে খুশি হোল। বললো: 'বেশ, যেয়ো।'

ছেলেরা পরদিন আবার কাজে গেলো। 'রাই' এবার প্রত্যেক ছেলেকে একটি করে ঘোড়া দিলো বছরের বেতন হিসেবে।

সব চেয়ে ছোট ভাইটির নাম ছিলো ট্রপসিন। ট্রপসিন মনিবের কাছে গিয়ে বললো: 'দাদাদের সকলকে আপনি ঘোড়া দিচ্ছেন, আমাকে কিন্তু দেবেন ঐ বাচ্ছা ঘোড়াটাকে।'

'ঐ বাচ্ছা ঘোড়া নিয়ে তুমি কি করবে? এটা তো এখনও দুধ খায়। তুমি তো চড়তেই পারবে না।'

'তা হোক, ও আমার কাজে আসবে।'

ট্রপসিন ঘোড়া নিয়ে মনিবের কাছ থেকে বিদায় নিলো। ঘোড়ার বাচ্ছাটি তখন বললো: 'ট্রপসিন, আমায় তুমি আমার ঘোড়া-মার কাছে যেতে দাও। আমি পেট ভরে দুধ খেয়ে আসি।'

ট্রপসিন তাই যেতে দিলো। বাচ্ছাটি ছুটে গেলো তার মার কাছে আর ফিরে এলো তেজী প্রকাণ্ড এক ঘোড়া হয়ে। তার খুরের আঘাতে ধুলোর ঝড় উঠলো। পায়ের নিচে মাটি উঠলো কেঁপে।

ঘোড়ার বাচ্ছাটি ট্রপসিনের সামনে এসে পা ঠুকে বললো:,

'এবার চড়ুন আমার পিঠে।'

ট্রপসিন তাই করলো। এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসতেই ঘোড়াটি খটাখট্ খটাখট্ শব্দ করে একরাশ ধুলো উড়িয়ে ছুটে চললো। সে তার

দাদাদের ধরে ফেললো একটু পরেই। ওরা ট্রপসিনকে এমন এক তেজী ঘোড়ায় চড়তে দেখে বলে উঠলো :

'আরে, এমন ঘোড়া তুই পেলি কোথায় ?'

'পেলাম এক 'রাই'কে কোতল করে। ওকে কোতল করে ওর ঘোড়াটা নিয়ে পালিয়েছি।'

তাই শুনে ওরাও জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো পালাবার জন্য।

ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা এসে পড়লো বিরাট এক মাঠে। এদিকে রাত হয়ে গিয়েছিলো। মাঠে এসে ওরা দেখলো দূরে একটা আলো জ্বলছে। আলো লক্ষ্য করে ওরা ঘোড়া ছুটালো। আর এসে উপস্থিত হোলো এক বাড়িতে। এ বাড়িটা ছিলো এক ডাইনি বুড়ির। তার ছিলো চার মেয়ে। চার মেয়েকে নিয়ে সে থাকতো বাড়িতে।

চার ভাই ভিতরে ঢুকে পড়লো। ট্রপসিন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো : 'বাড়িতে কে আছেন ? নমস্কার !'

'নমস্কার।'

একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো। তাকে দেখে ট্রপসিন আবার বলে উঠলো :

'আমাদের একটু থাকতে দেবেন রাত্রের জন্য ?'

'আমি ঠিক বলতে পারবো না। মা এখন বাড়ি নেই। মা বাড়ি এলে আপনি বরং জিজ্ঞেস করবেন।'

একটু পরে মা তাদের বাড়ি ফিরলো। ট্রপসিনদের সে জিজ্ঞেস করলো : 'তোমরা বাছা কি চাইছ ?'

'আপনার মেয়েদের আমরা বিয়ে করতে চাই।'

'বিয়ে করবে, বেশ ভাল কথা !'

বুড়ি ট্রপসিনদের আদর আপ্যায়ন করে খেতে দিলো। শুতে দিলো নতুন ফরাশ পেতে। দরজার দিকে মাথা রেখে সে চার ভাইকে শুতে দিলো আর নিজ মেয়েদের দিলো দেয়ালের দিকে মাথা রেখে।

শোবার ব্যবস্থা করে বুড়ি তার ঘরে চলে গেলো আর গিয়ে আপনার তরবারিখানা ধার দিতে বসলো। ট্রপসিন চুপি চুপি উঠে সব লক্ষ্য করলো। তারপর নিজেদের শোবার ঘরে এসে দাদাদের মাথার পাগড়ি-গুলি মেয়েদের মাথায় দিলে পরিয়ে। তারপর নিজ বিছানায় গিয়ে শুয়ে

পড়লো।

এদিকে রাত যখন গভীর হোল বুড়ি ডাইনি তখন করলো কি, ধারালো তরবারিখানা দিয়ে সবকটা মাথা কেটে ফেললো যাদের মাথায় পাগাড় রয়েছে। বুড়ি এবার আপন ঘরে ফিরে গেলো। জানতেও পারলো না যে বুড়ি নিজ হাতে নিজের মেয়েদের মাথা কেটে ফেলেছে।

ট্রপাসিন তখন উঠে আপনার দাদাদের ডেকে জাগালে। বাইরে নিয়ে এসে বললো: 'টু' শব্দটি না। চুপি চুপি পালাও।'

বুড়ি ডাইনির ছিল একটি সোনালি পাখি। যাবার সময় সে কিন্তু বুড়ির সোনালি পাখির একটা পালক নিতে ভুললো না। বাচ্চু ঘোড়াটি আপত্তি করলো। বললো:

'আমি বারবার বলছি, সোনালি পাখির পালকটি নেবেন না, কর্তা, নেবেন না, বিপদে পড়বেন।'

'পড়ি তো পড়বো। তাই বলে অমন পালক আমি হাতছাড়া করতে পারবো না।'

এই বলে ট্রপাসিন সোনালি পাখির পালকটি নিজ পকেটে গুঁজে রাখলো।

ঘোড়া ছুটিয়ে চার ভাই তখন আর এক শহরে এসে হাজির হোলো।

এখন হয়েছে কি, এই শহরে ছিলেন এক বড়ো জমিদার—'বড়ো রাই'। তিনি তাদের দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'এই যে চার ঘোড়সওয়ার, তোমরা কোথায় চললে?'

'আমরা কাজের খোঁজে বেরিয়েছি।'

'কাজ করবে? আমি তোমাদের কাজ দিতে পারি।'

ওরা রাজি হোলো। নতুন মনিবের সঙ্গে গেলো তাঁর বাড়ি।

এখন বড়ো রাই ছিলেন অবিবাহিত। বিরাট তাঁর বাড়ি। থাকবার মত আপন জন বলতে কেউ ছিলো না। তিনি তাই চার ভাইকে চার কাজের ভার দিলেন। একজনকে দিলেন ঘোড়াগুলোর দেখা শুনার কাজ। একজনকে ষাঁড়ের; অপর জনকে শুয়োরের। আর ট্রপাসিনকে তিনি নিয়োগ করলেন তাঁর সহিস রূপে।

একদিন হয়েছে কি, ট্রপাসিনের পকেটের সেই সোনালি পাখির পালকটির সঙ্গে দেয়ালের ঘষা লাগলো আর তাতেই পালকটি জ্বলে

উঠলো প্রদীপের মতো। তাই দেখে ট্রপসিনের দাদারা ওর উপর রেগে গেল। মনিবের কাছে গিয়ে মিছিমিছি বানিয়ে বলতে লাগলো :

'জানেন কর্তা, ট্রপসিনের কাছে এমন একটা পাখির পালক আছে যেটা জ্বালালে মোমবাতির আর দরকার হয় না।'

তাই শুনে মনিব ট্রপসিনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন ঃ

'ট্রপসিন, ভালো চাও তো তোমার পালকটা আমায় দিয়ে দাও।'

ট্রপসিন তখন পালকটি মনিবের হাতে দিলো। তাই পেয়ে মনিব খুব খুশি হলেন ট্রপসিনের উপর। ট্রপসিনকে তিনি কোচমান থেকে আরো বড় পদে নিয়োগ করলেন। তাই দেখে তার ভাইদের ঈর্ষা হোলো ছোট ভাই-এর উপর। মনিবের কাছে ট্রপসিনের নামে বানিয়ে বানিয়ে বলতে লাগলো ঃ

'জানেন কর্তা, ট্রপসিন এখন বলছে ঃ মনিব আমার পালকটা নিয়েছেন তো নিক, তাতে কি হয়েছে ? আমি সোনালি পাখিটাকে পর্যন্ত জ্যান্ত ধরে আনতে পারি।'

'তাই নাকি ? ডাকো ট্রপসিনকে, সোনালি পাখি নিয়ে আসুক।'

ট্রপসিন মনিবের সামনে হাজির হতেই মনিব তাকে ডাইনি বাড়ি থেকে সোনালি পাখি নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন। বললেন ঃ 'যাও, পাখিটা এনে দাও। নইলে তোমার মাথা কাটা যাবে।'

তাই শুনে ট্রপসিন মন খারাপ করে বাচ্চু ঘোড়ার কাছে এসে উপস্থিত হোলো। বলল ঃ 'শুনেছ তো, মনিবের হুকুম সোনালি পাখিটাকে ধরে আনতে হবে। নইলে মাথা কাটা যাবে।'

বাচ্চু ঘোড়া বললো : 'আমি না তখন বারবার মানা করেছিলাম, সোনালি পাখির পালক নেবেন না কর্তা, নেবেন না।'

বাচ্চু ঘোড়া একটু থামলো। তারপর আবার বললো : 'সে যাক ভয় নেই। আমার পিঠে চড়ে বসুন। ব্যবস্থা একটা হবে।'

ট্রপসিন বাচ্চু ঘোড়ার পিঠে চেপে বসতেই ঘোড়াটি ধুলি উড়িয়ে ছুটলো বুড়ি ডাইনি বাড়ির দিকে। ডাইনি বুড়ির বাড়ি এসে বাচ্চু ঘোড়া বললো : 'আপনি নেমে একটা ডিগবাজি খাবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবেন ছোট্ট একটা ডানাহীন কীট, কীট হয়ে তার কাপড়ের মধ্যে ঢুকে পড়বেন আর বুকে তার কামড়ে ধরবেন। আচমকা কামড় খেয়ে বুড়ি

তখন আঁতকে উঠবে। নিজের পোশাক আশাক ছাড়তে শুরু করবে। এই ফাঁক তালে আপনি পাখিটি নিয়ে পালিয়ে আসবেন।'

বাচ্চু ঘোড়ার কথা মত ট্রপসিন তাই করলো। ঘোড়া থেকে নেমে সে ডিগবাজি খেলো আর সঙ্গে সঙ্গে এক পোকা হয়ে বুড়ি ডাইনির পোশাকের মধ্যে ঢুকে পড়লো। আর কামড়ে দিলো তার বুকে। আচমকা আক্রান্ত হয়ে বুড়ি ডাইনি মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। আর তারই ফাঁক তালে ট্রপসিন সোনালি পাখিটি নিয়ে পালালো।

বাড়ি এসে মুনিবের হাতে পাখিটি দিল সে। মুনিব তার উপর খুব সন্তুষ্ট হলেন। তাকে বানিয়ে দিলেন উর্দি পরা হিৎমদকার।

মুনিব ট্রপসিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখে তার দাদারা মনে মনে চটে গেল খুব। তাকে জব্দ করবার জন্য মুনিবের কাছে গিয়ে বললো:

'জানেন কর্তা, ট্রপসিন এখন বলে বেড়াচ্ছে: সে ইচ্ছে করলে দানিয়ুব নদীর কুমারী কন্যাকেও নাকি ধরে আনতে পারে।'

'তাই নাকি? ডাকো ট্রপসিনকে?'

ট্রপসিন মুনিবের কাছে এলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন:

'তুমি বলেছো নাকি দানিয়ুব নদীর কুমারী কন্যাকে পর্যন্ত ধরে আনতে পারো?'

'আঁজ্ঞে, না তো। আমি তো বলি নি।'

'আলবৎ বলেছো। নইলে ওরা শুনবে কি করে?' মুনিব ধমকিয়ে উঠলেন। বললেন: 'যাও, দানিয়ুব নদীর কুমারী কন্যাকে নিয়ে এসো, নইলে তোমার মাথা কাটা যাবে।'

ট্রপসিন তখন করে কি? সে তার বাচ্চু ঘোড়ার কাছে গিয়ে সব কথা বললো। বাচ্চু ঘোড়া বললো:

'ঠিক আছে, ভয় পাবেন না। দানিয়ুব কন্যাকে আনতে বলেছেন, আনবেন। মুনিবকে গিয়ে এখন বলুন, তিনি যেন আপনায় বারোখানা আস্তো চামড়া দেন আর দেন এক ভাণ্ড আলকাতরা। ও গুলো এনে আমার পিঠে চাপিয়ে দিন। আর মুনিবকে বলুন তিনি যেন আপনার জন্য খুব বড়ো না—ছোটোও না—এমনি একখানা জাহাজ তৈয়োরি করেন। আর সে জাহাজে যেন নানান শ্রেণীর পানীয় ও খাবার মজুত থাকে।'

বাচ্চ; ঘোড়া একটু থেমে আবার বললো : 'প্রত্যেক রবিবার দানিয়ুব কন্যা জল থেকে উঠে নৌকোয় করে হাওয়া খান। আপনি কিন্তু জাহাজের মধ্যে লুকিয়ে থাকবেন দরজার আড়ালে। জাহাজে নানান প্রকার খাবার ও পানীয় দেখে দানিয়ুব কন্যা নৌকো থেকে জাহাজে তখন উঠে আসবে। আর বেশী করে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে পড়বে জাহাজের উপর। আপনি তখন করবেন কি, দানিয়ুব কন্যাকে কোলপাঁজা করে নিয়ে আমার পিঠে চেপে বসবেন। আমি তখন আপনাদের নিয়ে ছুটে বাড়ি এসে পৌঁছব।'

ট্রপসিন তাই করলো। মুনিবকে বলে ছোট একখানা জাহাজ সে বানিয়ে নিল আর তাকে ভর্তি করে রাখলো রাজ্যের সেরা পানীয় আর খাবারে। নিজেও দরজার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল। এদিকে দানিয়ুব কন্যা নিজের নৌকোয় করে বেড়াতে এসে জাহাজের মধ্যে নানান খাবার ও মদ দেখতে পেলো। আর জাহাজে উঠে এসে পেট ভরে তাই খেলো। সঙ্গে সঙ্গে নেশায় বুঁদ হয়ে ঢলে পড়লো সে জাহাজের পাটাতনে। ট্রপসিন ওৎ পেতে ছিল। তাকে তখন কোলপাঁজা করে তুলে সে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। আর ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে উপস্থিত হোলো মুনিবের প্রাসাদে।

মুনিব দানিয়ুব কন্যাকে পেয়ে খুশিতে আটখানা। প্রাসাদ পুরীর এক ঘরে তাকে সে বন্দী করে রাখলো। আর যাতে পালাতে না পারে তার জন্য দরজাটা দিলো বন্ধ করে। একজন দাসীকেও রাখলো পাহারায়।

এদিকে দানিয়ুব কন্যার নেশার ঘোর তখন কেটে গেছে। আগাগোড়া ব্যাপারটা কি সে বুঝতে পারলো। আর সে মহা খাপ্পা হয়ে উঠলো তাকে যারা ধরে এনেছে তাদের উপর। 'বড়ো রাই' তাকে বিয়ে করতে প্রস্তাব করলে সে সরাসরি বলে পাঠালো : হ্যাঁ, বিয়ে সে করবে। তবে যে তাকে ধরে এনেছে সে গিয়ে যেন তার ঘোড়ার পাল নিয়ে আসে। নইলে সে বিয়ে করবে না কাউকে।

তাই শুনে মুনিব হুকুম করলেন : 'যাও ট্রপসিন, যেখান থেকে পারো ঘোড়ার পাল নিয়ে এসো। নইলে কিন্তু—।'

নইলে যে ট্রপসিনের মাথা কাটা যাবে সে জানে। তাই সে তার একমাত্র সহায় সম্বল বাচ্চ; ঘোড়ার কাছে গিয়ে সব কথা জানাল। বাচ্চ;

ঘোড়া বললো :

'ঠিক আছে, কোন ভয় নেই। আমার সঙ্গে চলুন।'

ট্রপসিন ওর কথা মত বাচ্চু ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলো। আর সে দানিয়ুব নদীর পাড়ে এনে তাকে হাজির করলো।

ট্রপসিনকে দেখে ঘোড়ার পাল সব অমনি দানিয়ুব নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ট্রপসিনও ছাড়বার পাত্র নয়। সেও বুড়ী মাদি ঘোড়াটির পিঠে লাফিয়ে চেপে বসলো। আর তার ঘাড়ের লোম ধরে টানতে টানতে তাকে এনে তুললো ডাঙ্গায়। তারপর দুলকি চালে ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে হাজির হোল 'বড়ো রাই'য়ের প্রাসাদ পুরীতে।

দানিয়ুব-কন্যা তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আর 'খাড়া রও' বলে চিৎকার করে উঠতেই ঘোড়ার পাল সব যে যেখানে ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো পা ঠুকে।

'বড়ো রাই' এবার দানিয়ুব কন্যাকে বিয়ে করতে চাইলেন। বললেন : 'তোমরা কথা মতো ঘোড়া এনে দিয়েছি। এবার তুমি বিয়ে কর আমায়।'

'না। আগে আমার ঘোড়ার দুধ চাই প্রকাণ্ড এক কড়া।'

'অতো ঘোড়ার দুধ পাবো কোথায় ?' 'বড়ো রাই' শুধালেন।

'যে আমাকে ধরে এনেছে সেই ঘোড়ার দুধ জোগাড় করবে।'

বড়ো রাই তখন ট্রপসিনকে ডেকে পাঠালেন। বললেন : 'ঘোড়ার দুধ চাই। নইলে কিন্তু—।'

ট্রপসিন জানে, নইলে তার মাথা কাটা যাবে। তাই সে বাচ্চু ঘোড়ার কাছে গিয়ে সব বললো। বাচ্চু ঘোড়া তখন জবাব দিলো : 'কিছু আপনি ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। মাদি ঘোড়াগুলির ঘাড়ের লোম আমি জোরে কামড়ে ধরবো। আর আপনি গিয়ে তাদের দুধ দুয়ে আনবেন। ওরা আর পা ছুঁড়তে পারবে না।'

ট্রপসিন তাই করলো। বাচ্চু ঘোড়া মাদি ঘোড়াগুলিকে কামড়ে ধরল আর ট্রপসিন দিব্যি দুধ দুয়ে দুয়ে প্রকাণ্ড একটা কড়া ভর্তি করে ফেলল।

'বড়ো রাই' তাই দেখে খুশি। দানিয়ুব কন্যাকে বললো :

'কেমন, তোমার ইচ্ছা পূরণ হোল তো ? এবার আমার ইচ্ছা পূরণ করো। আমায় বিয়ে করো।'

'না।' দানিয়ুব কন্যা জবাব দিলো। বললো : 'আমার ইচ্ছা এখনও

পূরণ হয় নি। কড়া শুদ্ধ দুধটাকে জ্বাল দিতে আদেশ করুন। দুধ ফুটে উঠলে আমাকে যে ধরে এনেছিল তাকে বলুন সে যেন সেই দুধে ডুব দিয়ে আসে।'

'বড়ো রাই' ট্রপসিনকে সব বললেন। ট্রপসিনও তার একমাত্র সম্বল বাচ্চা ঘোড়াকে গিয়ে সব বললো। বাচ্চা ঘোড়া জবাব দিলো:

'আপনি ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে ফুটন্ত দুধের কড়ায়ের কাছে একবারটি নিয়ে যাবেন। আমি নাক দিয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা হিমেল নিশ্বাস ফেলতে থাকবো। যখন আর তাতেই কড়ায়ের ফুটন্ত দুধটা শীতল হয়ে যাবে বরফ গলা জলের মতো। আপনি তাতে দিব্যি ডুব দিতে পারবেন। কোন ভয় নেই।'

ট্রপসিন তাই করল। সে তার বাচ্চা ঘোড়াকে নিয়ে গেলো আগুনের কাছে কড়াই এর সামনে। ঘোড়া তার নাক দিয়ে ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলে ফুটন্ত দুধটাকে শীতল করে দিল। কেউ সেটা জানতেও পারলো না। ট্রপসিনও বেশ নিশ্চিন্তে কড়া ভর্তি দুধের মধ্যে ডুব দিয়ে উঠে এলো। ঠাণ্ডা দুধে স্নান করে উঠে এলো বলে রূপ লাবণ্য তার বেড়ে গেলো আরো।

ট্রপসিনকে দেখে 'বড়ো রাই' ভাবলেন:

'তাই তো, ট্রপসিন দুধের মধ্যে ডুব দিয়েছে বলে কেমন রূপবান হয়ে গিয়েছে। আমি যদি ডুব দিই আমিও নিশ্চয় আরো বেশ সুন্দর হয়ে উঠবো। বয়সও যাবে কমে। আমিও একটা ডুব দিয়ে নিই।'

এই বলে 'বুড়ো রাই' দুধের ফুটন্ত কড়াই-এর দিকে এগিয়ে গেলেন।

তাই দেখে দানিয়ুব কন্যাও বলে উঠলো: হ্যাঁ 'বড়ো রাই', আপনিও একটা ডুব দিয়ে আসুন। তা হলে আপনার যৌবন আবার ফিরে আসবে। আপনাকে আরো সুন্দর যুবা পুরুষ দেখাবে।'

'হ্যাঁ, তাই দিচ্ছি।' এ বলে 'বড়ো রাই' ফুটন্ত দুধের কড়াই-এর মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আধ সিদ্ধ হয়ে গেলেন।

তাই দেখে দানিয়ুব কন্যা এগিয়ে এলো। ট্রপসিনের হাত ধরে বললো: 'আজ থেকে তুমিই আমার 'বড়ো রাই' হলে। আমি তোমার রানী হলাম।'

তাই হোল। ওরা হোল রাজা ও রানী। আর সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল অনেক—অনেক দিন।